সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা : গ্রন্থাঙ্ক তিন

সাধারণ সম্পাদক : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ডেভিড হেয়ার

প্যারীচাঁদ মিত্র

অনুবাদ :

ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা :

সুশীলকুমার গুপ্ত

সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড

বাইশ স্ট্র্যান্ড রোড। কলিকাতা এক

প্রথম প্রকাশ

কার্তিক ১৩৬১।

প্রকাশক

রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাইশ স্ট্র্যাণ্ড রোড

কলিকাতা এক

মুদ্রক

সুনীল রায়

অভ্যুদয়

তিরিশ সূর্য সেন স্ট্রীট

কলিকাতা নয়

প্রচ্ছদশিল্পী

ধ্রুব রায়

ডেভিড হেয়ার

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় নবজাগরণের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে জড়িত। নবজাগরণের মূলে যে ইংরেজী শিক্ষা তার বিস্তারের অগ্রদূত হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয়। সে যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে হেয়ারের আগ্রহ ও প্রচেষ্টার কথা বিস্মৃত হবার নয়। বিদেশী হয়েও এদেশকে যাঁরা যথার্থভাবে ভালোবেসে এরই সর্বাঙ্গীণ উন্নতির প্রচেষ্টায় জীবনপাত করে গেছেন তাঁদের মধ্যে পুণ্যকীর্তি হেয়ারের স্থান নিঃসন্দেহে প্রথম সারিতে। অথচ আজ আমরা নব্য শিক্ষার এই মহান অগ্রদূতকে ভুলতে বসেছি। হেয়ারের জীবনচরিত এদেশে নব্যশিক্ষারম্ভের ইতিহাসের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাদান।

নব্যশিক্ষার পথিকৃৎ হিসাবে ডেভিড হেয়ারের দাবিই অগ্রগণ্য। এদেশের জনগণের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে হেয়ার অনুভব করেছিলেন যে একমাত্র শিক্ষাই তাদের দুর্দশার অবসান ঘটাতে পারে। সেইজন্য এই শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে তিনি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা ও সম্পদ নিয়োজিত করেছিলেন। এদেশে মাতৃভাষার অনুশীলনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকেও তিনি বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা এ দেশবাসীদের পক্ষে অপরিহার্য। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টা ও উদ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজের জন্ম সম্ভবপর হয়। ডেভিড হেয়ারই হিন্দু কলেজের প্রকৃত জন্মদাতা ও উন্নতিবিধাতা। কিন্তু ভুলক্রমে হিন্দু কলেজের প্রথম পরিকল্পকের সম্মান কেউ রামমোহন রায়কে, আবার কেউ সার্ হাইড ঈস্টকে দিয়েছেন। মেজর বামনদাস বসুর মতে (Education in India under East India Co. :

p. 38) রামমোহনই হিন্দু কলেজের পরিকল্পনার জনক। আবার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্থাপিত সার্ এডওআর্ড হাইড ঈস্টের মর্মরমূর্তির নিচে লেখা হয় যে তিনিই হিন্দু কলেজের প্রথম পবিকল্পক।

ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পথিকৃৎ কিনা এ নিয়ে তদানীন্তন পত্রপত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হলে মাসিক 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিআন অবজার্ভার' পত্রিকার প্রথম খণ্ডেব তিনটি সংখ্যায় (জুন, জুলাই ও আগস্ট, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) "A Sketch of the Origin, Rise and Progress of the Hindoo College শীর্ষক প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করে। জুন মাসের পত্রিকায় হিন্দু কলেজেব প্রথম পরিকল্পক হিসাবে ডেভিড হেয়ারের কৃতিত্বকে স্বীকাব করে স্পষ্টভাবে লেখা হয়, "...It is contended, on the one hand, by a Director of the Hindoo College, that on the [1] 4th May, 1816, Sir Edward Hyde East first convened a meeting of Hindoos at his house, for the purpose of subscribing to, and forming an establishment for, the liberal education of their children. It was contended, on the other hand, by one of the teachers of the Hindoo College, the Late Mr. Derozio, who, from his intimacy with Mr. David Hare and the Native community, as well as from his knowledge of the proceedings of the College, certainly had good grounds for the assertion which he so resolutely maintained, that 'previous to the aforesaid meeting being held, a paper, the author and originator of which was Mr. Hare, and the purport of which was, a proposal for the establishment of a College, was handed to Sir Hyde East by a Native for his countenance and support.' The learned Judge having made a few alterations in the plan, did give it his countenance

and support by calling the aforesaid meeting. But giving support or sanction to a measure proposed by any one, is not the same thing with originating that measure. Now, if it be the fact, as seems warranted by good authority, that Mr. Hare did first conceive the plan in his mind, and then circulated it, in writing, among the Natives, by one of whom it was subsequently submitted to the learned Judge, for his approval, the merit of originating the Hindoo College must in justice be ascribed to Mr. Hare."

রাজনারায়ণ বসু ও প্যারীচাঁদ মিত্রও হিন্দু কলেজের প্রথম পরিকল্পকের কৃতিত্ব হেয়ারকেই দিয়েছেন। রাজনারায়ণ তাঁর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (কলিকাতা ১৮৭৬ : পৃ ২০) গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্মা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা দূর করেন। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং তৎসংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।" রাজনারায়ণের 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪) (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, ১৯৫১ : পৃ ৬) গ্রন্থে হেয়ার সম্পর্কে লেখা আছে "তাঁহাকে এতদ্দেশীয়দের ইংরেজী শিক্ষার প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল সংস্থাপন করেন ও হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।' প্যারীচাঁদের বক্তব্যের জন্য বর্ত্তমান গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৩) গ্রন্থে জানিয়েছেন, "রামমোহন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুদিগকে ..ইয়া 'আত্মীয় সভা' নামে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেই সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেই সভা ভঙ্গ হওয়ার পর হেয়ার

পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কথোপকথনের পর স্থির হইল যে, একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইবে। সে সময়ে বৈদ্যনাথ মুখুয্যে নামক ইংরেজী-শিক্ষিত একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন।...বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মীয় সভার একজন সভ্য ছিলেন;...অনুমান করা যায়, বৈদ্যনাথ মুখুয্যেই হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার্ হাইড ইস্ট (Sir Hyde East) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকিবেন" (নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড সং ১৯৫৫ পৃ: ৭৮-৭৯)। এখানেও হেয়ার যে হিন্দু কলেজের পরিকল্পনার স্রষ্টা তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুআরি ইয়ং বেঙ্গলের দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য ৫৬৪ জন যুবক ডেভিড হেয়ারকে যে অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন ও হেয়ার তার যে উত্তর দেন তা থেকেও এ দেশে নব্যশিক্ষার অগ্রদূত হিসাবে তাঁকে স্বীকার করার সমর্থন মেলে। হেয়ার প্রথমে হিন্দু কলেজে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক ও পরে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভার একজন সদস্য নিযুক্ত হন। হিন্দু কলেজের বাড়ি নির্মাণের জন্য হেয়ার স্বল্পমূল্যে তাঁর পটলডাঙায় অবস্থিত কিছু সম্পত্তি ছেড়ে দেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে এর অগ্রগতির প্রতিটি স্তরে হেয়ারের সাহায্য ও সহযোগিতা স্মরণীয়।

হেয়ারের শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুধু হিন্দু কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হেয়ার কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি ও কলকাতা স্কুল সোসাইটি এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষা লাভের সুযোগ দেবার জন্যে সিমলা স্কুল, আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙা স্কুল প্রতিষ্ঠায় ও তাদের উন্নতিতে হেয়ার সর্বপ্রকারে আনুকূল্য করেন। মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও তার অগ্রগতিতে হেয়ারের সহায়তা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। চিকিৎসাবিদ্যা ও স্ত্রীশিক্ষার

বিষয়ে তাঁর আন্তরিক আগ্রহও স্মরণযোগ্য।

'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উপর ডিরোজিওর পরেই হেয়ারের প্রভাব কার্যকর হয়েছিল। হেয়ার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল ভাবচিন্তার ভাল দিকটি গ্রহণ করতেন। হেয়ার তদানীন্তন প্রগতিশীল কোন আন্দোলন থেকেই সরে থাকেননি। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দলের নেতা যথাক্রমে রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেব উভয়েই হেয়ারের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা লাভ করেন। কিন্তু কোন পক্ষই হেয়ারকে কোন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আটক রাখতে পারেননি। রামমোহনের আত্মীয়-সভা, ডিরোজিও, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন ও 'ইয়ং বেঙ্গল-এর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র সংগে হেয়ারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আন্দালনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া ও এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন এবং ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করতেন।

সে যুগে হেয়ারের মতো এদেশে শিক্ষার যথার্থ অভাব আর কেউই উপলব্ধি করতে পারেননি। তখন শিক্ষার বিষয় ও বাহনরূপী ভাষা সম্পর্কে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। একপক্ষ ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সপক্ষে মত ব্যক্ত করেন। এই পক্ষের নেতা ছিলেন মেকলে এবং তাঁকে সমর্থন জানান মিশনরিগণ, কোম্পানির তরুণ কর্মচারিবৃন্দ ও রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ভারতীয়েরা। অপর পক্ষ প্রতীচ্য সাহিত্য বিজ্ঞান চচার সংগে সংগে সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষার অনুকূলে ছিলেন। শিক্ষার বাহনরূপী ভাষার বিষয়ে এঁদের মধ্যে হেষ্টিংস, মিণ্টো প্রমুখ একদল সংস্কৃত ও আরবী ভাষার সপক্ষে মত দেন এবং মনরো, এলফিনস্টোন প্রমুখ অন্যদল মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনকে সমর্থন জানান। হেয়ার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধনে ব্রতী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা ও মাতৃভাষাচর্চা

এই উভয় বিষয়েই তাঁব আগ্রহ ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উডের শিক্ষা-সংক্রান্ত ডেসপ্যাচে হেয়ারেব শিক্ষাদর্শের সত্যতা প্রমাণিত হয়। এরপর থেকে এই শিক্ষাদর্শেরই অনুসরণ দেখা যায়। এটা হেয়ারের পক্ষে অসাধারণ কৃতিত্বের কথা সন্দেহ নেই।

হেয়ারেব ছাত্রপ্রীতি, পরার্থপরতা, সরল জীবনযাত্রা প্রণালী, সাহস, শারীরিক শক্তি, আমোদপ্রিয়তা, সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ উদাহরণস্থল হয়ে আছে। হেযার বিদেশী হয়েও এ দেশের জন্য যা করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। অথচ তিনি আজ আমাদের বিস্মৃতির অন্তরালবর্তী হতে চলেছেন। নিঃসন্দেহেই এটি লজ্জাকর ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর বহু খ্যাতিমান পুরুষের পেছনে নিত্যক্রিয়াশীল হেযারের সাহায্য ও প্রেরণার কথা ভুলে যাবার নয়। হেয়ারের চরিত্র ও আদর্শের অনুসরণ করলে যে কোন ব্যক্তি তথা জাতিব পক্ষে প্রকৃত শিক্ষার সুফল লাভ সম্ভব—একথা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' গ্রন্থেব উপসংহাবে যা লিখেছেন (পৃ: ২৫-২৫) তা উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রসংগে ছেদ টানি :

"হেয়ার সাহেবের জীবন পাঠে কে না উন্নতভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কাম চিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকাবার্থে-পরসুখার্থে অর্পণ কবিযাছিলেন—যিনি আপনার সুখ অন্বেষণ করেন নাই ও যাঁহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি দেবভাব প্রকাশ কবিযা গিয়াছেন তাহা কে না স্বীকাব করিবে? জগদীশ্বর আমাদিগকে এই কৃপা করুন যে হেয়ার সাহেবের যেরূপ শুদ্ধ প্রেম ছিল, সেই শুদ্ধ প্রেমে আমরা যেন পরিপূর্ণ থাকি।"

কলকাতা
রথযাত্রা

সুশীল কুমার গুপ্ত

গ্রন্থ-প্রসঙ্গে

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রকার উন্নতিতে যে ক'জন বিদেশী মহাপ্রাণের গভীর আগ্রহ ও যত্ন পরিদৃষ্ট হয়েছে, ডেভিড হেয়ার তাঁদের অন্যতম। দুঃখের বিষয়, একমাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র ছাড়া এমন একটি মহৎ জীবনের নির্ভরযোগ্য আলেখ্য রচনায় আর কেউই এগিয়ে আসেননি। প্যারীচাঁদের 'A Biographical Sketch of David Hare' (1877)-এর প্রথম সম্পাদিত সটীক অনুবাদরূপে বর্ত্তমান গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ।

উপর্যুক্ত ইংরেজী বইটি বেরুনোর পর প্যারীচাঁদ ক্ষুদ্রাকারে (আকার ৬$\frac{৩}{৪}$''×৪''; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬) বাঙলায় হেয়ারের একটি জীবনীগ্রন্থ কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন, "ইতিপূর্ব্বে হেয়ার সাহেবের জীবনচরিত ইংরাজিতে লেখা হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীলোক ও ইংরাজি ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জন্য তাঁহার জীবনের সংক্ষেপ বিবরণ বাঙলা ভাষায় লেখা গেল। যদিও রচনা উৎকৃষ্ট হয় নাই তথাপি যাঁহার গুণকীর্ত্তন করা হইল তিনি মহৎ ও চিরস্মরণীয় লোক ছিলেন। ভরসা করি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে পাঠকের মনে মহৎভাবের উদয় হইবে।" ইংরেজী মূলগ্রন্থের আকার ৭$\frac{১}{২}$''×৪$\frac{১}{২}$'' এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ (নামপত্র) +১৩৯ (মূলগ্রন্থ) +৩৭ (পরিশিষ্ট ক ও খ)। গ্রন্থটি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ডবলিউ নিউম্যান অ্যাণ্ড কোং, ৩, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।

বর্তমান গ্রন্থের প্রামাণিকতা সম্পর্কে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্যারীচাঁদ হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ডেভিড হেয়ারের

ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ডিরোজিওর কাছে পড়ার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। হেয়ারের মৃত্যুর পর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন তাঁর স্মৃতি-রক্ষার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তিনি পরে তার অন্যতম সদস্য হন। হেয়ারের স্মরণার্থে সাংবৎসরিক সভার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন তিনি ও তাঁর ভ্রাতা কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি হেয়ার পুরস্কার কমিটির সদস্য সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। সুতরাং হেয়ারের জীবনচরিত রচনা করার বিশেষ সুবিধা তাঁর ছিল এবং তাঁর পরিবেশিত তথ্যকে প্রামাণিক বলে ধরা যায়। তাছাড়া হেয়ারের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, ছাত্র প্রমুখের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে তিনি ত্রুটি করেননি। তবে কোন গ্রন্থই একেবারে সম্পূর্ণ ও ত্রুটিহীন হতে পারেনা। ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যগণ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুআরি মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে হেযারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য একটি সভাব আয়োজন করে ও দক্ষিণানন্দন (পরে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায) ও অন্য ৫৬৪ জন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত যে প্রশংসাপত্র প্রদান করেন এবং হেয়ার এর যে উত্তর দেন প্যারীচাঁদের গ্রন্থে সে দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এদুটি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখের 'গভর্ণমেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত হয়। আর একটি কথা। প্যারীচাঁদ লিখেছেন, হেযার ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁর বন্ধু ই-গ্রে সাহেবকে নিজের ঘড়ি নির্মাণের ব্যবসা অর্পণ করেন। কিন্তু ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুআরির 'গভর্ণমেণ্ট গেজেটে'র অতিরিক্ত সংখ্যায় হেয়ার কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রে সাহেবের কাছে হেয়ারের ব্যবসা হস্তান্তরিত হয়। হেয়ারকে প্রদত্ত প্রশংসাপত্র ও সে বিষয়ে তাঁর উত্তর এবং ব্যবসা হস্তান্তর সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞপ্তিটি এই গ্রন্থের শেষে সংকলন করে দেওয়া হয়েছে।

লেখক-প্রসঙ্গে

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র একটি স্মরণীয় স্থানের অধিকারী। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর স্রষ্টা টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে বাঙলা সাহিত্যে অধিকতর পরিচিত হলেও ইংরেজী গ্রন্থ রচনাতেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ (২২শে জুলাই, ১৮১৪) কলকাতার নিমতলার প্রসিদ্ধ মিত্র পরিবারে প্যারীচাঁদের জন্ম। এই মিত্র পরিবারের আদি নিবাস হুগলী জেলার হরিপাল থানার পানিসেওলা গ্রামে। প্যারীচাঁদের পিতা রামনারায়ণ কোম্পানির কাগজ, হুণ্ডি প্রভৃতির ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তিনি রামমোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন। তাঁর পাঁচ পুত্র মধুসূদন, শ্যামচাঁদ, নবীনচাঁদ, প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদের মধ্যে শেষোক্ত দুইজনই বাঙলাদেশের কীর্তিমান পুরুষদের অন্যতম।

বাল্যকালে প্যারীচাঁদ গুরুমহাশয় ও মুনশীর কাছে যথাক্রমে বাঙলা ও ফারসী শিক্ষা করেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই প্যারীচাঁদ ইংরেজীশিক্ষা লাভের জন্য হিন্দু কলেজের একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময় তিনি 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর অন্যতম প্রধান স্রষ্টা ডিরোজিওর কাছে পড়ার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এর পূর্বে ৮ই মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ অধিবেশনে কর্তৃপক্ষ প্যারীচাঁদকে এই লাইব্রেরির

সাব-লাইব্রেরিআন পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বিশেষভাবে সার্ জন পীটার গ্রাণ্টের সুপারিশের জোরেই প্যারীচাঁদ এই পদ লাভ করতে সমর্থ হন। প্যারীচাঁদ তাঁর অসাধারণ কর্ম-ক্ষমতার গুণে কর্তৃপক্ষের প্রশংসা অর্জন করেন এবং সেইজন্য ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরিআন স্টেসি (Stacey) পদত্যাগ করলে তিনি মাসিক ১০০ টাকা বেতনে লাইব্রেরিআন ও সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদ লাইব্রেরির কাজ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেও তাঁর পূর্ব পরিশ্রমের স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে অবৈতনিক সেক্রেটরী ও লাইব্রেরিআনের পদে গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া এই বৎসরেই তিনি লাইব্রেরির একজন অবৈতনিক কিউরেটর হওয়ার সম্মানও লাভ করেন। এরপর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে লাইব্রেরি কাউন্সিল গঠিত হলে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তার সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ব্যবসায়ী হিসাবে প্যারীচাঁদ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি কালাচাঁদ শেঠ ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সঙ্গে 'কালাচাঁদ শেঠ অ্যাণ্ড কোং' নামে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে তারাচাঁদ অবসর গ্রহণ করলে এবং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কালাচাঁদের মৃত্যু হলে প্যারীচাঁদ নিজেই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর দুই পুত্রকে অংশীদার করে 'প্যারীচাঁদ মিত্র অ্যাণ্ড সন্স' নামে কারবার চালিয়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ইংরেজ বণিকেরা তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এই জন্য তাঁকে গ্রেট ঈস্টার্ণ হোটেল কোং লিমিটেড, পোর্ট ক্যানিং ল্যাণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট কোং, হাওড়া ডকিং কোং লিমিটেড প্রভৃতি ইংরেজ কোম্পানির ডিরেক্টর করা হয়। চায়ের ব্যবসায়ে তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল বলে তিনি বেঙ্গল টি কোং, ডারাং টি কোং

লিমিটেড প্রভৃতি কোম্পানির ডিরেক্টর নিযুক্ত হন।

বাঙলা দেশের নবজাগরণের যুগে প্যারীচাঁদের জন্ম। এই সময় সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নবজাগরণের ভাব ও চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্যারীচাঁদের সঙ্গে প্রায় অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য সভা-সমিতি, পত্রপত্রিকা প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্যারীচাঁদ ছিলেন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার যুগ্ম-সম্পাদক, বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আদি সদস্য, বেথুন সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক, পশুক্লেশনিবারণী সভার প্রথমে কার্যনির্বাহক সভার সদস্য ও পরে অবৈতনিক সম্পাদক, বঙ্গদেশীয় সামাজিক বিজ্ঞান সভার যুগ্ম অবৈতনিক সম্পাদক, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার প্রথমে সদস্য এবং পরে সহকারী সভাপতি ও অনারারি মেম্বার, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সদস্য, হেয়ার প্রাইজ-ফাণ্ড কমিটির সেক্রেটরী ও স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ও তার কিছু দিন পরেই অনারারি জাস্টিস নিযুক্ত হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হবার সম্মান লাভ করেন। এই সময় তিনি হাইকোর্টের গ্রাণ্ড জুরর হন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাস থেকে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাস পর্যন্ত তিনি বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁরই বিশেষ চেষ্টায় পশুক্লেশনিবারণ সম্বন্ধে দুটি বিল পাশ হয়।

প্যারীচাঁদ প্রথম জীবনে হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বলে মূর্তিপূজা সমর্থন করতেন। কিন্তু পরে হিন্দু কলেজের কয়েকজন বন্ধুর প্রভাবে প্রচলিত হিন্দুধর্মের রীতিনীতিতে সংশয়ান্বিত হয়ে তিনি ব্রহ্মবাদী হয়ে পড়েন। পরে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে পত্নীবিয়োগের পরে তিনি প্রেততত্ত্বের চর্চায় মেতে ওঠেন।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনেকগুলি প্রেততত্ত্বালোচনা সভার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তিনি লণ্ডনের ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্-এর অনারারি করেসপণ্ডিং মেম্বার, লণ্ডনের সেন্ট্রাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্-এর অনারারি মেম্বার, কলকাতার ইউনাইটেড অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস্-এর সহকারী সভাপতি, নিউ ইয়র্কের থিয়সফিক্যাল সোসাইটির করেসপণ্ডিং ফেলো ও তার বঙ্গীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে প্যারীচাঁদের অনেক মূল্যবান রচনা লণ্ডনের 'স্পিরিচুয়ালিস্ট,' আমেরিকার 'ব্যানার অব লাইট' ও বোম্বাইয়ের 'থিয়সফিস্ট' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। এই সব প্রবন্ধের বেশীর ভাগই তাঁর 'The Spiritual Stray Leaves' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

প্যারীচাঁদ 'ক্যালকাটা রিভিয়ু', 'ইণ্ডিয়া বিভিয়ু' 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড', 'ইংলিশম্যান', 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'বেঙ্গলী হরকরা', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায় অনেক গবেষণামূলক ও চিন্তাশীল ইংরেজী প্রবন্ধ লেখেন। প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এর শুধু লেখক শ্রেণীভুক্তই ছিলেন না, এই পত্রিকা-দুটির পরিচালনায় তাঁর সাহায্যের পরিমাণও কম নয়। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিদ্যাকল্পদ্রুমে'র ৫ম খণ্ডে (১৮৪৭) প্যারীচাঁদের তিনটি রচনা ('যুধিষ্ঠিরের চরিত্র', 'প্লেতোর চরিত্র' ও 'বিক্রমাদিত্যের চরিত্র') স্থান পেয়েছে। রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে মহিলাদের উপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি মাসিক পত্রের প্রকাশ প্যারীচাঁদের এক অক্ষয় কীর্তি।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অগস্ট এই 'মাসিক পত্রিকা' প্রথম জন্মলাভ করে চার বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিল।

প্যারীচাঁদের যুগান্তরকারী উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর প্রায় সম্পূর্ণটাই 'মাসিক পত্রিকা'র ১ম বর্ষের ৭ম সংখ্যা থেকে

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদের 'রামারঞ্জিকা'র প্রস্তাবসমূহ 'মাসিক পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যা থেকেই আত্মপ্রকাশ করে। সেদিক দিয়ে 'রামারঞ্জিকা' 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর পূর্ববর্তী।

ইংরেজী ও বাঙলা—এই উভয় ভাষাতেই প্যারীচাঁদের সমধিক ব্যুৎপত্তি ছিল। তবে ইংরেজীর চেয়ে বাঙলাতেই তাঁর সমধিক প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে নবেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটার সময় প্যারীচাঁদ উদরী রোগে ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্যারীচাঁদের মতো চরিত্রবান ব্যক্তি দুর্লভ। তাঁর মাতৃভক্তি, দেশ ও সমাজসেবার আগ্রহ, ব্যবসায়ে সাধুতা, পরোপকারপ্রবণতা প্রভৃতি গুণ আদর্শস্থানীয়। পিতার মতো তাঁর সংগীতানুরাগও উল্লেখযোগ্য। তিনি সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার এক আশ্চর্য কল্যাণকর সম্মেলন দেখা যায়। এই জন্যই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর তারিখে তাঁর শোককাতর পরিবারকে লিখিত একটি পত্রে তাঁকে দেশীয় ও ইওরোপীয় সমাজের মধ্যে একটি যোগসূত্র বলে উল্লেখ করেন। বাঙলার নবযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতিটি আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়ে তাঁর প্রগতিশীলতার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছেন।

তবে প্যারীচাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বাঙলা সাহিত্যের ভাষার সংস্কার সাধন ও তার বিষয়সীমার সম্প্রসারণ।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্যানিং লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত 'লুপ্ত রত্নোদ্ধার' বা ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা 'বাংলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,

"যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের

উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। 'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থাযী ও চিবস্মবণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেম, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যেব যে উপকাব হইয়াছে, আব কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।"

বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদের কৃতিত্বেব কথা এব চেযে ভাল করে আব কেউ বলতে পারেননি।

প্যাবীচাঁদ সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্যেব জন্য দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: প্যাবীচাঁদ মিত্র (সাহিত্যসাধক চরিতমালা নং ১৯); হবিমোহন মুখোপাধ্যায়: বঙ্গ-ভাষার লেখক ১ম ভাগ, কলিকাতা ১৯০৪ ও ডঃ সুশীলকুমাব গুপ্ত: উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ, কলিকাতা ১৯৫৯।

সাধারণ সম্পাদকের নিবেদন

দেশবিদেশের সকল সীমানার বাইরেই মানুষের যথার্থ সাক্ষাৎ পাওয়া যায়. এই বিশ্ববোধের মৃত্যু নেই বলেই মানবতা আজো মৃত্যুঞ্জয়। এই বোধে প্রদীপ্ত অনেক সার্থক মানুষের কথা ইতিহাস জানে। দূর অতীতের বা অন্য দেশের ইতিহাস থেকে নয়, এই বাংলাদেশেরই গত শতকের ইতিবৃত্ত থেকে এমন একজন পুণ্যশ্লোক পুরুষের উদাহরণ দেওয়া সম্ভব। বাঙালীর স্মৃতি যত দুর্বলই হোক, ডেভিড হেয়ারকে সে স্মৃতি বোধ করি কখনই হারাবে না।

ডেভিড হেয়ারের জন্ম এ দেশে নয়, সুদূর স্কটল্যাণ্ডে, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। ধর্মে খ্রীষ্টান এবং কর্মে ঘড়ির কারবারী। ঘড়ির ব্যাবসার সূত্রেই ১৮০০ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং কয়েক বছরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই ব্যাবসা তাঁর সহকারী গ্রেকে হস্তান্তরিত করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের ভাষায়, 'দুর্গতি-দুর্গম' বাংলাদেশকে ডেভিড হেয়ার আত্মীয়ের মতো ভালোবেসেছিলেন। এ তুলনাকে আর একটু গভীর করে বলা যায়, এ দেশকে তিনি তাঁর মায়ের মতোই ভালোবেসেছিলেন। ইংরেজ-শাসনের আদিপর্বে তাঁর আবির্ভাব। নানাবিধ উন্নতি সংস্কারের পরিকল্পনা তখনও শাসক-চিত্তকে অধিকার করেনি। এই সময়েই হেয়ারের মতো একজন সাধারণ ঘড়ির কারিগরের অসাধারণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, সমস্ত সংস্কারের আগে যে সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া প্রয়োজন তা হলো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন। মানুষ গড়তে হলে শিক্ষাকে প্রশস্তভিত্তিক করতে হবে, দেশের প্রত্যেক প্রান্তে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে, তবেই দেশের উন্নতি সম্ভব। এই পবিত্র

ব্রতের উদ্‌যাপনের জন্যই বোধ হয় তিনি ব্যক্তিগত কারবার ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং আমৃত্যু বিদ্যাদানে অতন্দ্র ছিলেন। রাধানাথ শিকদার হেয়ারকে 'প্রভাতী তারা'র সঙ্গে উপমিত করে যখন বলেন, হেয়ার যেন আমাদের অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করবার জন্য আমাদের মধ্যে এসেছেন, তখন সে উক্তি আক্ষরিক সত্য রূপেই প্রতিভাত হয়।

হিন্দু কলেজের ইতিহাস যদি যথার্থই 'প্রগতির ইতিহাস' হয়ে থাকে, তবে সে ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব ডেভিড হেয়ারের। হিন্দু কলেজের আদি পরিকল্পক ডেভিড হেয়ার কি না তা নিয়ে কেউ কেউ সংশয় প্রকাশ করলেও প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখের বা 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া', 'ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার', ১৮৩৫ সালের রিপোর্ট প্রভৃতির সাক্ষ্যে মনে হয়, হেয়ারই প্রথম হিন্দু কলেজের পরিকল্পনা করেন। রাজনারায়ণের ভাষায়, তিনি "সর্বপ্রথম হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন।" সেই সময় স্বাভাবিকভাবেই অনেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কলেজ স্থাপনে অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু হেয়ারই যে হিন্দু কলেজের আদি পরিকল্পক ছিলেন তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই ('পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য)।

'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' ও 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' নামে যে- দুটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল, হেয়ার তাদের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন ইউরোপীয় সম্পাদক এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের অনুমান, 'স্কুল বুক সোসাইটি'কে হেয়ার বাৎসরিক ১০০৲ টাকা চাঁদা দিতেন (পৃঃ ৬১)। স্কুল সোসাইটির সূত্রে তিনি এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার দুরবস্থার সঙ্গে পরিচিত হন এবং সেই সঙ্গে জানতে পারেন অধিকাংশ শিক্ষার্থীর দারিদ্র্যের কথা। ফলে তাঁর আনুকূল্যে সিমলা স্কুল, আরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙা স্কুল দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষাসত্র হয়ে ওঠে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের সোসাইটির রিপোর্টে জানা যায়, সে সময়ে "আরপুলিতে হেয়ারের বিদ্যালয়টি বস্তুতঃ তাঁর নিজের ব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছিল" (পৃ. ৬৬)। দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারেও হেয়ার আগ্রহী

ছিলেন এবং একবার তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, "আরো দশ বছর যদি তিনি জীবিত থাকেন তা হলে এদেশীয় মহিলাদের শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন" (পৃ. ৮৩)।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মতো উচ্চতর ও বিশেষ শিক্ষার প্রতিও হেয়ারের সদাজাগ্রত দৃষ্টি ছিল। উদাহরণস্বরূপ মেডিকেল কলেজের প্রারম্ভিক পর্যায়ে ও প্রগতিতে তাঁর প্রভাব ও সহযোগিতার কথা বলা চলে। প্রথমে সম্পাদক ও পরে কলেজ কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য-রূপে তিনি মেডিকেল কলেজের উন্নতিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন (পৃ. ৫৭ ০৮, ৯৫)।

-দেশের সর্বস্তরে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করার সঙ্গে সে আলো বিকিরণের পদ্ধতি সম্পর্কেও হেয়ার ভেবেছিলেন। অর্থাৎ ইংরেজী না মাতৃভাষা, কিসের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে, সে চিন্তাও হেয়ারকে নাড়া দিয়েছিল। এ সম্পর্কে হেয়ারের সিদ্ধান্ত ছিল, শুধু ইংরেজী নয়, সেই সঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়াও একান্ত আবশ্যক এবং সে উদ্দেশ্যে সাবলীল ইংরেজী ও মাতৃভাষায় লিখিত উন্নত ধরনের বই প্রকাশের গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছিলেন (পৃ. ৬)। বাংলাভাষায় পারদর্শিতালাভের উপর তিনি খুব জোর দিতেন (পৃ. ৬৮) এবং তরুণমতি ছাত্রদের উপযোগী প্রাথমিক বা ঐ ধরনের বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য পণ্ডিতদের নিযুক্ত করেছিলেন (পৃ. ৮০)। শিক্ষার বাহন নিয়ে যখন দেশ-মনীষা দ্বিধাবিভক্ত, তখন হেয়ার যে সমন্বয়ী পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন, তা তাঁর দূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

মূলত 'দেশীয় শিক্ষার জনক' রূপে পরিচিত হলেও হেয়ার তৎ-কালীন বাংলা দেশের বৃহত্তর জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অংশ নিয়ে-ছিলেন। বাংলা দেশের জনগণের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার ছিলেন হেয়ার। তাই ১৮৩৫ সাল ও তার পর থেকে যখন বিদেশে কুলি চালানের ব্যাবসা শুরু হলো, তখন হেয়ার জোর করে বাইরে কুলি পাঠাবার প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানালেন। তেমনি

দেওয়ানী মকদ্দমায় জুরির দ্বারা বিচারের প্রবর্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রচলিত সনদের কিছু কিছু ত্রুটিপূর্ণ ধারার সংশোধন, বিচারালয়গুলিতে ফারসী ভাষার ব্যবহার রদ প্রভৃতি বিবিধ সংস্কার-মূলক কাজে হেয়ারের কর্মোদ্যোগ ও শ্রম স্মরণীয় হয়ে আছে। রাম-মোহনের আত্মীয় সভা, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, ইয়ং বেঙ্গল, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, এশিয়াটিক সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি, ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটি প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্বৎসমাজ ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংলণ্ডের 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুকূলে যে প্রস্তাব কালীকৃষ্ণ দেব করেছিলেন, হেযার তাকে সমর্থন করেছিলেন। হেযারের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক যথার্থই বলেছেন, "হেযার প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল সকল ভাবচিন্তার ভাল দিকটি গ্রহণ করতেন।"

ছাত্রপ্রীতি, পরোপচিকীর্ষা, চিত্তের ঔদার্য ও সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি যে-সব মানবিক গুণ ক্রমশ দুর্লভ হয়ে আসছে—যদিচ তা পৃথিবী থেকে কখনোই বিলুপ্ত হবার নয—সেই সব গুণে হেযারের চরিত্র নিত্য দীপ্যমান ছিল। তাঁর ছাত্রপ্রীতি ঐতিহ্যরূপে উজ্জ্বল। শোনা যায় বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে বাবা বা ভাইয়ের মতো তাঁর সঙ্গে ছেলেদের পড়াশোনা তাদের ভালো-মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। যিনি ছিলেন মূর্তিমান 'ছাত্রের দেবতা', ছাত্রপল্লী কলেজ স্কোয়ার ছাড়া তাঁর যোগ্য সমাধিস্থল আর কি হতে পারে ?

আবার সত্যেন্দ্রনাথের হেযার প্রশস্তি মনে আসে 'নব্য বঙ্গে বিকল ঘড়িতে বিনি মূলে কলবল নিত্য তুমি যোগাযেছ কত!' সত্যেন্দ্রনাথ বেঁচে থাকলে দেখতে পেতেন, 'নব্য' নয়, ভব্য বঙ্গে ঘড়ি আবার বিকল হয়েছে। এবং সে ঘড়িতে কলবল যোগাবার মতো এ

কালে আর কোনো হেয়ারের আবির্ভাব সম্ভব নয়, সম্ভব নয় তাঁর আদর্শপ্রাণিত বাঙালী, এবং এ কথা ভেবে হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন।

এবং হয়তো কোন এক আশান্বিত মুহূর্তেই আবার বলতেন, ভেজালের দেশে বিদেশী ডেভিড হেয়ারের মতো একজন খাঁটি মানুষের জীবনী পাঠেও যদি কিছুটা ভেজাল কমে!

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
শরৎ।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

প্রকাশকের নিবেদন

সৎ গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা যাতে বাংলা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বেশি দিন পরিগণিত না হতে পারে, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা 'সম্বোধি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' প্রকাশ করব স্থির করেছি। গ্রন্থমালার পরিকল্পক ও সাধারণ সম্পাদক কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর তিনটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারব বলে আশা রাখি।

এই গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ 'ডেভিড হেয়ার' ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের A Biographical Sketch of David Hare-এর বঙ্গানুবাদ। তরুণ গবেষক ও কবি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্ত গ্রন্থটি সম্পাদনা করে আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সৎ পাঠকের উপর ভরসা করেই সৎ গ্রন্থের প্রকাশনাকে আমরা আনন্দময় কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছি। হিসেবে ভুল করিনি বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সূচীপত্র

মূলগ্রন্থ

ভূমিকা

যে তথ্যসমূহের ওপর নির্ভর করে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে, তা পর্যাপ্ত নয়। রচনাটির প্রতি যে সুবিচার করা হয়নি, সে বিষয়ে আমি সচেতন, তাই পাঠকের মার্জনা ভিক্ষা করে নিচ্ছি। এই সুযোগে আমি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রেভারেণ্ড ডঃ কে. এম. ব্যানার্জিকে তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের জন্য সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। মিঃ কোল্‌স্‌ওয়াদি গ্রাণ্টের কাছেও আমি বিশেষভাবে ঋণী। তিনি আমায় অনেক পরামর্শ দিয়েছেন এবং গ্রন্থান্তর্ভুক্ত চিত্রগুলির জন্য তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকাব করতে হয়েছে। এখানে উল্লেখ করতে পারি যে হেয়ার স্ট্যাচু কমিটিকেও তিনি মূল্যবান সাহায্য দান করেছেন। মিঃ সাট্‌ক্লিফ হিন্দু কলেজেব দলিল দস্তাবেজ এবং অধুনালুপ্ত নথিপত্র থেকে সংগৃহীত হিন্দু কলেজ ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন; তিনি আমার অপরিসীম ধন্যবাদের পাত্র। বাংলা দেশের গভর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ডি. বি. স্মিথ, বাবু আনন্দকৃষ্ণ বসু প্রমুখের কাছে এবং যে সব বন্ধু হেয়ার সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত স্মৃতির কথা বলেছেন তাঁদেব সবাইয়ের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ইউনিঅন ব্যাঙ্ক অফ স্কটল্যাণ্ডের মিঃ রাস্ট-এর কাছ থেকে সংগৃহীত নিম্নলিখিত তথ্যগুলি ডঃ জর্জ স্মিথ অনুগ্রহ করে পাঠিয়েছেন :

হেয়ার কোন সময়েই অ্যাবারডিনে ঘড়ি মেরামতের কাজ করতেন না। তাঁর পিতা লণ্ডনে ঘড়ি মেরামতের কাজ করতেন; তিনি অ্যাবারডিনের এক মহিলাকে বিবাহ করেছিলেন। ভারতবর্ষের আসার পূর্বে তাঁর মাতার আত্মীয়বর্গের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য হেয়ার অ্যাবারডিনে গিয়েছিলেন, এবং সেই একবারই মাত্র তাঁর অ্যাবারডিন পরিদর্শন। ডেভিডের ভাই ছিলেন তিনজন। তাঁদের মধ্যে একজন, জোশেফ ছিলেন লণ্ডনের ব্যবসায়ী। তিনি ৪৮, বের্ডফোর্ড স্কোয়ারে অনেকদিন বাস করেছিলেন। আর একজন হলেন আলেকজাণ্ডার, তিনি হেয়ারের পরে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। অনুমান করা যায় এইখানেই একটিমাত্র কন্যা জ্যানেটকে রেখে তিনি মারা যান। (তাঁদের অপর ভাই, জনও ভারতবর্ষে এসেছিলেন, কিছু পরিমাণ দক্ষতা অর্জন করে তিনি (দেশে) ফিরে যান এবং সেখানে তাঁর ভাই জোশেফের সঙ্গে বাস করতে থাকেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর কন্যা রোজালিণ্ডকে রেখে যান। রোজালিণ্ড সিডমাউথের ডঃ বি. হজকে বিবাহ করেন। তাঁদের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল।

হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গণে ডেভিড হেয়ারের মর্মর মূর্তি

ডেভিড হেয়ার

প্রথম অধ্যায়

ডক্টর জনসন বলেছেন: চিরস্থায়ী স্মৃতিসৌধ কিংবা নথিপত্রাদি আশ্রয় করে ইতিহাস রচনা করা সম্ভব, জীবনকাহিনী নয়। জীবনী লেখার একমাত্র উপকরণ হল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা; এই অভিজ্ঞতাও আবার প্রতিদিন ক্ষয় পেতে পেতে অল্পকালের মধ্যেই বিস্মরণের গভীরে হারিয়ে যায়।

ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ঘড়ি প্রস্তুত করার কাজে শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর বয়স যখন পঁচিশ বছর সেই সময়, অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। তখন তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না, তাই কয়েক বছর মধ্যেই হেয়ার (তাঁর কাজে) সুনাম অর্জন করলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই তিনি তাঁর ব্যবসা হস্তান্তর করলেন মিঃ ই. গ্রে-র কাছে। সেকালের একটি সংবাদপত্র এই পরিবর্তন লক্ষ করে লিখেছিল: 'প্রবীণ ব্যক্তি আবার বৃদ্ধ হলেন'। হেয়ার রামমোহন রায়ের মধ্যে একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে খুঁজে পান। রামমোহন

তখন আস্তিক্যবাদ প্রচার করতে শুরু করেছেন, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন এবং সতীদাহ প্রথা নিরোধ করবার জন্যে সব রকমের চেষ্টা করে বেড়াচ্ছেন। দেশবাসীর চিত্তকে আলোকিত করতে গেলে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার যে একান্ত প্রয়োজনীয়, সেকথাও তিনি তখন প্রচার করতে শুরু করেছেন। তাঁর বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন মজুমদার, কালীনাথ মুন্সী এবং পরবর্তীকালে চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

মিস্ কার্পেণ্টারের লেখা 'লাস্ট ডেজ ইন ইংলণ্ড অফ্ রামমোহন রায়' নামে বইটি থেকে আমরা হেয়ারের ভাইদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পারি। তিনি লিখেছেন, 'কলিকাতার সুপরিচিত এবং অতি শ্রদ্ধেয় ইংরেজ নাগরিক মিঃ ডেভিড হেয়ার, রাজার (রামমোহন) সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতা থাকার ফলে তাঁর বেডফোর্ড-নিবাসী ভাইদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন রাজাকে যথাসম্ভব সাহায্য করেন,—বিশেষ করে স্বদেশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক দেশে (এসে) যেসব সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা তিনি অবশ্যই অনুভব করবেন, তা যেন তিনি পান ; তাঁর সরল স্বভাব এবং আমাদের আচার আচরণের সঙ্গে অপরিচিতির ফলে যে নানান ধরনের বাধা বা অসুবিধার সম্মুখীন তিনি হবেন, সেগুলির হাত থেকে তাঁকে যেন রক্ষা করা হয়। তিনি (ইংলণ্ডে) পৌঁছনোর কয়েকমাস পরে অবশেষে অতি কষ্টে হেয়ারের ভাইয়েরা তাঁকে তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিতে রাজী করান। কয়েক সপ্তাহের জন্য তিনি যখন

ফ্রান্সে গিয়েছিলেন, এবং প্যারিসে একাধিকবার লুই ফিলিপের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই সময় এঁদের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গে প্যারিস গিয়েছিলেন।' মিস্ কার্পেণ্টার লিখেছেন, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় ব্রিস্টলের কাছে স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভ-এ এসে উপস্থিত হন, 'সঙ্গে ছিলেন তাঁর কলিকাতা-নিবাসী শ্রদ্ধেয় বন্ধু (বর্তমানে স্বর্গত) মিঃ ডেভিড হেয়ারের কন্যা মিস্ হেয়ার।' মিস্ হেয়ার কিন্তু আসলে অকৃতদার ডেভিড হেয়ারের কন্যা ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

এথেনিয়াম-এ মিঃ আর্নট লিখেছেন যে, 'রাজা ইংলণ্ডে পদার্পণ করবার পর থেকেই হেয়ার পরিবার তাঁর প্রতি অতিথিপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন। এ আতিথেয়তা সহৃদয়, মার্জিতরুচিস্নিগ্ধ, এবং সম্পূর্ণ স্বার্থনিরপেক্ষ। ইংরেজ চরিত্রের এই সদ্‌বৃত্তিগুলি সম্মানযোগ্য।' রাজার অসুস্থতার সময় মিস্ হেয়ার তাঁকে খুব যত্ন করতেন। প্রায়ই তিনি রাজাকে বাইবেল পড়ে শোনাতেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর, রামমোহনকে সমাহিত করার সময় অপর সকলের সঙ্গে জন হেয়ার, জোসেফ হেয়ার এবং জেমস হেয়ারও উপস্থিত ছিলেন।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের আগ্রহ শুধু পার্থিব বিষয়েই নিবদ্ধ থাকে। কি উপায়ে ঐশ্বর্য, খ্যাতি, সম্মান কিংবা ক্ষমতা করায়ত্ত করা যায় সেই চিন্তাতেই তাঁরা সাধারণত ব্যস্ত থাকেন; তাঁদের অন্তরের মহৎ প্রেরণাগুলির সাহায্যেও তাঁরা সেই কামনাই চরিতার্থ করতে প্রয়াসী হন। (কিন্তু) এমনও অনেকে আছেন যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে,

নিজেদের বঞ্চিত রেখে পরহিতসাধনায় ব্রতী; খ্যাতি এঁদের সঙ্কুচিত করে তোলে। এঁদের আমরা তুলনা করতে পারি দেবদূতের সঙ্গে। কারণ, এঁদের সংস্পর্শে যাঁরা আসেন, বা এঁদের জীবনী যাঁরা পাঠ করেন, তাঁরা সকলেই এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বোধিত হয়ে ওঠেন।

হেয়ার সুপণ্ডিত হিসেবে খ্যাত ছিলেন না; কিন্তু তাঁর সৎস্বভাবী সাধারণ বুদ্ধি ছিল উন্নত ধরনের। কি নির্দিষ্ট উপায় গ্রহণ করলে এবং কিভাবে সুশৃঙ্খল কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে অভীপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় তা হেয়ারের ভালোভাবেই জানা ছিল।

জনৈক ফরাসী দস্যুর হাতে অনেকের সঙ্গে ধরা পড়ার পর হাওআর্ডকে এক 'ঘৃণ্য অন্ধকূপে' বন্দী জীবন যাপন করতে হয়, সেখান থেকেই তিনি প্রথম মানবহিতৈষণার প্রেরণা লাভ করেন। কলকাতাব দেশীয় সমাজে হেয়ারের অবাধ গতিবিধি ছিল; খুব ভালোভাবে তিনি সে সমাজকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর সঙ্কল্প গড়ে উঠেছিল। দেশীয় সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি পরিচয় স্থাপন করেছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি তাঁদের বাড়িতে যেতেন; নাচে, তামাসায় তাঁকে উপস্থিত থাকতে দেখা যেত। আদর করে, নানারকম খেলনা দিয়ে তিনি (সেসব জায়গায়) শিশুদের হৃদয় জয় করে ফেলেছিলেন।

হিন্দুদের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ক্রমেই

গভীর হয়ে উঠছিল। তাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতেন—তাদের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে ব্যথিত করে তুলত। যে-মানুষের মধ্যে নিবিড় মানবপ্রেম, অপরিসীম পরোপচিকীর্ষা বিদ্যমান, তিনি সব সময়ই নিজের অন্তরের সদ্‌বৃত্তিগুলিকে রূপ দেবার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজে বেড়ান; দৈবের বিচিত্র নিয়মে সে ক্ষেত্র তাঁরা শীঘ্রই খুঁজেও পান। কলকাতার হিন্দুদের মধ্যেই হেয়ার সন্ধান পেলেন তাঁর সেই ঈপ্সিত ক্ষেত্রের।

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইংরেজী ভাষা চর্চায় বেশ প্রেরণা জাগল। অ্যাটর্নীর কেরানী হতে পারলে অনেক সুযোগসুবিধা পাওয়া যেত। কেরানীরা এখান ওখান থেকে কিছু কিছু পরিভাষা শিখে রাখত; লোকে যখন তাদের মুখ থেকে সেগুলি শুনত তখন তাদের সমীহ করে চলত।

রামরাম মিশ্র ছিলেন প্রথম ইংরেজীতে সুপণ্ডিত পুরুষ। তিনি শিক্ষকতা করতেন। রামনারায়ণ মিশ্রও ছিলেন সুপণ্ডিত; পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী। আনন্দরাম নামে জনৈক ব্যক্তির অবশ্য শব্দাবলী সম্পর্কে জ্ঞান ছিল গভীরতর; তখনকার দিনে তাঁর এই ব্যুৎপত্তি এম. এ. ডিগ্রীর সমান মর্যাদা পেত। কালক্রমে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হল। রামমোহন নাপিত, কৃষ্ণমোহন বসু, ভুবন দত্ত, শিবু দত্ত, অ্যারাটুন পিটার্স, শেরবার্ন প্রমুখ ব্যক্তিরা ছিলেন বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী। কিন্তু দরকারী বইয়ের অভাব খুব বেশি অনুভূত হতে লাগল। টমাস ডাইস-এর লেখা স্পেলিং, স্কুলমাস্টার, অ্যারাবিয়ান নাইটস, প্লীজিং টেল্‌স্ প্রভৃতি বই তখন পড়ানো

হত। বাংলাভাষা চর্চার ক্ষেত্র তখন ছিল সীমাবদ্ধ। চৈতন্য-চরিতামৃত, মনসামঙ্গল, ধর্মগান, মহাভারত, রামায়ণ (সংক্ষিপ্ত), গুরুদক্ষিণা, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল, এবং বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি বইগুলিই ছিল তখনকার দিনে প্রচলিত। কিন্তু প্রাথমিক পাঠের উপযোগী কোন বই তখন ছিল না, এবং সেইজন্যে বাংলাভাষা সঠিকভাবে শেখা ছিল খুব দুরূহ। প্রচলিত বইগুলি ছিল সময় কাটানোর উপযোগী। অঙ্ক, পত্ররচনা, আর জমিদারীর হিসাবপত্র দেখা—বাঙালী ছেলেদের বাল্যকালে এইগুলিই শেখানো হত। শিক্ষাব ক্ষেত্রে হিন্দুদের কোন বিষয়ের প্রকৃত প্রয়োজন, হেয়ার তা সঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজী এবং মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক; তাই সাবলীল ইংবাজী ও মাতৃভাষায় লিখিত উন্নতধরনের বই ক্রমে ক্রমে অধিক পরিমাণে সরবরাহ করা একান্ত অপবিহার্য। এই অভাব মেটানোর দিকে সেইজন্যে তিনি মনোযোগ দিলেন। হিন্দু কলেজের জন্যে যে-পবিশ্রম তিনি করেছিলেন, আমরা প্রথমে তাই আলোচনা করব, যদিও (এটা ঠিক যে) একই সঙ্গে তিনি চেষ্টা করছিলেন আমাদেব মধ্যে কিভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়, এবং বইয়েব অভাব দূরীভূত হয়।

রামমোহন রায় এবং তাঁর বন্ধুরা একটি সমিতিস্থাপনের ইচ্ছায় এক সভা আহ্বান করেন। সমিতিস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল পৌত্তলিকতা উচ্ছেদ কবা। হেয়ার অনাহূতভাবে এই সভায় যোগ দেন। এইটিই তাঁর প্রথম পদক্ষেপ বলে ধরতে পারি। হেয়ার বললেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করার

বাস্তব পথ হল ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করা। তাঁরা সকলেই হেয়ারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিলেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করলেন না। হেয়ার তাই দেখা করলেন সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের সঙ্গে। সার্ ঈস্ট ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সার হাইড ঈস্ট তাঁকে দর্শন দিলেন, তাঁর সব কথা শুনলেন, এবং সমস্ত বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখনকার দিনে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (নামে জনৈক ব্যক্তির) উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তিনি যখন সার্ ঈস্টকে অভিবাদন জানাতে গেলেন তখন সার্ ঈস্ট তাঁকে অনুরোধ করলেন তাঁর স্বদেশবাসীরা হিন্দু-যুবকদের ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্যে কলেজ স্থাপনের অনুকূলে মত পোষণ করেন কিনা, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে। বৈদ্যনাথ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাঁর উপবীত তাঁর কাছে ছিল শ্লাঘার বস্তু। তিনি হিন্দু সমাজের গণ্যমান্য সকলের মত জেনে নিলেন, তারপর সার্ হাইড ঈস্টকে জানালেন যে এ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে তাঁরা সম্মত আছেন। সার্ হাইড ঈস্টের বাড়িতে কতকগুলি সভা বসল এবং (শেষ পর্যন্ত) এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে 'দেশীয় যুবকদের শিক্ষার জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে।' এরপর শোনা গেল রামমোহন নাকি কলেজের সঙ্গে জড়িত থাকবেন। রক্ষণশীল সদস্য যাঁরা ছিলেন তাঁরা তখন জানালেন যে কলেজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। বৈদ্যনাথও সামনে থেকে সরে গেলেন। প্রধান

বিচারপতিকে প্রভূত অসুবিধার মধ্যে পড়তে হল এবং অবশেষে পরিকল্পনাটি বানচাল হবার মত অবস্থা এল। হেয়ার এতদিন নিজেকে নেপথ্যে রেখেছিলেন, কিন্তু সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে (প্রস্তাবিত) কলেজটির যাতে কোন সম্পর্ক না থাকে, তার ব্যবস্থা করতে তিনি সচেষ্ট হলেন, এবং এই ভাবে রক্ষণশীল হিন্দুদের সমর্থন লাভ করলেন। রামমোহনকে কলেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে রাজী করাতে কোন অসুবিধা হয়নি, কারণ সদস্য হয়ে নিষ্ফল খ্যাতি আঁকড়ে থাকার চাইতে স্বদেশবাসীর শিক্ষাকে তিনি অনেক বেশি মূল্য দিতেন। কিন্তু হেয়ার যে-কাজ করেছেন তাও আমরা কখনই ভুলতে পারি না, (যদিও) তিনি ছিলেন নীরব কর্মী।

ব্যবস্থানুযায়ী একটি সভা অনুষ্ঠিত হল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন অগণিত সম্ভ্রান্ত হিন্দু; তাঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিতও ছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণ বললেন: 'আমরা এককালে সুশিক্ষিত জাতি ছিলাম, এখনও আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁদের সুপণ্ডিত বলতে পারি। কিন্তু দ্রুতপরিবর্তনশীল বর্বর শাসক-গোষ্ঠীর শাসনে এই বিজ্ঞানের সমূহ অবনতি ঘটেছে এবং জ্ঞানের প্রদীপ প্রায় নির্বাপিত হয়েছে।

তবে আমরা বিশ্বাস করি জ্ঞানের শিক্ষা এখন আবার প্রদীপ্ত হয়ে উঠছে; আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়, আমরা শিক্ষাদীক্ষায় আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠব।'

সার্ হাইড ঈস্ট সভায় ভাষণ দিলেন। সভাটি আহ্বান

করার তাৎপর্য তিনি বিশ্লেষণ করলেন, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি থেকে কি কি সুফল পাওয়া যাবে তাও তিনি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলেন। অনেক টাকা চাঁদা হিসেবে পাওয়া গেল। শোনা গেল, যে সমস্ত হিন্দু ভদ্রলোক সভায় উপস্থিত থাকেননি, তাঁরাও চাঁদা দিতে ইচ্ছুক। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে আরেকটি সভা আহূত হল। শিক্ষাবিস্তারের জন্যে কলকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত এ সভায় গৃহীত হল। স্থির হল, গভর্নর এবং কাউন্সিলের সদস্যদের পৃষ্ঠপোষক হবার জন্যে অনুরোধ জানানো হবে এবং সার্ হাইড ঈস্টকে সভাপতির ও জে. এইচ. হ্যারিংটনকে সহ-সভাপতির পদ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করা হবে।

আটজন ইওরোপীয় এবং কুড়িজন দেশীয় সদস্য দ্বারা গঠিত একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। লেফটেন্যান্ট আরভিন এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কমিটির উদ্যোগে কতকগুলি সভা ডাকা হল। হেয়ার এগুলিতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকলেও বেতন, তহবিল ও নানা সুযোগ সুবিধা দান ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কিছু দরকারী পরামর্শ দিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগস্টে অনুষ্ঠিত একটি সাধারণ সভায় এই আইনগুলি গৃহীত হল।* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুআরি গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হল। (এই উপলক্ষে) যেসব ইওরোপীয় ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মিঃ ই. হাইড ঈস্ট, মিঃ হ্যারিংটন এবং মিঃ হেয়ারের

* 'ক' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

নাম উল্লেখ্য। পরের দিন একাধিক দর্শক কলেজটি পরিদর্শন করলেন। দেশীয় সম্পাদক বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এ আশ্বাস সকলকে দিলেন যে বিদ্যালয়টি বর্তমানে শিশুবৃক্ষ হতে পারে, কিন্তু অনেক বছর পরে এটি ভারতের সর্ববৃহৎ বৃক্ষ—পরিণত বটতরুর আকারই ধারণ করবে; এর নিবিড় ছায়ার আশ্রয় অনেকের তাপ দূর করবে, অনেকের ক্লান্তি হরণ করবে।

কলেজটিকে পরবর্তীকালে চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাড়িতে এবং সেখান থেকে আবার ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়িতে স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গেল যে কলেজের আয় পর্যাপ্ত নয়। হেয়ার কমিটির একটি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন; তিনি দেখিয়ে দিলেন যে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে ইওরোপীয় সম্পাদকের মাসিক ৩০০ টাকা এবং দেশীয় সম্পাদকের মাসিক ১০০ টাকা বেতন যোগান সম্ভব নয়। এর ফলে লেফ্‌টেন্যান্ট আরভিন পদত্যাগ করলেন, কিন্তু বৈদ্যনাথ অবৈতনিক সম্পাদক হিসেবেই কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

দেশের সরকার নদীয়া এবং তিরহুতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা স্থির করলেন যে কলকাতায় একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করবেন। রামমোহন রায় নিজে ছিলেন সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, কিন্তু এই সরকারী সিদ্ধান্তের প্রবল বিরোধী হলেন তিনি এবং সরকারের কাছে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করলেন:

সপরিষদ গভর্নর জেনারেল
মহামান্য লর্ড আমহার্স্ট সমীপেষু,
মহাশয়,

জনসাধারণের স্বার্থে গৃহীত কোন সরকারী বিধানের ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে ভারতের বিনীত অধিবাসীরা আগ্রহী নয়। কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন এই সসম্ভ্রম বোধ সত্ত্বেও নীরব থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতের যাঁরা বর্তমান শাসক তাঁরা এদেশে আসছেন হাজার হাজার মাইল দূর থেকে। যেসব লোকের শাসনভার তাঁরা গ্রহণ করেছেন, তাদের ভাষা, সাহিত্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, এবং ধ্যানধারণা তাঁদের কাছে প্রায় সম্পূর্ণ নূতন এবং অপরিচিত। এদেশের লোকেরা যত সহজে নিজেদের দেশের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়, তাঁরা তত সহজে তা হতে পারেন না। তাই আমাদের উচিত বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষটির মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের কাছে নির্ভুল তথ্য সরবরাহ করা যাতে এদেশের পক্ষে হিতকর পরিকল্পনা রচনা করতে এবং তাকে কার্যকরী করে তুলতে তাঁরা সমর্থ হন। আমাদের দেশের উন্নতিবিধানের যে সৎ অভিপ্রায়ের কথা তাঁরা ঘোষণা করেছেন, তাকে আমরা এই ভাবে আমাদের আঞ্চলিক জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সাহায্য করতে পারব। এগুলি যদি না করি, তাহলে আমরা নিজেদের প্রতি কর্তব্যপালনে অবহেলার অপরাধে অপরাধী হব ; আমাদের শাসকেরা তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে ঔদাসীন্যের অভিযোগ আনবার নির্ভরযোগ্য সূত্র পেয়ে যাবেন। শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর উন্নতিসাধনের জন্য সরকারের প্রশংসনীয় আগ্রহ কলিকাতায় একটি নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সংকল্প-গ্রহণে প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষার এই আশীর্বাদের জন্যে ভারতবাসী চিরকৃতজ্ঞ থাকবে ; মানবজাতির শুভার্থী প্রত্যেকের এই কামনাই যেন থাকে যে শিক্ষা

বিস্তারের এই প্রয়াস মহত্তম নীতির দ্বারাই পরিচালিত হোক, যাতে সবচাইতে প্রয়োজনীয় গতিপথ বেয়ে জ্ঞানের এই ধারা প্রবাহিত হতে পারে।

যখন এই শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থাপনের কথা প্রস্তাবিত হয়েছিল, তখনই আমরা বুঝেছিলাম যে ইংলণ্ডের শাসনকর্তৃপক্ষ ভারতীয় প্রজাদের শিক্ষার খাতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে অর্থব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের হৃদয়ে নিশ্চিত আশা ছিল যে ঐ অর্থে প্রতিভাবান, শিক্ষিত ইওরোপীয়দের নিযুক্ত করা হবে এবং গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, এবং অন্যান্য যেসব ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ইওরোপীয়রা পূর্ণাঙ্গ দক্ষতা লাভ করে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের চাইতে উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, তাঁরা ভারতবাসীকে সেইসব বিজ্ঞানে শিক্ষিত করবেন। (দেশের) তরুণ সম্প্রদায়েব জন্যে আলোর বার্তা বহন কবে আনছিল যে-প্রজ্ঞার প্রত্যূষ, সানন্দ প্রত্যাশায় তার প্রতীক্ষায় ছিলাম আমরা, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতাবোধের মিশ্র অনুভূতিতে আমাদের মন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বিধাতা যে প্রতীচ্যেব সবচেয়ে উদার ও আলোকদীপ্ত জাতিগুলিকে এশিয়ায় আধুনিক ইওরোপের কলা এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞানবিস্তারের গৌরবময় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, সেইজন্য তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানিযেছিলাম।

(কিন্তু এখন) আমরা দেখছি যে সরকার হিন্দু পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এটি এমন এক ধরনেব জ্ঞানবিস্তারের সহায়ক হবে যা ইতিপূর্বেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। প্রকৃতির দিক দিয়ে লর্ড বেকনের পূর্বকালীন ইওরোপের শিক্ষাকেন্দ্রগুলির সঙ্গে তুলনীয় এই শিক্ষাকেন্দ্রটি তরুণ শিক্ষার্থীদের মন শুধুই ব্যাকরণগত জটিলতায় এবং আধিবিদ্যক তত্ত্বে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। এই জ্ঞানের অধিকারী যাঁরা হবেন তাঁদের

নিজেদের কাছে বা সমাজের কাছে এর ব্যবহারিক কোন মূল্যই থাকবে না ; যদি কিছু থাকে তাও নিতান্তই অল্প। দু-হাজার বছর আগে লব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে ছাত্ররা এই শিক্ষাকেন্দ্রে পরিচিত হবে : তাছাড়া (এই জ্ঞানকে ভিত্তি করে) পরবর্তীযুগের চিন্তাবিলাসীরা যেসব অর্থহীন শূন্যগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন সেইগুলিও ছাত্ররা শিখবে এখানে। এবং (একথা এখানে উল্লেখ্য যে) সাধারণভাবে এই ধরনের শিক্ষা ভারতবর্ষের সব অঞ্চলেই দেওয়া হয়ে থাকে।

সংস্কৃত ভাষা এত কঠিন যে তাকে আয়ত্ত করতে প্রায় জীবনব্যাপী সাধনা প্রয়োজন ; এই ভাষা আবার অনেকদিন ধরেই জ্ঞানবিস্তারের পথে দুস্তর বাধা হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আসছে। প্রায় অভেদ্য এই আবরণের তলায় যে জ্ঞানসম্পদ লুকিয়ে আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয় ; এই জ্ঞান আয়ত্ত করতে যে পরিশ্রম হবে, তার অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্য সে পরিশ্রমকে পুরস্কৃত করার মোটেই উপযুক্ত নয়। যতটুকু মূল্যবান সম্পদ এই ভাষায় বিধৃত রয়েছে, তার খাতিরে এই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখাই যদি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য নূতন সংস্কৃত কলেজ স্থাপন না করে অন্য উপায় অবলম্বন করা যেত। কেননা, অতীতে চিরদিন ধরেই এবং এখনও সারা দেশে অগণিত সংস্কৃতাধ্যাপক এই ভাষায় এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন বা আছেন। নূতন শিক্ষাকেন্দ্রটির উদ্দেশ্যও আবার এই ধরনের শিক্ষারই বিস্তারসাধন। সংস্কৃত ভাষার অধিকতর নিষ্ঠাপূর্ণ চর্চা যদি অভিপ্রেত হয়ে থাকে, তাহলে সে ইচ্ছা সফল করা যায় সবচাইতে যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যাপকদের কিছু বৃত্তি বা বেতনদানের ব্যবস্থা করে। তাঁরা আত্মপ্রেরণা থেকেই এই ভাষা অধ্যাপনার কাজে ব্রতী হয়েছেন ; এইভাবে পুরস্কৃত হলে তাঁদের কর্মোদ্যোগ আরো বৃদ্ধি পাবে।

এই সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে মহামান্য গভর্নর জেনারেলের উচ্চ পদমর্যাদার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জানিয়েই আমি একথা

বলার অনুমতি প্রার্থনা করছি যে, সরকার যদি তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করেন তাহলে ইংলণ্ডের শাসকসম্প্রদায় যে-উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষীয় প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য আলাদা ব্যয় মঞ্জুর করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। যেসব তরুণদের জীবনের সবচাইতে মূল্যবান পর্বে বারো বছরের মত সময় নষ্ট করে শুধু ব্যাকরণ, অর্থাৎ সংস্কৃত প্রকরণের জটিল তত্ত্বগুলি আয়ত্ত করতে প্রেরণা যোগান হবে তাদের কাছ থেকে সত্যসত্যই কোন উন্নতি আশা করা চলবে না। নিচের উদাহরণগুলি দিয়ে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করতে চেষ্টা করছি। 'খাদ' মানে খাওয়া, 'খাদতি'র অর্থ হোল 'সে' (পুরুষ), 'সে' (স্ত্রীলোক) বা 'ইহা' খায়। এখন প্রশ্ন জাগে সম্পূর্ণ ধাতু 'খাদতি' যদি নেওয়া যায়, তাহলে কি 'সে' (পুরুষ), 'সে' (স্ত্রীলোক) অথবা 'ইহা'র খাওয়া বোঝায়, না ধাতুটির বিভিন্ন রূপে এই অর্থটির স্বতন্ত্র অঙ্গগুলি ধরা পড়ে ? ইংরেজী ভাষায় কি একথা কখনো জিজ্ঞাসা করা হয় যে 'eat' বলতে কতখানি অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে, আর 's' বলতে কতখানি ? কোন শব্দ বা ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অংশ কি আলাদাভাবে অর্থ প্রকাশ করে, না সেই স্বতন্ত্র অংশগুলির সার্থক সমন্বয়ে একটি সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় ?

আত্মা কিভাবে উপাস্যের মধ্যে বিলীন হয়, কিংবা দৈবসত্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি এই ধরনের যেসব বিষয়গুলি বেদান্তে আলোচিত হয়েছে, সেই সম্পর্কিত তাত্ত্বিক চিন্তা থেকেও কোন উন্নতির কল্পলোক আশা করা বাহুল্য মাত্র। আরো অনেক বৈদান্তিক সূত্র আছে যেগুলি শেখায় যে কোন প্রত্যক্ষগোচর বস্তুরই প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, তারা শেখায় যে পিতা, ভ্রাতা, প্রকৃতপক্ষে কোন সজীব সত্তা নয়, তাই ভালবাসার প্রকৃত পাত্রও তারা নয় ; যত তাড়াতাড়ি তাদের ত্যাগ করা যায়, যত শীঘ্র জাগতিক সংসর্গ থেকে মুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল। এই ধরনের বৈদান্তিক মতবাদে যেসব তরুণ দীক্ষিত হবে, তারা যে সমাজের যোগ্যতর অঙ্গ

হিসেবে গঠিত হয়ে উঠবে তার কোন সম্ভাবনা নেই। মীমাংসার ছাত্র শুধু জানবে বেদান্ত থেকে কয়েক ছত্র শ্লোক আওড়ে ছাগ হত্যা করেও কি রকমভাবে পাপমুক্ত হওয়া যায়, অথবা জানবে, বেদের অংশবিশেষের প্রকৃত অর্থ কি বা কার্যক্ষেত্রে তার প্রভাব কতটুকু। কিন্তু এইসব জ্ঞানে প্রকৃত কোন মঙ্গল তার হবে না। ন্যায়শাস্ত্রের ছাত্ররাও যে সেই শাস্ত্র অধ্যয়নের পর কিছু মানসিক উৎকর্ষের অধিকারী হবে তা বলা চলে না। এ থেকে তারা শুধু জানবে জাগতিক সমস্ত বস্তুকে কিভাবে ও কতোগুলি আদর্শ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, বা, আত্মার সঙ্গে দেহের, দেহের সঙ্গে আত্মার, চোখের সঙ্গে কানের কি কাল্পনিক সম্পর্ক আছে।

ওপরে যে-ধরনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্বন্ধরহিত শিক্ষার বর্ণনা দেওয়া হল, তাতে উৎসাহ যোগানোর প্রযোজন কতটুকু তা আপনি বিচার করে দেখবেন। আমার বিনীত প্রার্থনা, বিষয়টি সঠিকভাবে বোঝবার জন্য লর্ড বেকনের পূর্বযুগীয় ইওরোপের বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবস্থার সঙ্গে তাঁর সাহিত্যসাধনার পরবর্তী যুগে জ্ঞানের প্রগতির তুলনা করে দেখবেন। প্রকৃত জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে ইওরোপকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখাই যদি অভিপ্রেত হত তাহলে মধ্য-যুগীয় পণ্ডিতদের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে রদ করে তার বদলে বেকনীয় দর্শনকে স্থান দেওয়া হত না। (ইংলণ্ডে এই ধরনের) মধ্যযুগীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল অজ্ঞতার পরিমণ্ডলকে জিইয়ে রাখবার সর্বোৎকৃষ্ট সহায়ক। তেমনি এই দেশেও অজ্ঞতার তমিস্রা স্থায়ী রাখার অভীপ্সা ব্রিটিশ আইনসভার যদি থাকে, তাহলে সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থাই হবে তার সর্বোত্তম উপায়। কিন্তু এ দেশের উন্নতি বিধান যেহেতু সরকারের লক্ষ্য, তাই শেষ পর্যন্ত আরো উদার এবং বুদ্ধিসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি এদেশে প্রবর্তন করতে হবে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা, এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে, এই লক্ষ্য সাধিত হবে যদি প্রস্তাবিত

অর্থ ব্যয় করে ইওরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন বিদ্বান লোককে নিযোগ করা যায়, এবং প্রয়োজনীয় বইপত্র, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যাদিতে সমৃদ্ধ একটি কলেজ স্থাপন করা যায়।

আমি মনে করি বিষয়টি আপনার কাছে বিবৃত করে স্বদেশবাসীর প্রতি আমি আমার গুরু দাযিত্ব পালন করছি। তাছাড়া যে-সহৃদয় রাজশক্তি এবং আইনসভা এদেশবাসীর উন্নতিবিধানের সঙ্কল্পে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সুদূর দেশের প্রতি মঙ্গলময় মনোযোগ দিয়েছেন, এভাবে তাঁদেব প্রতিও আমার কর্তব্য পালন করছি বলেই আমাব ধারণা। তাই আমার সবিনয বিশ্বাস, আপনার কাছে আমার অনুভূতি ব্যক্ত কবাব যে-স্বাধীনতা আমি নিযেছি, তা আপনি ক্ষমার চোখে দেখবেন।

বিনীত

বামমোহন বায

সরকাব এ পত্র পাবার পরেও তাঁদের মত পাল্টালেন না, কিন্তু চিঠিখানি তাঁরা কমিটি অফ জেনারেল ইনস্ট্রাকশন্‌স্‌-এর কাছে পাঠালেন। অবশেষে ডঃ এইচ. এইচ. উইলসনের চেষ্টায় স্থির হল যে সংস্কৃত এবং হিন্দুকলেজের জন্যে একখানি বাড়িই নির্মিত হবে। সরকার এক লক্ষ চব্বিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন এবং 'মিঃ হেয়ার কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে তাঁর যে-জমিটুকু ছিল কলেজের সুবিধার জন্য তা দান করলেন।' ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুআরি কলেজ

ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হল, নিম্নলিখিত কথাগুলি ভিত্তি-ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল :

পরমসদাশয় মহামহিম চতুর্থ জর্জের রাজত্বকালে
ভারতে বৃটিশ-অধিকৃত অঞ্চলসমূহের গভর্নর জেনারেল
মহামান্য উইলিঅম পিট আমহার্স্ট-এর আনুকূল্যে
শহরের দেশীয় সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের হর্ষধ্বনির মধ্যে
শিক্ষার অগনিত অনুরাগী ও কমিটি অফ জেনারেল ইনস্ট্রাকশনস্-এর
সভাপতি ও সভ্যদের উপস্থিতিতে কলিকাতার
হিন্দু কলেজের এই ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর বাংলার
স্থপতি-সঙ্ঘের প্রাদেশিক প্রধান জন প্যাস্কাল্
লার্কিন্স মহোদয় কর্তৃক ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের
২৫শে ফেব্রুআরি স্থাপিত হল।
সৌধটির পরিসর ৫৮২৪
ভগবানের ইচ্ছায় এর শ্রীবৃদ্ধি হোক।
বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ার্স-এর লেফ্‌টেন্যান্ট বি. বাক্সটন কর্তৃক পরিকল্পিত
এবং
উইলিঅম বার্ন ও জেমস ম্যাকিন্টশের দ্বারা নির্মিত।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে বাড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ হল। সংস্কৃত এবং হিন্দু—দুটি কলেজই এই ভবনটির মধ্যে স্থাপিত হল। হিন্দু কলেজের প্রাথমিক সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি, এই নিয়ে পরিচালক সমিতির উদ্বেগের তখনও অবসান ঘটেনি। সঞ্চিত অর্থ যেখানে গচ্ছিত ছিল, সেই জোশেফ বরেত্তো অ্যাণ্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানটির পতনের ফলে হিন্দু কলেজের সমস্ত তহবিল নিঃশেষিত হয়ে

গিয়েছিল ; তখন বাধ্য হয়ে, সরকারের কাছে আর্থিক সাহায্যের জন্যে আবেদন জানাতে হল। সরকার কলেজকে সাহায্য করতে গররাজী ছিলেন না, কিন্তু তাঁরা জানতে চাইলেন পরিচালক সমিতি কলেজ-পারিচালনার ব্যাপারে কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্-এর হস্তক্ষেপ মেনে নেবেন কি না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রকুমার ঠাকুর। তাঁরা ভাবলেন যে এই হস্তক্ষেপের ফলে অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আসতে পারে ; তাঁরা চাইলেন, প্রতিষ্ঠানটি নিজের আয়ের ওপরই নির্ভরশীল হোক। অবশেষে পরিচালক সমিতি রাজী হলেন একটি সম্মিলিত কমিটি গঠন করতে। ঠিক হোল, কমিটিতে কলেজ-পরিচালনার জন্য সমান সংখ্যক ইওরোপায় এবং দেশীয় সভ্য নিয়োগ করা হবে। 'দেশীয় সভ্যরা যদি একযোগে কোন প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন, তবে সে প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করা হবে না, স্থির হল।' এর উত্তরে কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্ জানালেন যে সরকার কলেজকে মাঝে মাঝে যে অর্থ সাহায্য দেবেন, তাঁরা কেবল তারই তত্ত্বাবধান করবেন। তাঁরা প্রস্তাব দিলেন যে জেনারেল কমিটির পক্ষে তত্ত্বাবধানের কাজ পরিচালনা করবেন ডঃ এইচ. এইচ উইলসন। এ প্রস্তাব (পরিচালক সমিতির) সম্মতিলাভ করল। ডঃ উইলসন পদাধিকার বলে পরিচালক সমিতির একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং তার সহ-সভাপতির পদলাভ করলেন। হেয়ারও সমিতির একজন অবৈতনিক সভ্য নির্বাচিত হলেন। প্রতিদিনই তিনি কলেজ পরিদর্শন করতেন। এই সময়ে

রাজা বৈদ্যনাথ, বাস্তবাবুর পুত্র হরিনাথ রায় এবং কালীশঙ্কর ঘোষাল (কলেজ.ে ক) যথাক্রমে পঞ্চাশ হাজার, কুড়ি হাজার এবং কুড়ি হাজার টাকা দান করলেন। ছাত্রদের বিদ্যার্থী জীবন দীর্ঘতর করার অভিপ্রায়ে টাকাগুলির সাহায্যে বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করা হবে স্থির হল।

সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে মিঃ এইচ. এল. ভি. ডিবোজিওই ছিলেন একমাত্র লোক যিনি সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম-তাত্ত্বিক—সমস্ত বিষয়েই অবাধ আলোচনার প্রেরণা জোগাতেন। তিনি নিজে ছিলেন স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত, তাঁর ব্যবহারও ছিল অমায়িক। তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করতেন তাঁর কাছে এসে নিজেদের মনকে উন্মুক্ত করবার জন্যে। মধ্যাহ্ন বিরামের সময়, কলেজের ছুটির পর কিংবা তাঁর বাড়িতে প্রায়ই তাঁব সঙ্গলাভে উৎসুক হত হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রের দল। প্রত্যেককে নিজের বক্তব্য বলার সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের উৎসাহিত করতেন। এর ফলে ভাবের আদান প্রদান সহজ হত। যেসব বই অন্য কোনোভাবে পড়া সম্ভব হতনা, সেই সব বই এইভাবে পড়া হয়ে যেত। এই বইগুলি প্রধানত ছিল কাব্য-অধিবিদ্যা-ও-ধর্ম-সম্পর্কিত। অবশেষে ১৮২৮ কি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তাব উঠল যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নাম দিয়ে একটি বিতর্ক-সভা স্থাপন করা হোক। এখন যে বাড়িতে ওআর্ডস্ ইন্স্টিটিউশনটি রয়েছে সেখানে এটি স্থাপন করা হল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, মাধবচন্দ্র মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র

বসাক এবং অন্যান্য আরো অনেকে এর সভ্য ছিলেন। হেয়ার এখানে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। সার্ এডওআর্ড রায়ান এবং তাছাড়া লর্ড ডব্লু. বেন্টিঙ্কের ব্যক্তিগত সচিব কর্নেল বেনসনও এর সভাগুলিতে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন। ডিরোজিওর নির্দেশনায় হিন্দু কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রেরা 'দি পার্থেনন' নামে একখানি কাগজ বের করল। কিন্তু ডঃ উইলসনের আদেশে সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু যে-আলোড়ন ডিরোজিও সৃষ্টি করলেন তা প্রবল, প্রায় প্রত্যেক প্রগতিশীল ছাত্রের বাড়িতেই তার স্পন্দন অনুভূত হল। সর্বত্রই ধ্বনিত হল এক বিক্ষোভ: 'হিন্দু ধর্ম নিপাত যাক্; গোঁড়ামির অবসান হোক।' পরিচালক-সমিতি অশুভ আশঙ্কা করে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন:

'মিঃ ডি. আনসেলেমকে অনুরোধ করা হবে তিনি যেন শিক্ষকদের সহায়তায় সেইধরনের আলোচনা রহিত করতে প্রয়াসী হন যাতে জাতীয় মহৎ নীতগুলিতে বালকদের বিশ্বাস শিথিল হবার সম্ভাবনা আছে।'

হিন্দু ধর্মকে ব্যঙ্গ করার প্রবণতা পুরোবর্তী ছাত্রদের মধ্য থেকে নবীনতর ছাত্রদের মধ্যে সংক্রমিত হয়েছিল। মন্ত্র বা প্রার্থনা উচ্চারণের প্রয়োজন যখন তাদের হত, তখনই তারা ইলিয়ড থেকে কয়েক ছত্র আবৃত্তি করতে শুরু করত। ব্রাহ্মণদেব মধ্যে কেউ কেউ আবার দেহে উপবীত ধারণ করার রীতি বর্জন করলেন। রক্ষণশীল পরিবারগুলিতে ভয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেল, কলেজ থেকে ছেলেদের ছাড়িয়ে নেবার হিড়িক পড়ে গেল। পরিচালক-সমিতির বৈঠক বসল এবং তাতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল:

শিক্ষকদের বিশেষভাবে এই কাজগুলি থেকে বিরত হবার নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে : তাঁরা যেন ছাত্রদের সঙ্গে হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা না করেন এবং বিদ্যায়তনে বা ক্লাশে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে এমন আচরণ না করেন, যা হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে অন্যায় প্রতিপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। এই নির্দেশ থেকে কোনরকম বিচ্যুতি ঘটলে মিঃ ডি. আনসেলেম অবিলম্বে তা পরিদর্শকের কর্ণগোচর করবেন ; যদি কোন শিক্ষকের মধ্যে সন্দেহের কিছু দেখা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে।' কতকগুলি খ্রীষ্টীয় যাজক দেখলেন যে হিন্দু-ধর্ম সম্বন্ধে হিন্দু ছাত্রদের বিশ্বাস শিথিল হয়ে যাচ্ছে। এই সুযোগে তাঁরা কলেজের কাছে খ্রীষ্টধর্মের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। পরিচালক-সমিতির অধিবেশনের পর নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি হল : 'এই ইঙ্গ-ভারতীয় কলেজের পরিচালকবৃন্দ শুনতে পেয়েছেন যে ছাত্রদের কেউ কেউ এমন কতকগুলি সমিতিতে যাতায়াত করেন যেখানে রাজনৈতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক আলাপ-আলোচনা চলে। পরিচালকবৃন্দ ঘোষণা করছেন যে তাঁরা এই আচরণের ঘোর বিরোধী ; এই অভ্যাস তাঁরা নিষিদ্ধ করা প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই নির্দেশ জারি হবার পরও যদি কোন ছাত্র ঐ ধরনের কোন সমিতিতে যাতায়াত করে তাহলে সে পরিচালকবর্গের বিরাগভাজন হবে।' এই অনুশাসনের ফলে অবস্থা কিছুটা শান্ত হল বটে, কিন্তু ডিরোজিওর শিক্ষা আবার আলোড়ন জাগিয়ে তুলল। ছেলেদের হয় কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হল, নয় তাদের

কলেজ যাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। এই অবস্থায় গুরুতর বিপদ আশঙ্কা করে রামকমল সেন একটি সভা আহ্বান করলেন। তাতে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ডিরোজিওই সব 'অনর্থের মূল'; তাঁকে অপসারিত না করা পর্যন্ত কলেজের উন্নতি নেই। তিনি আরো কতকগুলি প্রস্তাব আনলেন; সেগুলি হল: যেসব ছাত্রকে বিলিতী খানা খেতে দেখা গেছে এবং হিন্দুধর্মের বিরোধী বলে জানা গেছে, তাদের বিতাড়িত করতে হবে, যেসব ছাত্র ব্যক্তিবিশেষের বক্তৃতায় যোগদানে অভ্যস্ত তাদেরও কলেজের সংস্রব বর্জন করাতে হবে; শিক্ষকদের স্কুলের টেবিলে খাওয়া নিষিদ্ধ করতে হবে।

হেয়ার এবং উইলসন ডিরোজিওকে অপসারিত করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন, কারণ তাঁদের মতে ডিরোজিও ছিলেন সত্যিই একজন সুযোগ্য শিক্ষক।

তারপরেই প্রশ্ন দাঁড়াল—কলকাতার হিন্দুসমাজে জনসাধারণের সেই সময়কার অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ থেকে ডিরোজিওর অপসারণ সঙ্গত হবে কি না তা নির্ধারণ করা। অধিকাংশ সদস্যই রায় দিলেন ডিরোজিওকে অপসারণ করার প্রস্তাবের সপক্ষে। বিষয়টি শুধুমাত্র এদেশীয় সমাজের অনুভূতি-কেন্দ্রিক ছিল বলে হেয়ার এবং উইলসন ভোটদানে বিরত রইলেন।

পরিচালক-সমিতি অনেক বিচার বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ছাত্রদের জোর করে জনসভায় বা সাধারণ বক্তৃতায় হাজির হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার ক্ষমতা বা অধিকার কোনটাই তাঁদের নেই।

প্রথাগত শিক্ষাদানে ডিরোজিওর ছিল গভীর ঔদাসীন্য। প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেলেমের কাছে প্রত্যেক শিক্ষককেই মাসিক অগ্রগতির বিবরণ দাখিল করতে হত। একবার যখন ডিরোজিও তাঁর কাছে এই বিবরণ নিয়ে যান, তখন হেয়ার তাঁর ডেস্কের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। রিপোর্টটি দেখে ডি. আনসেলেম এতদূর ক্রুদ্ধ হলেন যে ডিরোজিওকে মারবার জন্যে হাত তুললেন তিনি। ডিরোজিওকে মারতে না পেরে ডি. আনসেলেম মনের ঝাল ঝাড়লেন হেয়ারের ওপর—তাঁকে 'ইতর মোসাহেব' বলে সম্বোধন করে। হেয়ার মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে প্রশ্ন করলেন, 'আমি কার মোসাহেব?' পরের দিন হেয়ার আবার ডি. আনসেলেমের কাছে এলেন, যেন কিছুই হয়নি এরকমভাবে করমর্দন করলেন।

পরিচালক-সমিতির সিদ্ধান্তের কথা শুনে ডিরোজিও ডঃ উইলসনকে নিম্নলিখিত পত্র লেখেন :

ডঃ এইচ. এইচ. উইলসন সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

এই সঙ্গে যে-পত্রটি রয়েছে তা হল আমার পদত্যাগপত্র। পদত্যাগ-পত্রটিকে আমার গুণব্যঞ্জক করে লেখার পরামর্শ আপনি আমায় দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন সে পরামর্শ আমি মেনে চলি নি। যদি আমি একথা বিশ্বাস করার মতো যুক্তি খুঁজে পেতাম যে কলেজের সঙ্গে আমার দীর্ঘ যোগাযোগ কলেজের পক্ষে সত্যিসত্যিই চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে তাহলে অন্য কারো পরামর্শ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজের অন্তরের নির্দেশে এ কলেজ ত্যাগ করার মতো পৌরুষ আমার থাকতো। আমি মনে করি না, কোন সাময়িক আঘাত পেলেই এধরনের ত্যাগ করতে হবে; তাই নিজের কাছ থেকে একথা গোপন করতে পারছি না যে আমার পদত্যাগ

নিতান্তই বাধ্যতামূলক। এই অবস্থায় কেন আমি পদত্যাগপত্রটি যাতে আমার গুণ প্রকাশ পায় এমন ভাবে রচনা করিনি তা আশা করি আপনি বুঝতে পারবেন, আমি মনে করি, এর সত্যই কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

তবু, উক্ত উপদেশের জন্য আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই; যে-ক্ষত আপনি সারিয়ে তুলতে পারেন নি, তার যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্য আপনার উদার হৃদয়ের উদ্বেগ আমি এই উপদেশের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখেছি। কিন্তু যে-গুণ আমার মধ্যে নেই, নিজেকে সে গুণের অধিকারী বলে প্রতিপন্ন করার মতো সাহসী আমি নই। যদি সৎ এবং সুবিবেচক ব্যক্তিদের মতে পদচ্যুতির অসম্মান আমার প্রাপ্য হয় তাহলে তা সহ্য করতে আমি বাধ্য।

কলেজের দেশীয় পরিচালকেরা আমার বিরুদ্ধে যে অসহিষ্ণুতার মনোভাব দেখিয়েছেন, তা আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ী এত শীঘ্র প্রশমিত হয়ে যাবে না যে আমি আবার কলেজে ফিরতে সমর্থ হব; তাছাড়া আমার জীবনের ঘটনাপ্রবাহ আমার ভবিষ্যৎকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে যে হয়তো আপনার সংস্পর্শে বেশি আসার সৌভাগ্য আমার ঘটবে না; তাই, এই সুযোগে, আমার প্রতি যে-দয়া আপনি দেখিয়েছেন তা সকৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে যাই—যেদিন আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সম্মান-ও-আনন্দ-লাভের সৌভাগ্য আমার ঘটেছে, সেইদিন থেকেই আমার প্রতি আপনি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে এসেছেন। বিশেষত, যেরকম মার্জিত ভাবে আপনি গত শনিবার পরিচালক সমিতির সিদ্ধান্ত আমায় জানিয়েছেন এবং আমার জন্য যে সহানুভূতির প্রতিফলন আমি আপনার মধ্যে দেখেছি, সেজন্যও আপনাকে ধন্যবাদ জানানো আমার অবশ্যকর্তব্য। এই ধরনের আন্তরিকতা, এই রকম অকৃত্রিম মনোভাবই আমার মনে গভীরতর রেখাপাত করে। এর চাইতে

বৃহত্তর অনুগ্রহলাভের সৌভাগ্য আমার হয়, কিন্তু সে অনুগ্রহের পিছনে কি উদ্দেশ্য লুকিয়ে থাকে, তা আমি সব সময় ধরতে পারি না, আর, তাই মনে তারা কোন রকম দাগ কাটে না।

প্রিয় মহাশয়, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এবং শুভকামনা আন্তরিক বলে গ্রহণ করুন।

কলিকাতা ভবদীয়
২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১ এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও

নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি ডিরোজিও লেখেন পরিচালক সমিতির কাছে :

হিন্দু কলেজের পরিচালক-সমিতি সমীপেষু,
ভদ্রমহোদয়গণ,

গত শনিবার গোপন বৈঠকে আলোচনার ফলে আপনারা কলেজের চাকরি থেকে আমায় বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন শুনে আমার পদত্যাগপত্র আপনাদের কাছে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছি। এতে পদত্যাগের জন্য নিয়মমাফিক নির্দে´শ পাবাব অসম্মান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারব বলে মনে করি।

আমার সুনামকে আমি মূল্য দিই; এই চিঠিতে যদি কতকগুলি ঘটনার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করতাম, তাহলে আমার সে সুনামের প্রতি দায়িত্বপালনে নিজেকে পরাঙ্মুখ বলে মনে হত। সেগুলি তাই এখানে লিপিবদ্ধ করছি ; আমার মনে হয় এ বিষয়-গুলি আপনাদের আলোচনায় খুব মুখ্য স্থান অধিকার করে নি। প্রথমত, আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হয়নি। দ্বিতীয়ত, কোন অভিযোগ যদি আনাও হয়ে থাকে, তাহলে সে সম্পর্কে আমায় কিছু জানানো হয়নি। তৃতীয়ত, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেউ যদি থাকেনও, তাঁদের সামনে হাজির হওয়ার জন্য আমাকে

আহ্বান করা হয়নি। চতুর্থত, দুই পক্ষের কোন দিকেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি। পঞ্চমত, আমার আচরণ এবং চরিত্র সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, কিন্তু এবিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগই আমায় দেওয়া হয়নি। ষষ্ঠত, আমি জানি যদিও পরিচালক-সমিতির অধিকাংশ সভ্যই মনে করেন না যে কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার পক্ষে আমি অযোগ্য, তবু আমায় অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ, বিচারের প্রহসন পর্যন্ত না করে আপনারা আমাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আমাকে পরীক্ষা করার অথবা আমার বক্তব্য শোনার প্রয়োজনীয়তা পর্য্যন্ত অনুভব করেননি। এইগুলিই হল ঘটনা—এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য আমি করতে চাই না।

গত শনিবার আপনাদের সভায় মিঃ উইলসন, মিঃ হেয়ার এবং বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বলে শুনেছি, সেজন্য এই সুযোগে আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

কলিকাতা আপনাদের বিনীত সেবক,
২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১ এইচ এল. ভি ডিরোজিও

ডঃ উইলসন ডিরোজিওকে নিম্নলিখিত উত্তর দেন:

এইচ. এল ভি ডিরোজিও মহোদয় সমীপেষু,

প্রিয় ডিরোজিও,

আমার মনে হয় আপনি ঠিকই করেছেন, তবে দেশীয় পরিচালকদের প্রতি অপেক্ষাকৃত কম নির্মম হওয়া যদি আপনার পক্ষে সম্ভবপর হত, তাহলেই আমি খুশি হতাম। দেশীয় পরিচালকেরা জনসাধারণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করা সুবিধাজনক মনে করেছিলেন বলেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, সেই দাবির পিছনে

যুক্তি কতটা আছে তা বিচার করে দেখার দায়িত্ব তাঁদের নয়। সেইজন্য কোন বিচারসভা আহ্বান করে সেখানে অভিযুক্ত করার ব্যবস্থা হয়নি। আপনার বিরুদ্ধে একটা ধারণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা আপনার পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সূচনা করেছিল, কলেজের পক্ষেও আপনার সম্পর্কে এই ধারণা ছিল ক্ষতিকর। এ ধারণা অমূলক বলে প্রতিপন্ন করবার জন্যে যত প্রমাণই আপনি দাখিল করুন না কেন, আপনার সে চেষ্টা অসফল হত। আমার ধারণা এ-সম্পর্কে আরো অনেক আলাপ-আলোচনা চলবে, তবে তা প্রকাশ্যে হবে না বলেই আমাব বিশ্বাস। তবে, আপনাব বিরুদ্ধে আনীত তিনটি অভিযোগ থেকেই যাবে, এবং এই অভিযোগ কটি সম্পর্কে আমি আপনাকে খোলাখুলিভাবে জিজ্ঞাসাবাদ কবতে চাই। অবশ্য উত্তর দেওয়া বা না দেওয়া সম্পূর্ণভাবে আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আপনি কি ঈশ্ববে বিশ্বাস কবেন? পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা বা বশ্যতা দেখানো আপনি কি নৈতিক কর্তব্যেব অঙ্গ বলে মনে করেন না? ভ্রাতা ও ভগিনীদের মধ্যে বিবাহ কি আপনি নির্দোষ এবং অনুমোদন-যোগ্য বলে মনে করেন? এই মতগুলি কি আপনি কখনও আপনার ছাত্রদের সামনে যুক্তি দিযে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রযাসী হয়েছেন? এইগুলি সম্পর্কে অথবা আপনি আর কি মত পোষণ কবেন বা করেন না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করাব অধিকাব অবশ্য আমার নেই, তবে আপনার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ চারদিকে শুনতে পাওয়া যায়, সেগুলি হল এই। যদি এগুলি সাহসেব সঙ্গে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারি তাহলে আমি খুবই সুখী হব। কিংবা যেসমস্ত ব্যক্তিব ভালো ধারণার সত্যিই মূল্য আছে, অভিযোগগুলি সম্পর্কে তাঁদের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য আপনার লিখিত ও অকুণ্ঠিত অস্বীকৃতি যদি দাখিল করতে পারি তাহলেও আমার আনন্দিত হবার অবকাশ ঘটবে।

আপনার অকৃত্রিম সুহৃৎ,

২৫শে এপ্রিল এইচ. এইচ. উইলসন

ডঃ উইলসনের কাছে লিখিত ডিরোজিওর দ্বিতীয় পত্রখানি নিম্নরূপ :

এইচ. এইচ. উইলসন মহোদয় সমীপেষু,

প্রিয় মহাশয়,

গত সন্ধ্যায় আপনার পত্রখানি পেয়েছি, আরো আগেই তার উত্তর দেওয়া উচিত ছিল, অন্য কতকগুলি ব্যাপারে মনোযোগ দিতে বাধ্য হওয়ায় এই বিলম্ব হয়ে গেল। আশা করি বিলম্বের জন্য এই কৈফিয়ৎটুকু আপনি খাঁটি বলেই গ্রহণ করবেন। আপনার উৎকৃষ্ট পত্রখানি প্রমাণ করে যে আমার সম্পর্কে আপনি এখনও আগ্রহশীল— সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। তবে, আমি দুঃখিত যে আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার আচরণ ও মতামতের সমর্থনে এই দীর্ঘ কৈফিয়ৎ কষ্ট করে আপনাকে পড়তে হবে। তবে, এই ভেবে আমি নিজেকে অভিনন্দন জানাই যে আপনার মত প্রভাবশালী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ আমি পেয়েছি, বিশেষত আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি এমন যে তা খাটি প্রমাণিত হলে আমাব চরিত্র দুরপনেয় কালিমায় কলঙ্কিত হবে। আমাব বন্ধুদের অবশ্য আমার সম্পর্কে সন্দেহ করার কিছু নেই, আর, আমি যে সত্যপথনিষ্ঠ নিজেব সম্বন্ধে এই বোধই আমার বক্ষাকবচ আমার সান্ত্বনা।

আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তবে বলি, কোন মানুষের শ্রুতির মধ্যে আমাকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকাব করতে কেউ শোনেনি। অবশ্য এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করাই যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমি স্বীকার করি, আমি দোষী। এই তত্ত্বটি সম্পর্কে দার্শনিকদের সংশয়পীড়িত মনোভাবের কথা আলোচনা করেছি, তা স্বীকার করতে আমি ভীত বা লজ্জিত নই; কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত সংশয়-সমাধানের পথও আমি নির্দেশ করেছি। এই ধরনের প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা কোথাও কি নিষিদ্ধ? তা যদি হয় তাহলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব

ও অনস্তিত্ব সম্পর্কিত উভয় মতের যে, কোনটির অনুকূলে কোন যুক্তি জোগান সমানভাবে খারাপ ; তাছাড়া, এই ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কোন বিশেষ ধারণাকেই যদি অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করি, যদি সে মতের বিরোধী সকল ধারণাকেই চোখকান বুজে অগ্রাহ্য করি, তাহলে (সে রক্ষণশীলতা) কি সত্য সম্বন্ধে উজ্জ্বল ধারণার সঙ্গে খাপ খাবে ? যদি কোন মতকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তাহলে তার উপায় হল সে মতের বিরোধী সমস্ত যুক্তিগুলিকে বিশদভাবে বুঝে নিয়ে তাদের অসারত্ব প্রতিপন্ন করা। আমি কি তার বেশি কিছু করেছি ? (এদেশের) যুবকদের শিক্ষা যখন এক অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে এসে পড়েছিল সেই সময় কিছু দিনের জন্য তাদের শিক্ষার ভার আমায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। তখন কি আমার কর্তব্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির শুধুমাত্র একটি দিকই আলোচনা করে অশিষ্ট ও অজ্ঞের মতো তাদের অন্ধবিশ্বাসী তৈরি করা ? এতে যে মানসিক সঙ্কীর্ণতার উদ্ভব হত, তার কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। যুবকেরা নিজেরা হারাত তাদের মানসিক প্রেরণা, তাদের মানসিক শক্তি। আমার কর্মধারা সম্পর্কে বিরুদ্ধবাদীরা যা-ই বলুন না কেন, তার সমর্থনে লর্ড বেকনের মত রক্ষণশীলের রচনা থেকেও আমি উদ্ধৃতি দিতে পারি। এই ধরনের বিষয় সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার এই দার্শনিকের চেয়ে আর কারো বেশি ছিল না ; তিনিই বলেছিলেন : 'যদি কোন মানুষ সংশয়হীন হয়ে শুরু করে, তাহলে তাকে শেষ করতে হবে সংশয়ের মধ্য দিয়ে।'

বলাবাহুল্য অজ্ঞতায় যারা তৃপ্ত, সেই সব লোক যখন অনেক বিলম্বে চিন্তা করতে শুরু করে তখন তাদের ক্ষেত্রে এই কথাটি সবসময়ই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এক সন্দেহ থেকে উদ্ভূত হয় আর এক সন্দেহ এবং শেষপর্যন্ত সর্বব্যাপী সন্দেহপরায়ণতাই হয়ে দাঁড়ায় একমাত্র পরিণাম। তাই, আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং পরি-শীলিত যুক্তিগুলি যেখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, হিউমের রচনাধৃত সেই

ক্লেন্‌থিস্‌ ও ফিলোর কথোপকথনটুকুর সঙ্গে কলেজের কয়েকজন ছাত্রের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া আমি আমার কর্তব্য বলেই ভেবেছিলাম। কিন্তু, ডঃ রীড এবং ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট হিউমকে যে অভ্রান্ত উত্তরগুলি দিয়েছিলেন এবং যেগুলি খণ্ডন করা আজও সম্ভব হয়নি, ছাত্রদের কাছে আমি তো সেগুলিও বলেছি। এইই হল আমার সবচেয়ে বড অপরাধ। এই কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে ছাত্রদের ধর্মবিশ্বাস যদি শিথিল হয়ে থাকে, তাহলে সে দোষ আমার নয়। কাউকে বিশ্বাসী করে তোলার ক্ষমতা আমার ছিল না, তাই কয়েকজনের নাস্তিকতার জন্য যদি আমাকে নিন্দিত করা হয়, অন্যদের ভগবৎবিশ্বাসের জন্য কৃতিত্বটুকুও আমার প্রাপ্য হওয়া উচিত। বিশ্বাস করুন, আমি ভালোভাবেই জানি মানুষের অজ্ঞতার পরিমাণ কতো গভীর; মানুষের মতামত যে সদা পরিবর্তনশীল, সে তথ্যও আমার অজানা নয়; তাই, কোন গুরুত্বহীন বিষয় সম্পর্কেও জোর করে কিছু বলবার মতো সাহস আমার নেই। অনুসন্ধিৎসু মন সন্দেহ আর অনিশ্চয়তার দোলায় এমন দুলতে থাকে যে কোন মতকেই জোর করে আঁকড়ে ধরে থাকবার সাহস পাওয়া তার পক্ষে শক্ত, আর সেইজন্যেই, কোন বিষয় সম্পর্কে 'এইই ঠিক' বা 'এইই ঠিক নয়' বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, (আমি জানি) বৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েও এবং বিচিত্র পথে প্রতিভার দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েও দুঃখ আর নৈরাশ্যবোধের সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হয়, বিনয়ই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানই মানুষকে শেখায় সে কত অজ্ঞ।

আপনার পরের প্রশ্ন হল: 'আপনি কি মনে করেন যে পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাধ্যতা নৈতিক কর্তব্যের অঙ্গ নয়?' আপনার পত্র থেকেই আমি জীবনে প্রথম জানলাম যে এই ধরনের কুৎসিত, অস্বাভাবিক এবং ঘৃণ্য নীতি শিক্ষা দেওয়ার অভিযোগে আমায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে এইসব কলঙ্ক উদ্ভাবনের মূলে যাঁরা, তাঁদের ঘৃণা করতেও আমার বাধে। আমার

পিতা যদি আজ জীবিত থাকতেন, তাহলে তিনি আমার এ অখ্যাতির উত্তরে আমার কুৎসারটনাকারীদের এই কথাই বলতেন যে আমার মতো যে পুত্র সন্তানোচিত সব কাজই করেছে তার কখনও এ ধরনের মনোভাব হতে পারে না। তবে, আমার চরিত্রের পক্ষে এ ধরনের মনোভাব যে কতদূর অসঙ্গত, আমার মা তা বলতে পারেন, তাঁকে সাক্ষ্য মেনে আমি সম্পূর্ণভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। তবে, এ সম্পর্কে আমার আরো কিছু বলার আছে। আমি বলেছি, এ ধরনের মত আমি কোনদিন পোষণ করিনি। এ মত আমি কখনও শিক্ষাও দিইনি। বরং আমি সব সময় গুরুত্ব দিয়েছি পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বাধ্যতার উপর। কোন কোন বালক অবশ্য যে কপট শ্রদ্ধা দেখায়, আমি তার নিন্দা করেছি, নৈতিকতার দিক থেকে তা শুধুমাত্র ভণ্ডামি নয়, ক্ষতিকর বলেও। কিন্তু হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুভূতিকে মর্যাদা দিতে আমি সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছি, সবদাই প্রযাস পেয়েছি সে অনুভূতিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করতে। পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য এবং তাঁদের প্রতি বাধ্য হতে আমি একাধিকবার (ছাত্রদের) উৎসাহ দিয়েছি, আপনার সন্তোষবিধানের জন্যে এধরনের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা আমি বলব। ঘটনাগুলিতে জড়িত ব্যক্তিদের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ স্থাপন করে আপনি জেনে নিতে পারেন আমি যা বলছি তা সত্য কি না। দু'তিন মাস আগে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (যে সম্প্রতি খুব আলোড়নের সৃষ্টি করেছে) আমায় জানায় যে তার প্রতি তার পিতার ব্যবহার একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং একমাত্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করেই সে এই দুর্ব্যবহার এড়াতে পারে। আমি জানতাম সে যা বলছে তা সত্য ; তবু আমি তাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত হতে বললাম, তাকে বললাম, পিতার অনেক কিছু আচরণই সহ্য করা উচিত, তাছাড়া, গৃহ থেকে বিতাড়িত না হয়েই সে যদি স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করে, তাহলে জগৎসংসার তার আচরণকে সমর্থন করবে না। সে আমার উপদেশ মেনে নিল, তবে দুঃখের কথা, অল্প

দিনের জন্য। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে সে পিতৃগৃহ ত্যাগ করেছে, এবং আমি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি যে আমার কাছাকাছি অঞ্চলেই সে একটি বাসা ভাড়া নিয়েছে। তার বাড়িওয়ালার সঙ্গে সমস্ত বন্দোবস্ত হয়ে যাবার পরই সে আমায় প্রথম জানাল, সে কি করেছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম এ ধরনের কাজ করার আগে সে আমার পরামর্শ নেয়নি কেন ; সে উত্তর দিল, 'তার কারণ আমি জানতাম, আপনি এতে বাধা দেবেন।'

আরেকটি ঘটনাব নায়ক মহেশচন্দ্র সিংহ। পিতার সঙ্গে দুর্বিনীত ব্যবহার করে এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে অপমান করে সে (একদিন) তার মামা উমাচরণ বসু এবং সম্পর্কে ভাই নন্দলাল সিংহকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির হল। আমি তার এই অবাধ্যতার জন্য তাকে তীব্র ভৎ'সনা করলাম ; তাকে বললাম, সে যদি তার পিতার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেয় তাহলে আমি আর তার সঙ্গে কথা বলব না। এ ধরনের আরো ঘটনার উল্লেখ করতে পারি, কিন্তু (আমাব ধারণা), এগুলিই যথেষ্ট।

আপনার তৃতীয় প্রশ্ন হল : 'আপনি কি মনে করেন ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ নির্দোষ এবং সমর্থনযোগ্য ? আমার স্পষ্ট উত্তর হল, 'না' ; এ ধরনের অদ্ভুত হাস্যকর কথাও আমি কখনও শেখাই নি। কিন্তু আমি আদৌ বুঝে উঠতে পারছি না, এই ধরনের মিথ্যা অভিযোগে আমি কি রকমভাবে কলঙ্কিত হলাম। এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে কখনও শুনেছে, সে নিশ্চয়ই এই অপবাদ রটাতে পারে না। অন্তত একথা আমি বিশ্বাস করতে পাবি না, কলেজের যেসমস্ত ছাত্র আমার সম্পর্কে এসেছে, তারা এত নির্বোধ যে আমার সব বক্তব্যকে ভুল বুঝবে, তারা এত শয়তানও নয় যে ইচ্ছা করে আমাব মতামতের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করবে। বরং, আমার বিশ্বাস, যেসব ভীরু, দুর্বল লোক সর্বদাই আতঙ্কিত হবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং ভয় করবার মতো কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না, তারাই এইসব অপবাদ আমার ঘাড়ে

চাপিয়েছে। আমাকে যে সন্দেহবাদী বা নাস্তিক বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই; কারণ ধর্ম সম্বন্ধে যাদের নিজস্ব দর্শন আছে, তাঁদের সবায়ের ভাগ্যেই এই ধরনের একটা দুর্নাম জোটে। তবে বিশ্বাস করুন, আমার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠেছে বলে আপনি লিখেছেন, সেগুলি আপনার পত্র থেকেই আমি প্রথম জানছি। আমি স্বপ্নেও চিন্তা করিনি যে যে-সমস্ত মতামতকে আমার চিন্তা ও ধারণার বিরোধী বলে ভেবেছি, সেই সব মতামত আমার নিজস্ব বলে প্রচারিত হয়েছে। এই সব হাস্যকর গালগল্পে আপনি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিবাদ জানাবেন, আপনার ঔদার্যে এটুকু বিশ্বাস আমার আছে। অধিকাংশ লোকের তুলনায় অস্বাভাবিক কোন জীব আমি নই; তবে আমার সম্পর্কে যা রটেছে তার সবগুলি যদি সত্যি বলে মানতাম, তাহলে নিজেকে চিনি এ বিশ্বাস আমার নিশ্চয়ই থাকত না। আমি একথা জানি, কয়েক সপ্তাহ ধরে কয়েকজন ব্যক্তি, আমার এবং এমনকি আমার পরিবার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ভিত্তিহীন কাহিনী রচনায় ব্যস্ত আছেন। কোন কোন নির্বোধ একথা পর্যন্ত রটনা করেছে যে আমার ভগিনীর (কারো কারো মতে আবার আমার কন্যার, যদিও আমার কোন কন্যা নেই) সঙ্গে জনৈক হিন্দু যুবকের বিবাহের ব্যবস্থা হচ্ছে! বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে এই কাহিনীটি আমি শুনেছি। এই ব্রাহ্মণের কাজ হল প্রতিদিন বাড়িবাড়ি ঘুরে লোকেদের দিনের খবর সরবরাহ করা; এই খবরগুলি নিশ্চয় তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেন। তবে, আশ্বস্ত হই এই ভেবে যে কুৎসা প্রায়ই প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করলেও কখনও চিরস্থায়ী হয় না।

আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। এখন, আশা করি, আপনাকে একটি প্রশ্ন করার অধিকার আমার জন্মেছে। জনসাধারণের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে কলেজের দেশীয় পরিচালকেরা আমার সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে?

তাঁদের কার্যবিবরণীতে আমার সম্পর্কে নিন্দাসূচক নিশ্চয়ই কিছু লিপিবদ্ধ নেই, কিন্তু যখন জনসাধারণের বিবোধিতায় কোন ব্যক্তিকে তার চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে তার চরিত্র ও আচার ব্যবহারকেই কি ধিকৃত করা হয় না? আমাকে কেন্দ্র করে কতকগুলি অস্পষ্ট কাহিনী এবং ভিত্তিহীন গুজব চালু হয়েছিল, দেশীয় পরিচালকেরা আমার সম্পর্কে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, তা কি এইসব গুজবকেই সমর্থন করে না? আমার বিশ্বাস, আমাকে বিতাড়ন করার একটা সঙ্কল্প তাঁদের মধ্যে ছিল, সেটা জনমতকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, নিজেদেরই ধর্মান্ধতাকে তৃপ্ত রাখবার জন্য। একথা বলার জন্যে আমায় মার্জনা করবেন। আমার ধর্ম এবং নৈতিক বিশ্বাস সম্বন্ধে যদি তাঁরা অনুসন্ধান করতেন, তাহলে আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের উপযুক্ত কারণ তাঁরা খুঁজে পেতেন না। তাই, আমার সম্পর্কে কোন খোঁজ খবর না নেওয়াই তাঁরা সুবিধাজনক বলে মনে করলেন, ক্রোধ আর উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে তাঁরা কেবল চাইলেন কলেজ থেকে আমায় বিতাড়িত করতে। যে ধরনের গোঁড়ামির মধ্য দিয়ে তাঁরা এই কাজটি সমাধা করেছেন তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় কি প্রবৃত্তির দ্বারা তাঁরা চালিত হয়েছিলেন, রাগের মাথায় সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানটুকুও ভুলে গিয়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের এই আচরণের কথা যিনি শুনেছেন, তিনিই ক্রোধে জ্বলে উঠেছেন, কিন্তু তাঁদের অবিচার নিয়ে অভিযোগ করতে গেলে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদার চেয়ে বেশিই দিয়ে ফেলব।

উপসংহারে, পত্রটির অস্বাভাবিক দীর্ঘতার জন্য মাফ চেয়ে নিচ্ছি। অপ্রিয় ঘটনাটি উপলক্ষে আপনি আমার জন্য যা করেছেন, তাতে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাই।

আন্তরিকভাবে আপনারই,

২৬শে এপ্রিল, ১৮৩১ এইচ. এল ভি ডিরোজিও

কলেজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় ডিরোজিও 'হেসপেরাস' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এটি উঠে যাবার পর তিনি একটি দৈনিক পত্রিকা বার করেন, তার নাম ছিল 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান।' কলেজের সঙ্গে তার সব সম্পর্ক যখন চুকে গেল, তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি কলেজ ত্যাগের পর হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেছিলেন - 'এনকোয়ারার' বলে একটি পত্রিকা পরিচালনা করতে লাগলেন। ডিরোজিও যে ছাত্রদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা বোঝা যায়, কারণ তারা প্রায়ই তার বাড়িতে যেত, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিত তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। তিনি স্কুলে যা শেখাতেন, বাড়িতেও তাই শিক্ষা দিতে লাগলেন। ছাত্রদের মনে কতকগুলি কথা তিনি গভীরভাবে মুদ্রিত করে দিতেন, তিনি বলতেন, যাঁরা যেসব আদর্শের কথা প্রচার করেছেন, তাদের কোনটির দ্বারাই প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করাই পবিত্র কর্তব্য, সত্যের জন্য জীবন মরণ পণ করা উচিত, সকল সদ্বৃত্তিগুলিকেই বিকশিত করা এবং সক্রিয় রাখা আবশ্যক, যে কোন ধরনের অসাধুতাই পরিহার করা প্রয়োজন। প্রাচীন ইতিহাস থেকে ন্যায়পরায়ণতা, স্বদেশপ্রেম, মানবহিতৈষণা এবং আত্ম-ত্যাগের দৃষ্টান্তগুলি তিনি প্রায়ই পাঠ করে শোনাতেন। যেভাবে তিনি ঘটনাগুলিকে ব্যাখ্যা করতেন তাতে তাঁর ছাত্রদের মনে সাড়া জেগে উঠত। ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে কেউ কেউ মুগ্ধ হতেন, কেউ কেউ হতেন আবার সত্যের মহান আদর্শে, স্বদেশপ্রেম কিংবা মানবহিতৈষণার দৃষ্টান্ত আবার কারো কারো হৃদয়কে অভিভূত করত। ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণ-

মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, মাধব'চন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র দেব, রাধানাথ শিকদার, গোবিন্দ চন্দ্র বসাক, অমৃতলাল বসাক এবং আরো অনেকে সর্বদাই ডিরোজিওর সাহচর্য লাভের জন্য ব্যগ্র হতেন। এদের 'নব্য কলকাতা' নামে অভিহিত করা যায়। এঁদের মধ্যে প্রথম চার জন ছিলেন একেবারে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, যদিও বয়সের সঙ্গেসঙ্গে এঁদের আবেগ অনেকটা কমে গিয়েছিল। হিন্দুধর্মের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং সে ধর্মকে বর্জন করাই ছিল তাঁদের প্রধান চিন্তার বিষয়। কৃষ্ণমোহন ছিলেন সুরসিক এবং ব্যঙ্গ-প্রবণ; তিনি 'পার্সিকিউটেড' নামে একখানা বই লিখলেন, তাতে তিনি স্পষ্টভাবে দেখালেন যে, রক্ষণশীল সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে যারা পরিচিত, তারাও আসলে প্রকৃত ঐতিহ্যের বিরোধী; তিনি প্রমাণ করলেন যে, জাতিভেদ বলে সত্যিকারের কোন জিনিস নেই। রসিককৃষ্ণ মল্লিক ধর্মত্যাগী হবেন, এই আশঙ্কায় তাঁকে একরকম ঔষধ সেবন করান হয়েছিল, সমস্ত রাত্রি তিনি অচৈতন্য হয়ে ছিলেন। পরের দিন যখন তাঁকে 'অসৎ' সংসর্গ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হচ্ছে, সেই সময় সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে তিনি প্রাণপণ বাধা দিলেন। পিতৃগৃহ ত্যাগ করে তিনি চোরাবাগানে বসবাস শুরু ক'রন এবং 'জ্ঞানান্বেষণ' (পত্রিকার) পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন আশাবাদী. সমস্ত শুভ প্রভাবগুলি তিনি অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতেন। অপরের দুঃখে তাঁর হৃদয় অভিভূত হত। তারাচাঁদ

চক্রবর্তী যখন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তখন দক্ষিণারঞ্জন নিজের নাম গোপন রেখে তাঁকে দান হিসেবে এক হাজার টাকার ব্যাঙ্ক নোট পাঠিয়েছিলেন। তারাচাঁদ পরে অবশ্য এই দাতাকে খুঁজে বের করতে পেরেছিলেন; টাকাটি ঋণ হিসাবেই গ্রহণ করার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। হেয়ারের সুপারিশে রামগোপাল একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সহকারীর পদ পেয়েছিলেন; ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন এবং রসিকের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল গভীর। তিনি মনে করতেন যে রসিককৃষ্ণ স্থির মস্তিষ্কের পুরুষ এবং তাঁর সাধারণ নীতিগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত। মতামত প্রকাশে সতর্কতা বা যুক্তির ক্ষেত্রে দার্শনিকসুলভ মনোভাব—রসিকের এই বৈশিষ্ট্য-গুলিও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রসিক বাকপটু ছিলেন না, কিন্তু তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে এবং যুক্তি-বিস্তারে চিন্তার এমন একটা দীপ্তি থাকত যে, লোকে তাঁর বক্তৃতা সব সময়ই গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনত। বিশেষত হেয়ার এবং কোলভিল অ্যাণ্ড কোং-এর মিঃ অ্যাণ্ডার্সন ছিলেন তাঁর অনুরাগী শ্রোতা তারা প্রায়ই অ্যাকাডেমিক-এর সভাগুলিতে উপস্থিত থাকতেন। রসিকের বক্তৃতা শুনতে তাঁরা খুব ভালবাসতেন। চিন্তা আর অভিব্যক্তির সংযম—এগুলিই ছিল রসিককৃষ্ণ প্রদত্ত শিক্ষার মূল মন্ত্র। মাধবচন্দ্র মল্লিকের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর নীরব অনুসন্ধিৎসা, কিন্তু এইরকম শান্ত প্রকৃতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা থেকে এতটুকুও বিচলিত হন নি। হিন্দুধর্ম নামে একটি প্রবন্ধ মাধবচন্দ্রের লেখা বলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিপন্ন করেছিলেন, কিন্তু কোন ইংরেজী খবরের কাগজে

এবং মহেশ আস্তে আস্তে স্থিতধী হলেন, ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁর অসারত্ব আবিষ্কার করলেন, কেন না সে শিক্ষা তাদের কাছে অনাগত জীবনের কোন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেনি। তারা খ্রীষ্টধর্মের তত্ত্বগুলি পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হলেন এবং অবশেষে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। খ্রীষ্টান হবার অল্পদিন পরেই অবশ্য হতভাগ্য মহেশ মারা যান, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বেই তার মধ্যে পরিবর্তনের চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট। তাঁর মৃত্যুর পর কৃষ্ণমোহন ওল্ড চার্চে একটি অভিভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, অখ্রীষ্টান মহেশ এবং খ্রীষ্টান মহেশের মধ্যে প্রভেদ সুপ্রচুর। ডেভিড হেয়ার ওল্ড চার্চে উপস্থিত ছিলেন। এই অভিভাষণটির তিনি প্রশংসা করেছিলেন। হেয়ার যে উদারমনা ছিলেন প্রত্যেকের মঙ্গল ও উন্নতিতে তাঁর যে আন্তরিক উৎসাহ ছিল, এটি তারই প্রমাণ। হরচন্দ্র ঘোষ, যিনি ডিরোজিওকে শিক্ষকের মর্যাদা দিতেন, বাঁকুড়ায় মুন্সেফ নিযুক্ত হন। তখনকার দিনে চুক্তিহীন বিচার ব্যবস্থার নিচু স্তরগুলি দুর্নীতিতে ছেয়ে ছিল। বেতন ছিল নামমাত্র, প্রলোভন ছিল প্রচুর। সংবাদপত্রকে ভয় করবার কোন কারণ ছিল না, ও সব ব্যাপারেও ছিল না কোন শাস্তির আশঙ্কা। হরচন্দ্র যা কিছু শিখেছিলেন তার সবটুকু দিয়েই তিনি ন্যায়পরায়ণতার প্রতি তাঁর অনুরাগের ভিত্তি গড়ে তুললেন। চিত্তকে উন্নত করে, মনে মহৎ চিন্তার খোরাক জোগায়, এমন সব বই তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। আর্থিক দিক দিয়ে মুন্সেফ পদপ্রাপ্তি তার কাছে ক্ষতিজনক ছিল, খরচ মেটাতে সংসারের উপর টান পড়ত। কিন্তু যখন তিনি দেখতেন যে, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে তিনি ন্যায়বিচার বিতরণ করছেন,

তখন তাঁর আনন্দের আর সীমা থাকত না। সুবিচারকরূপে, ঈশ্বরপ্রতিম মানুষ হিসেবে বাঁকুড়ার প্রতিটি অঞ্চলে তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হত। হরচন্দ্রের পরবর্তী জীবন সুপরিজ্ঞাত।

অমৃতলাল ছিলেন হরচন্দ্রের মত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের রক্ষণশীল বলে মনে হতে পারে, কারণ কাউকে ক্ষুব্ধ করবার অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না। কিন্তু সামাজিক অর্থে তাঁদের মানসপ্রবণতা তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে এক না হলেও তাঁদের চারিত্রিক সততা এবং সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁদের ধারণা যদি বিচার করি, তাহলে দেখব বন্ধুদের সঙ্গে তাঁরা ছিলেন অভিন্ন। হরচন্দ্র খ্যাতিলাভ করেছিলেন নীতিপরায়ণ বিচারক হিসেবে; তোষাখানার ভারপ্রাপ্ত পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নানা প্রলোভনের মধ্যে থেকেও ন্যায়পরতার জন্য অমৃতলালের খ্যাতি ছিল আরো বেশী। অমৃতলাল ঐকান্তিক আগ্রহের সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে নিজকর্ম সম্পাদন করতেন, কিন্তু যখন অবসর গ্রহণ করলেন তখন দেখা গেল তিনি যখন কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন, তখনকার চাইতে আরো বেশী দরিদ্র হয়ে পড়েছেন। এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের কাছে এই পৃথিবীর নশ্বরত্ব অথবা তার ঐশ্বর্য কোন প্রভাব বিস্তার করে না; তাঁরা আত্মস্থ থাকতে ভাল বাসেন, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের প্রতি তাঁরা তাকিয়ে থাকেন আগ্রহভরে। রামতনু লাহিড়ী বুদ্ধিজীবী হিসাবে যতটা, (এই ধরনের) নীতিপরায়ণ মানুষ হিসাবে তার চাইতে বেশী পরিচিত। তাঁর মতো খুব কম লোকই আছেন, যাঁদের মধ্যে মানবিক সহৃদয়তার অমৃতধারা এমন পর্যাপ্তভাবে প্রবাহিত।

তিনি সর্বদাই ছিলেন সত্যের গুণগ্রাহী, প্রগতিশীল ভাবধারার প্রতি তাঁর সহানুভূতি সব সময়ই ছিল অকুণ্ঠিত। রসিককৃষ্ণকে তিনি নিজের বন্ধু মন্ত্রণাদাতা এবং পথনির্দেশক বলে মনে করতেন।

রাধানাথ শিকদারের দেশহিতের আকাঙ্ক্ষা ছিল ঐকান্তিক। গোমাংস ভক্ষণ করা ছিল তাঁর শখ; তিনি মনে করতেন যারা গোমাংস খায় সবলের দ্বারা অত্যাচারিত হবার ভয় তাদের থাকে না। তাঁর ধারণায় বাঙালীদের অবস্থার উন্নতি করার যথার্থ পথ হল সর্বপ্রথমেই শরীর সম্পর্কে মাথা-ঘামানো অথবা শারীরিক এবং নৈতিক দিক নিয়ে একই সঙ্গে চিন্তা করা। তিনি প্রায় তিন বছর ধরে আমার সঙ্গে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি মাসিক বাংলা কাগজ পরিচালনা করতেন। তারাচাঁদ চক্রবর্তী এবং চন্দ্রশেখর দেবকে যদিও ডিরোজিওর শিষ্য বলা চলে না, তবুও তাঁরা 'নব্য কলকাতার' সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তারাচাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আমি লিখেছিলাম, 'ইণ্ডিয়া রিভিউ'-এর একটি সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছিল। ইংরেজীতে অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল তাঁর; চিন্তাশীলতা এবং পূর্ণভাবে স্বাধীন মানসিকতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তিনি কাজ করতেন মিঃ এল. ক্লার্কের সহকারী হিসাবে। তাঁর সম্পর্কে মিঃ ক্লার্ক গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন, তাঁকে বলতেন: 'আমার কাছে তুমি অমূল্য'। একটি বাংলা-ইংরেজী অভিধান সঙ্কলন করেছিলেন তারাচাঁদ; মনুর বাংলা অনুবাদের কাজও তিনি শুরু করেছিলেন, তবে শেষ করতে পারেননি।

চন্দ্রশেখর দেবের বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর বহুমুখী দক্ষতা।

শহরের সব অঞ্চলেই বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। হিন্দুদের মানসপ্রবণতা বিচার করে হেয়ার ডিরোজিওর সঙ্গে ঠিক করলেন যে তাঁর বিদ্যালয়ে অবস্থাসংক্রান্ত একটি বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হবে এবং জনসাধারণের কাছে তা উন্মুক্ত থাকবে। কিছু কাল ধরে এই ধরনের বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, প্রায় চার শতজন যুবক এই বক্তৃতাগুলিতে উপস্থিত থাকতেন।

হেয়ারের ব্যক্তিত্ব, সংগঠনা এবং জনসাধারণের কল্যাণে তাঁদের প্রয়োগ ডিরোজিওর প্রধান প্রধান ছাত্রদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে জোড়াসাঁকোয় মাধবচন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে দেশীয় অধিবাসীদের এক সভা আহূত হয়। এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে হেয়ারের অবদান আলোচনা এবং তাঁকে যে মানপত্র দেওয়া হবে তার পাঠ স্থির করাই ছিল এ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য। সভায় অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়েছিলেন, পর পর দু'দিন সভার কাজ চলেছিল। প্রথম দিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় দিন রসিককৃষ্ণ মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সভায় রাধানাথ শিকদার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকে বক্তৃতা দেন। কু-শাসন এবং অত্যাচারের ফলে দেশে যে দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করে রাধানাথ শিকদার ডেভিড হেয়ারকে উপমিত করলেন 'প্রভাতী তারার' সঙ্গে, তিনি বললেন, হেয়ার যেন আমাদের অশিক্ষার অন্ধকারকে দূর করবার জন্য আমাদের মধ্যে এসেছেন। হেয়ারের গুণ বর্ণনা করতে

গিয়ে রসিককৃষ্ণ বললেন, হেয়ারের পাল্কীটি একটি রীতিমত ঔষধাগার বিশেষ ; সব রকম রোগ সারাবার ওষুধ তাতে মজুত থাকে। সভায় স্থির হল, চাঁদা সংগ্রহ করা হবে এবং হেয়ারের একটি প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নেবার জন্য তাঁকে (শিল্পীর সামনে) বসতে অনুরোধ করা হবে। হরচন্দ্র ঘোষ কর্মসচিব নিযুক্ত হলেন। দেশীয় সমাজের গভীর কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক একটি মানপত্র রচনা করা হল, পার্চমেণ্ট কাগজের উপর পরিচ্ছন্নভাবে সেটিকে লিখলেন হরচন্দ্র। হেয়ারের জন্মদিনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক দেশীয় নাগরিক তাঁর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তাঁকে মানপত্রটি উপহার দিলেন। মানপত্রটি দেওয়ার আগে দক্ষিণারঞ্জন একটি আবেগদীপ্ত ভাষণ দেন। তিনি যখন বললেন, 'তুমি আমাদের মায়ের মতো স্তন্যদান করেছ,' তখন হেয়ার তাঁর অভ্যাসমত মাথা নাড়িয়ে স্মিত হাসি হাসছিলেন। আমরা ভাষণটি বা হেয়ার তার উত্তরে যা বলেছিলেন তা উদ্ধৃত করতে পারলাম না, তবে উত্তরটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হরমোহন চট্টোপাধ্যায় রেখে গেছেন :

"হেয়ার বললেন, তিনি যখন এদেশে আসেন তখন দেখেছিলেন যে, সৃষ্টির সকল বৈচিত্র্যেই ভারতবর্ষ সমৃদ্ধ ; অফুরন্ত তার সম্পদ ; তার অধিবাসীরা সকলেই বুদ্ধিদীপ্ত ও শ্রমপ্রিয় ; তারা যেসব কর্মশক্তির অধিকারী, তা জগতের অন্যান্য সভ্য দেশের অধিবাসীদের গুণাগুণের তুলনায় শ্রেয়তর না হলেও তাদের চাইতে কোন অংশেই কম নয়। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের উপরে যে অত্যাচার ও কুশাসন চলেছিল তাতে তার আপন শিক্ষা আর

দর্শন গিয়েছিল ধ্বংস হয়ে, প্রায় সার্বিক অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এই দেশ। হেয়ার বুঝেছিলেন, এদেশের উন্নতিবিধান করতে গেলে সবচাইতে অপরিহার্য পথ হল ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশের জনসাধারণের পরিচয় স্থাপন করানো। এই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বীজ রোপণ করেছিলেন এবং (বর্তমানে) একথা বলার সময়, সেই বীজ একটি মহীরূহে পরিণত হয়েছে। সে মহীরূহের ফল যে কত সুন্দর, তাঁর চারপাশের বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিমণ্ডলই তার সাক্ষ্য।"

মিঃ সি. পোট (C. Pote) হেয়ারের যে প্রতিকৃতিটি এঁকে-ছিলেন তা সংস্কৃত কলেজে ডঃ উইলসনের প্রতিকৃতির বিপরীত দিকে টাঙানো ছিল। এখন সেটিকে হেয়ার স্কুলে দেখতে পাওয়া যাবে।

আগেই বলেছি, ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, বাংলা ভাষার চর্চা এবং ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই উপযুক্ত পুস্তক সরবরাহ—হেয়ারের কাছে এই গুলিই ছিল হিন্দুদের আলোর রাজ্যে নিয়ে যাবার পথ। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি কাজ করছিলেন; তারপর একদিন তাঁর মতামতগুলির সত্যতা যাচাই করার সময় এল।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাক্‌শন্‌স্‌ নিযুক্ত হল। 'জনশিক্ষার গতি পর্যালোচনা করা এবং জনশিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য যে সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তাদের অবস্থা নিরূপণ করাই ছিল এই কমিটি নিয়োগের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন

করা যায়, কিভাবে তারা ব্যবহারিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি কিভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা করা এবং সরকারের কাছে এসব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কার্যক্রম পেশ করাও তাঁদেরই দায়িত্ব ছিল।'

কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স তাঁদের ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুআরির বার্তায় নিম্নরূপ লিখলেন:

'বিজ্ঞানবিষয়গুলি সম্পর্কে এ কথা বলা যায়, প্রাচ্যের রচনাসমূহে বিজ্ঞানসাধনা যে স্তরে আছে তা আয়ত্ত করার বা সেগুলি শিক্ষা দেবার জন্য লোক নিযুক্ত করা সময় নষ্ট করার চেয়েও নিকৃষ্ট আমাদের মহান লক্ষ্য হল হিন্দু শিক্ষার প্রসার নয়, প্রকৃত শিক্ষার প্রসার।' ডেসপ্যাচটি রচনা করেছিলেন জেমস মিল।

কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন্স বিদ্যালয় বা কলকাতার হিন্দু কলেজ সম্পর্কে একটি অনুকূল বিবরণ পেশ করেন:

'ইংরেজী ভাষার উপর দখল এবং ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি এখানে এত গভীর যে ইওরোপের কোন বিদ্যালয়েও এর তুলনা খুঁজে পাওয়া দুরূহ। ইংরেজীর প্রতি আকর্ষণ খুব বিস্তার লাভ করেছে এবং এই 'বিদ্যালয়ে' লালিত হয়েছেন এমন অনেক যুবকের দ্বারা পরিচালিত স্বাধীন বিদ্যালয় দিকে দিকে বিকশিত হয়ে উঠছে। এর নৈতিক ফল হয়েছে খুব উল্লেখযোগ্য। সম্ভ্রান্ত বংশজাত ও প্রতিভাবান অনেক যুবক হিন্দুধর্মের শিক্ষার প্রতি অসহিষ্ণুতা পোষণ করছেন এবং প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মোক্ত ক্রিয়া-

কাণ্ডের প্রতি অবজ্ঞা দেখাচ্ছেন। যাঁরা বাইরে এদেশবাসীদের আচার-আচরণ মেনে চলেন তাঁদেরও অনেকেই (এই সব নব্য ধারণায়) বিশ্বাসী।'

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ সপার্ষদ লর্ড উইলিঅম বেন্টিঙ্ক তাঁর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করালেন। এই সিদ্ধান্তে স্থির হল 'এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্যক প্রচার ঘটাতে হবে ; শিক্ষার জন্য যে অর্থ মঞ্জুর আছে তার সবটুকুই ইংরেজী শিক্ষার খাতে ব্যয় করলে অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্য প্রকৃষ্টভাবে সাধিত হবে।' এই সিদ্ধান্তে, সরকার-প্রদত্ত অর্থে প্রাচ্যের গ্রন্থাবলীর মুদ্রণও নিষিদ্ধ করা হল।

এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্সট্রাক্‌শন্‌স্-এর মধ্যে মতদ্বৈধতা উপস্থিত হল ; কমিটির সকলেই অবশ্য এ কথা মেনে নিলেন যে, 'উদার শিক্ষা ব্যবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানসম্পর্কিত তথ্যের সন্ধান দেশীয় ভাষাসমূহে পাওয়া যাবে না ; তবু সাধারণ লোকেদের শিক্ষার ব্যবস্থা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে।'

(বেন্টিঙ্কের) উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তটি গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থাকে শান্ত করবার জন্য লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর একটি সংক্ষিপ্ত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। স্থির হল, যতদিন না মাতৃভাষায় ভালো ভালো বই লিখিত হয় ততদিন ইংরেজী এবং মাতৃভাষা উভয়ই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু থাকবে। লর্ড অকল্যাণ্ড ইংরেজী শিক্ষার উপর এত বেশী জোর দিয়েছিলেন যে,

তিনি নিজের ব্যয়ে ব্যারাকপুরে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় চালাতেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই-এর শিক্ষাসংক্রান্ত ডেসপ্যাচ এই জটিল প্রশ্নটির সমাধান করল। এতে লিখিত ছিল: 'সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইওরোপীয় জ্ঞানের বিস্তারসাধনই আমাদের লক্ষ্য। আমরা দেখিয়েছি, এই উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে শিক্ষার উচ্চ পর্যায়গুলিতে ইংরেজী ভাষার সাহায্য অপরিহার্য। সাধারণ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে শিক্ষার বাহন হবে ভারতের বিভিন্ন দেশীয় ভাষাসমূহ।"

এখানে আমরা হেয়ারের লেখা দুটি চিঠি মুদ্রিত করছি। এতে বোঝা যাবে ছাত্রদের আচারব্যবহার বা তাদের পড়াশোনার দিকে হেয়ারের কি রকম সজাগ দৃষ্টি ছিল।

আর. ছলিফক্স মহোদয়,

মহাশয়,

কলেজের ছাত্রদের আচরণ সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনেছি—আমার ধারণা সেগুলি সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশের বিশেষ অবকাশ নেই। এই সব ছাত্রের' তাদের সহপাঠীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনে এবং প্রায়ই কুৎসিত ও অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করে। আমি বিনীতভাবে আপনার কাছে প্রস্তাব করছি, এদের প্রত্যেককে পরিষ্কারভাবে একথা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার যে এই ধরনের আচরণ একেবারেই নিষিদ্ধ। যদি কোন ছাত্র প্রধান শিক্ষকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে নালিশ জানানোর পরিবর্তে অন্যায়ভাবে তার সহপাঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার বা সে অভিযোগ প্রচার করার দোষে অপরাধী বলে প্রমাণিত হয় অথবা বিদ্যালয়ের ভিতরে বা বাইরে অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়, তাহলে তার অপরাধের গুরুত্ব বিচার করে

তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। সেই শাস্তির ফলে অপরাধী ছাত্রকে বিদ্যালয়ের মাঝখানে একটি টুলের উপর দেড়ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তার বুকে একটি প্ল্যাকার্ড ঝোলান থাকবে; তাতে লেখা থাকবে যে, সে অশ্লীল ও কুৎসিত ভাষা ব্যবহারের অপরাধে অপরাধী।

ভবদীয়,

২৬মে, ১৮৩৪ ডেভিড হেয়ার, পরিদর্শক

আর. হ্যালিফক্স মহোদয়,

মহাশয়,

যেহেতু মৌখিক আলোচনা ভুলে যাবার সম্ভাবনা বেশী, সেইজন্য আপনার সঙ্গে পত্রালাপ করাই বিধেয় মনে করছি। আপনাকে বলেছিলাম বিদ্যালয়ে নিয়মানুবর্তিতার অভাব এত বেশী যে, তা দেখে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছি। এছাড়া মিঃ হ্যালফোর্ড-এর অনুপস্থিতিতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে তাঁর কর্ম যেভাবে সম্পাদিত হয়েছিল, তাও আমাকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করেছে। আমি বিশেষভাবে এইদিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই ছাত্ররা মনিটারকে গ্রাহ্য করে না; মিঃ হ্যালফোর্ড-এর ক্লাসে গোলমাল ছাড়া আর কিছুই হয় না।

আপনি একথা জানেন যে কমিটি চান মনিটারকে বাদ দিয়ে যদি চালান যায়, তাহলে মনিটার রাখার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। কমিটির ইচ্ছা সহকারী শিক্ষকদের অনুপস্থিতিতে প্রধান শিক্ষকই যতটা সম্ভব বিভিন্ন শ্রেণীগুলির দিকে নজর রাখবেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, প্রধান শিক্ষক যদি প্রায়ই এই সুযোগ গ্রহণ করেন তাহলে তার চাইতে বিদ্যালয়ের পক্ষে কল্যাণকর আর কিছুই হতে পারে না; কারণ, তাতে প্রত্যেক শ্রেণীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, প্রধান শিক্ষক তা দেখবার খুব চমৎকার সুযোগ পান। আমি জানি দুর্বল স্বাস্থ্যের ফলে আপনার পক্ষে খুব বেশী

কর্মোদ্যোগ দেখানো সম্ভব নয়। তবে যেহেতু বিদ্যালয়ে হাজিরা দেবার সামর্থ্য আপনার রয়েছে, তাই আমার মনে হয়, এই সমস্ত বিষয়গুলি আপনি আরো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে পারবেন।

ভবদীয়,

১০ই জুন, ১৮৩৪ ডেভিড হেয়ার, পরিদর্শক

ডেভিড হেয়ার হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কিনা তা জানতে উৎসুক হয়ে আমি এ সম্পর্কে রাজা রাধাকান্তর কাছে পত্র লিখেছিলাম। এর উত্তরে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পত্রে তিনি লিখেছেন :

"আপনার ৩০ তারিখের চিঠি পেয়ে আমি হিন্দু কলেজের পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে দেখেছি। কিন্তু স্বর্গত মিঃ ডেভিড হেয়ার যে এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা এমন প্রমাণ কোথাও পাই নি। আপনি বলেছেন যে, মিঃ হেয়ারের মনে হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা জন্ম নিয়েছিল এবং সার হাইড ঈস্ট সেই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। কিন্তু তাহলে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে হিন্দু কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজের যে প্রথম সভা তাঁর বাড়িতে বসেছিল তাতে সার ঈস্ট এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নি কেন? তাছাড়া আপনার শ্রুত তথ্য যদি সত্য হয়, তাহলে ঐ মাসের ২১ তারিখে ২০ জন দেশীয় ও ১০ জন য়ুরোপীয় সদস্যবিশিষ্ট যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তাতে মিঃ হেয়ারকে নিশ্চয়ই সভ্য হিসাবে গ্রহণ করা হত। আমি খুঁজে আরো বের করেছি যে, হেয়ার ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন কলেজের পরিদর্শক মনোনীত হন। প্রতিষ্ঠানটি যাতে আপন লক্ষ্যসাধনে সফল হয় সেইজন্য তিনি তার দিকে ক্রমশ তাঁর সমস্ত সময় এবং মনোযোগ নিয়োজিত করেন এবং জনসাধারণের চোখে শ্লাঘ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। খুব সম্ভবত, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলেজের একজন পরিচালক নির্বাচিত হন। এই সমস্ত দিক

বিবেচনা করার পর আমার অভিমত হ'ল, মিঃ ডেভিড হেয়ার নন, সার এড হাইড ঈস্টই ছিলেন হিন্দু কলেজের জন্মদাতা বা প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর এ কাজটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এই বিভাগের হিন্দুরা নিজেদের খরচে সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী রুমে তাঁর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।"

রাজা রাধাকান্ত বোধহয় জানতেন না, সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কতখানি কল্যাণকর কর্মোদ্যোগ ডেভিড হেয়ার দেখিয়েছিলেন। সকলে তাঁকে হিন্দু কলেজের লোক-দেখানো প্রতিষ্ঠাতা মনে করবে, এমন সম্ভাবনা তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কলেজটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যে তিনিই ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি যদি অবিরত কর্মপ্রয়াসের দ্বারা বিভিন্ন ব্যক্তির মনকে এই একটি উদ্দেশ্যের দিকে চালিত না করতেন এবং এই উদ্দেশ্য-সাধনের প্রকৃত উপযোগী পন্থা উদ্ভাবন না করতেন, তাহলে পরিকল্পনাটির পিছনে যত প্রভাবশালী ব্যক্তিরই সমর্থন থাকুক না কেন, তা নিশ্চয়ই ব্যর্থ হত।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে টাউনহলে আয়োজিত সান্ধ্যভোজে 'ভারতবাসীরা যে জ্ঞানালোকে দীপ্ত হয়ে উঠছে' তা উল্লেখ করলেন ক্যাপ্টেন জে. টি. টেলর। দ্বারকানাথ ঠাকুর তার 'উত্তরে ধন্যবাদ দিলেন।' ক্যাপ্টেন টেলর যেকথা উল্লেখ করেছিলেন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে দ্বারকানাথ হিন্দু কলেজের প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি বললেন যে, এই প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত তাঁর বন্ধু ডেভিড হেয়ার এবং দেশীয় ভদ্রলোকদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবল একজন

ব্যতীত আর কোন রাজকর্মচারীর সাহায্য এই প্রতিষ্ঠানটি লাভ করেনি।

বাংলা প্রেসিডেন্সির ১৮৩১ ও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী-কালীন জনশিক্ষা সম্পর্কিত পর্যালোচনায় মিঃ কার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ দিয়েছেন :

"ইংরেজীতে শিক্ষালাভের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করার উদ্দেশ্যে দেশীয় অধিবাসীরা নিজেরাই ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। তাঁদের মধ্যে বর্ধমানের রাজা, বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, বাবু গোপীমোহন দেব, বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ এবং বাবু গঙ্গানারায়ণ সিংহ এই পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির আদিযুগের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকমল সেন এবং রসময় দত্ত প্রমুখেরও নাম করা যায়।

"এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের কাজে কয়েকজন ইওরোপীয় ভদ্রলোকও সক্রিয় উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সার ই. এইচ. ঈস্ট ও ডেভিড হেয়ার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডেভিড হেয়ার জীবনে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না, তাছাড়া তিনি ছিলেন সঙ্কুচিত প্রকৃতির লোক, তাই তাঁর ভূমিকা নেপথ্যেই থেকে গেছে। কিন্তু পরিকল্পনাটির রূপায়ণে একেবারে গোড়াথেকেই যাঁরা সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য উদ্যম দেখিয়েছেন, হেয়ার ছিলেন তাঁদের অন্যতম।"

হিন্দু কলেজের পরিদর্শক মিঃ জে. সি. সি. সাদারল্যাণ্ড ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নরূপ বিবরণ দেন :

হিন্দু কলেজের জন্য এবং সাধারণভাবে শিক্ষাস্বার্থে আমার সহ-পরিদর্শক মিঃ হেয়ার যে অমূল্য কাজ এখনও করে চলেছেন, তার উল্লেখ না করে আমি আমার বিবরণ শেষ করতে পারছি না। অর্থ-সম্পদের দ্বারা এ কাজের যথার্থ মূল্য দেওয়া যায় না। কিন্তু আমি

মনে করি তাঁর উদ্যোগের জন্ত জেনারেল কমিটির এবং স্বয়ং সরকারের প্রকাশ্য স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্য।

কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্ তখন গঠিত ছিল টি. বি. মেকলে, সার ই. রিয়ান, এইচ. শেক্‌স্‌পীঅর, সার বি. এইচ. ম্যালকিন, সি. এইচ. ক্যামেরণ, সি. ডব্লু. স্মিথ, আর. জে. এইচ. বার্চ, জে. আর. কোলভিন, আর. ডি. ম্যাঙ্গলস্, সি. ই. ট্রেভেলিঅন, জে. ইয়ং, রাধাকান্ত দেব, এবং রসময় দত্ত প্রমুখকে নিয়ে। এঁরা এঁদের ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে নিম্নরূপ লিখেছিলেন :

মিঃ সাদারল্যাণ্ড মিঃ হেয়ার সম্পর্কে যা বলেছেন সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এই সদাশয় ব্যক্তিটির গুণাবলীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, এদেশবাসীর শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা উৎসাহ দেখান, হেয়ারই ছিলেন তাঁদের মধ্যে এ ক্ষেত্রে প্রথম পুরুষ। বিশেষ করে, তাঁর উদ্যোগের ফলেই রাজধানীর দেশীয় অধিবাসীরা ইংরেজী ভাষার চর্চায় আগ্রহী হয়। আগে এরকম-ভাবে ইংরেজীভাষার চর্চা তারা করত না, ইওরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে যেটুকু ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন হত, ততটুকুই তারা শিখত। কিন্তু এখন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে পরিচিত হবার সবচেয়ে সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। স্কুল সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ গঠনে তিনি সহায়তা করেছেন; এবং তখন থেকে বছরের পর বছর ধরে অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে আপন তত্ত্বাবধনায় এই প্রতিষ্ঠানগুলির সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করে চলেছেন। তিনি তাঁর সময়ের কোন ক্ষুদ্র অংশ নয়, তাঁর সমস্ত সময়ই এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত করেছেন। ভীরুকে উৎসাহ দেবার জন্ত, অজ্ঞানকে পরামর্শ দেবার জন্ত, অলস কিংবা মন্দকে সংশোধন করার জন্ত তিনি সর্বদাই প্রস্তুত। ছাত্রদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ উপস্থিত হলে তাঁরই

শরণাপন্ন হতে হয়। পিতামাতা এবং শিশুদের মধ্যস্থতা করার দায়িত্বও তাঁকে প্রায়ই পালন করতে হয়। এইসব এবং অন্যান্য আরো অনেক দিক দিয়ে দেখলে মনে হয় এদেশবাসীর শিক্ষাব্যবস্থা বর্তমানে যে উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছে, তার জন্য মিঃ হেয়ারের কৃতিত্ব অনেকখানি; তাই আমরা মনে করি জনসাধারণের কাছ থেকে এর বিনিময়ে তাঁর কিছু প্রাপ্য আছে। আমাদের বিশ্বাস, মহামান্য আপনি এবং আপনার পরিষদ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। শুধু মাত্র মিঃ হেয়ারের যোগ্যতার দিকেই লক্ষ্য রেখে আপনারা এ বিবেচনা করবেন না, ভারতবর্ষের জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তি এবং নৈতিক চরিত্র উন্নত করার প্রয়াসকে ভারত সরকার কি চোখে দেখেন তার পরিচয়ও যেন এর মধ্যে পরিস্ফুট হয়। এর ফলে অবশ্য কোন অসুবিধাজনক দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবার সম্ভাবনা নাই, কারণ (শিক্ষা বিস্তারের) এই উদ্দেশ্য যদিও মহৎ এবং চিত্তগ্রাহী, তবু এমন লোক খুব কমই খুঁজে পাওয়া যাবে, যিনি মিঃ হেয়ারের মত সেই উদ্দেশ্যকে সার্থক করবার জন্য বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে পারবেন, বিশেষতঃ যখন সৎ-অনুভূতির আত্মতুষ্টি ছাড়া পুরস্কার প্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা নেই।

তখন গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড অকল্যাণ্ড। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অগস্ট জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্স্ট্রাক্শন্স্ এর সম্পাদক মিঃ সাদারল্যাণ্ডের কাছে একটি চিঠিতে মিঃ এইচ. টি. প্রিন্সেপ লেখেন :

"কলিকাতায় শিক্ষাবিস্তারে দীর্ঘদিন প্রকৃত অধ্যবসায়ের সঙ্গে সহায়তা করেছেন বলে মিঃ হেয়ারকে জনসাধারণের তরফ থেকে স্বীকৃতি দেবার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ঠিক কি ধরনের পুরস্কার কমিটি এই ভদ্রলোককে দিতে চান, সপরিষদ মহামান্য লর্ড সে সম্পর্কে আমাকে অনুসন্ধান করতে বলেছেন।"

মিঃ কার-এর জনশিক্ষাসংক্রান্ত নথিপত্র থেকে নিম্নলিখিত অংশটুকু আমরা এখানে যুক্ত করছি :

"মিঃ হেয়ার এরপরে কলকাতার স্মল কজেস কোর্টের একজন কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পদের দায়িত্ব বহন করেছিলেন। স্মল কজেস কোর্টে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সময়ের বৃহৎ অংশ ব্যয় করতেন হিন্দু কলেজ এবং স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়টির জন্য। আগের মতোই তিনি প্রতিদিন এগুলিতে উপস্থিত হতেন। সরাসরি শিক্ষাদানের দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর উপযোগিতা ঠিক বোঝা যাবে না। তাঁর উপযোগিতা ছিল অন্যতর ক্ষেত্রে। শিক্ষকদের কর্মোদ্যোগ, ছাত্রদের প্রগতি, প্রভৃতিতে তাঁর ছিল অকৃত্রিম আগ্রহ। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি সহজভাবে মিশতেন, তাদের বক্তব্য শুনতেন ধৈর্য ধরে, তাদের আমোদ প্রমোদেও তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাদের সস্নেহ উপদেশ দিতেন তিনি। যখন তাঁর ক্ষমতায় কুলোত, তিনি তখন তাদের সাহায্যও করতেন। এই সব কারণেই তিনি তাদের কাছে এত প্রিয় ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলেন। যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়ত তখন তিনি বাড়ীতে তাদের দেখতে যেতেন, তাদের ওষুধ জোগাতেন। কিসে তাদের ভালো হয় তাতে তাঁর ছিল পিতৃসুলভ স্নেহার্দ্র উৎকণ্ঠা। শোনা যায় এই সব সময়ে হিন্দু মহিলারা পর্যন্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করে বাবা বা ভাইয়ের মতো তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তাঁদের শিশুদের প্রকৃত মঙ্গলই যে এই সহৃদয় ভদ্রলোকটির অন্তরতম কামনা, সে বিষয়ে তাঁদের কোন সন্দেহ ছিল না। এই অসম্পূর্ণ বিবরণীর লেখক যখন দশ বছর আগের দিনগুলির দিকে ফিরে তাকায় তখন দেখতে পায় সাদা জ্যাকেট আর পুরনো ঢঙের পাদচ্ছদ পরা মিঃ হেয়ারকে। কিংবা যখন বিশেষ দিনগুলিতে কমিটির অধিবেশন বসত, তখন যে-হেয়ার তাঁর নীল রঙের কোট পরে শান্তভাবে কলেজে ঘুরে বেড়াতেন এবং সবসময়ই তাঁর উৎসাহ জাগাবার মতো কোন

জিনিস খুঁজে পেয়ে যেতেন, তাঁর ছবিগুলিও লেখকের মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে।

"একথা প্রায়ই বলা হয় যে, মিঃ হেয়ার শিক্ষার যত বড় সহায়কই হোন না কেন, নিজে তিনি অশিক্ষিত ছিলেন। সঠিকভাবে বলতে গেলে একথা সত্য নয়। সাধারণ বিষয়সমূহে ভালো শিক্ষা তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি মোটামুটি বিস্তৃত ছিল। বক্তা হিসাবে তিনি খারাপ ছিলেন না। সরলভাবে প্রয়োজনীয় কথা বলবার ক্ষমতা তাঁর আয়ত্ত ছিল। প্রশংসাপত্র বা সাধারণ চিঠিপত্র তিনি ভালোই লিখতে পারতেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ রচনাকারদের কারো কারো লেখা তিনি পড়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত লোক হিসাবে তিনি পরিচিত হতে পারতেন, কিন্তু তাঁর সারল্য ও আন্তরিকতার জন্যই তা হননি। এইসব গুণগুলি ছিল তাঁর সহজাত, এদের জন্যই তিনি পাণ্ডিত্যাভিমানের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন।

"তিনি অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন এ কথা কারো কাছে প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য আমার মোটেই নেই। তিনি প্রধানত বিশিষ্ট ছিলেন তাঁর উদার অনুভূতির জন্য। সন্দেহাতীতভাবে তাঁর অন্তরের এ ঐশ্বর্য ছিল অপরিসীম।

"এদেশবাসীরা ডেভিড হেয়ারকে ভোলেনি। সাশ্রু নয়নে দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমাধিক্ষেত্র পর্যন্ত গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে নানারকমভাবে তারা দেখিয়েছে যে, সস্নেহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা তাঁর স্মৃতিকে হৃদয়ে লালন করে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য অন্যতম একটি প্রথার কথা বলি। প্রতিবছর তাঁর মৃত্যুদিবসে যে-সভা আহূত হয় তাতে একটি যথাযোগ্য অভিভাষণ পাঠ করা হয় এবং গভীর স্নেহে সেই বক্তব্য সকলে হৃদয়ের মণিকোঠায় সঞ্চিত রাখেন।"

বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক 'শীল্'স্ ফ্রি কলেজ'-এর ১৮৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে লিখেছিলেন :

একথা গোড়াতেই আমি উল্লেখ করেছি যে হিন্দুকলেজ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ১৮১৮ কিংবা ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে পুরোপুরি এর কাজ চালু হয়নি। গভর্নর জেনারেল তথা কম্যাণ্ডার-ইন্-চীফ্ মার্কুইস অফ্ হেস্টিংস-এর শাসনকালে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈস্টের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য। কলকাতার তখনকার একজন পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট এবং সুপ্রীম কোর্টের দোভাষী মিঃ ব্লাকিআর তাঁকে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। এই শহরের সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোকদের প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ তিনি অনেকখানি বাড়িয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এদেশবাসীর উন্নয়নের অপরিহার্য উদ্যোগে সকলের সমর্থন লাভের জন্য আমাদের মৃত্যুহীন ডেভিড হেয়ারও অক্লান্তভাবে নিয়োজিত করতেন তাঁর সমস্ত কর্মপ্রেরণা ও প্রভাব।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। ঐ বছরের ১লা জুন ডঃ ব্রামলি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণ দেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মারা যান এবং তখন ডেভিড হেয়ার কলেজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ডঃ ব্রামলি যখন জীবিত ছিলেন তখনই স্বীকার করেছিলেন যে (কলেজের) "প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে সমস্ত অসুবিধাগুলি দেখা দিয়েছিল মিঃ হেয়ারের প্রভাব এবং সহযোগিতার ফলেই সেগুলি দূর করা সম্ভব হয়েছিল। হিন্দুকলেজ কিংবা স্কুল সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র শিক্ষালাভ করত। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার ফলে হেয়ার শুধু ছাত্রদের সাধারণ সংস্কার ও অভ্যস্ত চিন্তাধারার সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন না, অনেক সময় তাদের কারো কারো ব্যক্তিগত জীবনের কথা এবং স্বভাব চরিত্রও তাঁর জানা ছিল।

মেডিক্যাল কলেজের ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের অবস্থা ও প্রগতি-বিষয়ক যে বিবরণী আছে, তাতে ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে নিম্নলিখিত উল্লেখ পাওয়া যায় :

"১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটিতে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। স্বর্গত মিঃ হেয়ার সম্পাদকের পদ ও পরিচালনার ভার ত্যাগ করলে, ডঃ ডব্লু. বি. ও'সাগনেসী সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, পরিচালনভার গ্রহণ করেন মিঃ সিডনস.। সরকার মিঃ হেয়ারকে কলেজ কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ করায় তাঁর কর্মোদ্যোগ এবং সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপ্রেরণা এই সময় অব্যাহতই ছিল এবং তার ফলে আমরা উপকৃত হয়েছিলাম। এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিলেন। তার পর মৃত্যু এসে দেশীয় শিক্ষার এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক ও উৎসাহী সমর্থকের জীবনদীপ নির্বাপিত করল।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতায় ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য-ও-বিজ্ঞান চর্চার জন্য ডেভিড হেয়ার কি পরিশ্রম করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা দিয়েছি। এখন আমরা দেখব একই উদ্দেশ্যে দেশীয় ভাষাগুলিকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের উন্নতিকল্পে তিনি কি করেছিলেন। এদেশবাসীর মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি কি প্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তা-ও আমরা আলোচনা করব। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, ইংরেজী এবং প্রাচ্যভাষাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন বিদ্যালয় বা শিক্ষানিকেতনের উপযোগী বই রচনা করা, সেগুলিকে ছাপান এবং সস্তাদরে বা বিনামূল্যে সেগুলি বিলি করা। কিন্তু ধর্মসংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এর ছিল না। সার ই. এইচ. ঈস্ট, মিঃ জে. এইচ. হ্যারিংটন, মিঃ ডব্লু. বি. বেলি, ডঃ কেরী. জে. পিয়ার্সন, মিঃ ডব্লু. এইচ. ম্যাকনাটন, বাবু তারিণীচরণ মিত্র, বাবু রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন এবং আরো কয়েকজন ভদ্রলোককে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পরিচালক সমিতি। এই সমিতির সঙ্গে সময়ে সময়ে যুক্ত হতেন আরো কোন কোন ইওরোপীয় এবং দেশীয় ভদ্রলোক। কয়েকজন মিশনারী (মে, কেরী, ইয়েট্‌স্‌, পিয়ার্সন প্রমুখ) পুস্তক রচনার কাজে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, ইওরোপীয়, হিন্দু এবং

মুসলমান ভদ্রমহোদয়গণ মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সোৎসাহে কাজ করতেন। এদেশের জনসাধারণের মানসিক এবং নৈতিক প্রগতিতে আগ্রহশীল কয়েকজন ইওরোপীয় ভদ্রলোক অনুভব করতে পেরেছিলেন যে দেশীয়দের শিক্ষাদানের উপযোগী যথার্থভাবে সংগঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অভাব খুবই বেশি। স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালনা-সমিতির সদস্যেরা এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা চালাতে শুরু করলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে বিবেচনা করবার জন্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর টাউনহলে একটি জনসভা আহূত হল। এতে সভাপতিত্ব করলেন মিঃ জে. এইচ. হ্যাবিংটন। অন্যান্য প্রস্তাবসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি গৃহীত হল :

১। 'দি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠিত হবে।

২। ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষত ফোর্ট উইলিঅম বিভাগের শাসনাধীনে যে সমস্ত প্রদেশগুলি রয়েছে তাদের মধ্যে ব্যবহারিক জ্ঞানকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রসার করার জন্য বর্তমানে চালু বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দেওয়া ও তাদের উন্নতির চেষ্টা করা এবং প্রয়োজন হলে আরো বিদ্যালয়, শিক্ষায়তন প্রভৃতি স্থাপন করে সেগুলির সহায়তা করাই হবে এই সংগঠনের উদ্দেশ্য।

৩। এই সোসাইটির আর একটি উদ্দেশ্য হবে প্রাথমিক এবং অন্যান্য বিদ্যালয় থেকে বিশিষ্ট মেধাবী এবং প্রতিভাবান ছাত্রদের বাছাই করা। তারা যাতে যোগ্য শিক্ষক এবং অনুবাদক হয়ে স্বদেশবাসীকে (জ্ঞানের) আলোক জোগাতে পারে বা শিক্ষার সাধারণ কাঠামোকে উন্নততর করে তুলতে সমর্থ হয় সেই উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষা দেবার জন্য উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিষ্ঠানটির

আর্থিক ভিত্তি দৃঢ়তর হলে বিভিন্ন শিক্ষাচক্রগুলিতে এই ধরনের ছাত্রদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হবে।

৪। উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলি সফল করার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর এবং সুবিধাজনক বলে মনে হয়, তাদের ভার একটি পরিচালক-সমিতির ওপর ন্যস্ত হবে। এই বিষয়ে স্থানীয় অভাব-অভিযোগ ও সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

এই সোসাইটির লক্ষ্য যাতে আরো ভালোভাবে সাধিত হয় সেজন্য সমস্ত দেশে একই নীতির ভিত্তিতে গঠিত সহযোগী বিদ্যালয়সভা স্থাপনের সুপারিশ করা হবে এবং সে সম্পর্কে উৎসাহ দেওয়া হবে। বিশেষত প্রধান প্রধান শহর এবং কর্মকেন্দ্রগুলিতে এই ধরনের সভাস্থাপনে সমর্থন জানানো হবে।

অন্যান্য প্রস্তাবগুলি ছিল পরিচালক সমিতির ক্ষমতা, পরিচালক-বর্গের বার্ষিক নির্বাচন, তাদের যোগ্যতা এবং সংবিধান প্রভৃতি সম্পর্কিত। এই সভায় যাঁরা পরিচালক সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সার অ্যাণ্টনি বুলার, মিঃ জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডঃ কেরী, রেভঃ ডব্লু. ইয়েট্‌স্‌, মিঃ ই. এস. মণ্টেগু, মিঃ ডেভিড হেয়ার, বাবু রাধামাধব ব্যানার্জি এবং বাবু রসময় দত্ত। লেফটেন্যাণ্ট আরভিন এবং মিঃ মণ্টেগু নিযুক্ত হয়েছিলেন সম্পাদক। তিন মাসেই ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি দান হিসাবে ৯,৮৯৯ টাকা এবং প্রধানত হিন্দুদের কাছ থেকে বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ৫,০৬৯ টাকা পেল। মনে হয়, ডেভিড হেয়ার ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটিকে বাৎসরিক চাঁদা বাবদ ১০০ টাকা দিতেন। তিনি ছিলেন উভয় সোসাইটিরই উৎসাহী সদস্য। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির তিনি ছিলেন ইওরোপীয় সম্পাদক। ১৮২০

খ্রীষ্টাব্দে যে-সমস্ত দেশীয় বিদ্যালয়গুলি তাঁর দায়িত্বাধীনে ছিল সেগুলি সম্পর্কে তিনি বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন।

সমিতি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে তিনটি উপসমিতি নিয়োগ করে :

১। স্বল্পসংখ্যক নিয়মিত বিদ্যালয়স্থাপন ও তাদের সাহায্যদান, ২। দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য করা ও তাদের অবস্থার উন্নতি বিধান, ৩। পরিমিত সংখ্যক ছাত্রের ইংরেজী ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা। স্কুলবুক সোসাইটির দ্বিতীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ 'এই সোসাইটি স্থাপনের গোড়া থেকেই একটি জিনিস খুব প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হয়েছে। তা হোল, যে সমস্ত অসংখ্য দেশীয়-বিদ্যালয় রয়েছে তাদের কাছে সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থ সরবরাহ করা এবং তাছাড়াও যেসব এদেশীয় ভদ্রলোক নিজের বা পরিবারের ব্যবহারের জন্য এই গ্রন্থগুলি প্রয়োজনীয় বলে মনে করতে পারেন, তাঁদের কাছে সেগুলি পৌঁছিয়ে দেওয়া। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির উদ্যোগে হিন্দুশহর কলকাতায় প্রথম ব্যবস্থাটি অবলম্বিত হচ্ছে। এর দ্বিতীয় বিভাগটির দায়িত্ব হল কলকাতায় যেসমস্ত দেশীয় শিক্ষাচক্র আছে সেগুলিকে সাহায্য করা এবং তাদের উন্নতি বিধান করা। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা টালাতে যে-বিদ্যালয় গৃহটি দান করেছিলেন এবং ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা কলিঙ্গাতে যেটি দান করেছিলেন, সেই দু'টি বাদে এই সমিতি শহরের জনবহুল অংশে চারটি বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ করেছিল। মিঃ হেয়ারের অনুরোধে আরপুলির বিদ্যালয়টির ভার তাঁরই ওপর অর্পণ করা হয়েছিল। সমিতির প্রথম রিপোর্ট(১৮১৮-১৯)-এ লেখা হয়েছে :

"সমিতির নিশ্চিত ধারণা এদেশীয়দের সম্পর্কে তাঁর (হেয়ারের) ধৈর্য এবং আগ্রহের ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাবে। শুধুমাত্র পিতামাতার আর্থিক অভাবের ফলে যাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হয়, তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা তাঁর উদ্দেশ্য। তাই এখন যারা দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষালাভ করছে, তাদের ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করা তাঁর অভিপ্রেত নয়।" সমিতি হিসাব নিয়ে দেখেছিল যে ১৯০টি বাংলা পাঠশালায় গড়ে ২২টি অর্থাৎ সর্বসমেত ৪,১৮০ ছাত্র শিক্ষাগ্রহণ করত। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রিপোর্টটিতে আরো বলা হয়েছিল :

এই শিক্ষার সবটুকুই বর্ণ-ও-রাশিমালা লিখতে শেখা-এবং অত্যন্ত অসম্পূর্ণভাবে গণিত আয়ত্ত করার মধ্যে সীমিত। পাঠ অভ্যাস করার বালাই এখানে নেই। তার কারণও আছে। যদিও মাত্র গুটিকয়েক স্কুলে দু-জন কি তিনজন করে পুরোবর্তী ছাত্র জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ব্যবহারিক মূল্যসমৃদ্ধ রচনাবলী থেকে টুকরো টুকরো অংশ লেখা অভ্যাস করে, তবু তাদের সেই লেখায় ভুল বানানের বহর দেখলেই বোঝা যায় মূল পাণ্ডুলিপি কতখানি ভুল-ভ্রান্তিতে ভর্তি। বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা কিংবা পারম্পরিক ও নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কে কোন চেতনাই এখানে ছাত্রদের মধ্যে গড়ে ওঠে না।

রাজা রাধাকান্ত স্কুল বুক সোসাইটির পুস্তক প্রকাশে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রন্থগুলি বাংলা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হত। বাবু গোপীমোহন দেবের বাড়িতে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা গৃহীত হতো ; বিশিষ্ট ছাত্ররা এতে পুরস্কার পেত। ছাত্রদের অগ্রগতি বিচার করে গুরু বা শিক্ষক মহাশয়দের

অর্থ উপহার দেওয়া হত। স্কুল সোসাইটির কর্মোদ্যোগে কি কি উপকার সাধিত হচ্ছে, দেশীয় সম্পাদক সে সম্পর্কে ভাষণ দিতেন এবং তারপর অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হত। প্রথম পরীক্ষা গৃহীত হবার সময় জনৈক দেশীয় ভদ্রলোক নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন: 'দেশের অস্থায়ী বাসিন্দারাই শুধু যদি এদেশবাসীর কল্যাণসাধনে এত আগ্রহী হন, তাহলে বাংলাদেশের ধনী দেশীয় অধিবাসীদের পক্ষে স্বদেশবাসীর উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকা খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে।'

বাংলা বিদ্যালয়গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সুশৃঙ্খল তত্ত্বাবধানে আনার উদ্দেশ্যে শহরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হল। ববু দুর্গাচরণকে দেওয়া হল ৩০টি বিদ্যালয়ের ভার—এগুলিতে ছাত্র ছিল প্রায় ৯০০ জন। বাবু রামচন্দ্র ঘোষের দায়িত্বাধীনে এল ৪৩টি বিদ্যালয়, এগুলির ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮৯৬। বাবু উমানন্দন ঠাকুর এবং রাধাকান্ত দেব পেলেন যথাক্রমে ৩৬টি এবং ৫৭টি বিদ্যালয়ের ভার। এদের ছাত্রসংখ্যা ছিল যথাক্রমে প্রায় ৬০০ এবং ১,১৩৬। এঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'এই ভদ্রলোকগণ অত্যন্ত সজীব উৎসাহের সঙ্গে সোসাইটির মতামত গ্রহণ করলেন এবং স্ব স্ব বিভাগগুলির দায়িত্বভার গ্রহণে নিজেদের পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করলেন।' এই চারজন অধীক্ষকের বাড়িতে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থ মজুত থাকত যাতে তাঁরা কোন রকম দেরী না করে সেগুলিকে বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করতে পারেন। এঁরা নিজেদের বাড়িতে বছরে অন্তত তিনবার করে প্রত্যেক বিভাগের প্রধান ছাত্রদের পরীক্ষা নিতেন। ছাত্র এবং গুরুদের যথাক্রমে বই এবং টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হোত।

আরপুলি পাঠশালা সম্পূর্ণরূপে ডেভিড হেয়ারের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হতে লাগল। এখানেই কলাপাতায় লিখতে উবু হয়ে বসতেন আমাদের বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সর্বনিম্ন শ্রেণীর ছাত্ররা লিখত খড়ি দিয়ে। যারা তালপাতায় লিখত তারা ছিল এদের চেয়ে আর এক ধাপ উঁচু শ্রেণীর ছাত্র। যারা কলাপাতায় লিখত তারা পড়ত এদের চেয়ে আর এক শ্রেণী উঁচুতে। সবচেয়ে উঁচু শ্রেণীর ছাত্ররা লিখত কাগজে।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে এই পাঠশালার কাছেই ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হল। পাঠশালার শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের ভর্তি করে নেওয়া হত এখানে। কৃষ্ণমোহনকে প্রথমে পাঠশালা থেকে এখানে ভর্তি করা হয়েছিল, তারপর তিনি পড়তে গেলেন হেয়ারের বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে আবার তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন। এই ইংরেজী বিদ্যালযটি পরবর্তী কালে হেয়ারের বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। (পূর্বোল্লিখিত) চারটি বিভাগের দেশীয় বিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা প্রতি বৎসর রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে গৃহীত হত। দেশীয় এবং ইওরোপীয় অনেক ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত থাকতেন। পরীক্ষার ফলাফল খুব সন্তোষজনক হত। তত্ত্বাবধানের পরিকল্পনা আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসৃত হলে কতখানি সুফলদায়ক হয়ে ওঠে, তা পূর্ণভাবে প্রমাণিত হত। সমিতির উদ্যোগী সদস্যেরা এ দায়িত্বপালনে যে-পরিশ্রম করতেন তার সাফল্যও এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠত।"

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির প্রথম রিপোর্টের উপসংহারে বলা হয়েছে :

'সোসাইটি যে কল্যাণসাধনের ব্রত গ্রহণ করেছেন তাকে অসীম সুফলপ্রসূ করতে গেলে উত্তরসূরীদের আর কিছুই প্রয়োজন হবে না অর্থ আর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়া। রাজধানী এবং তার আশপাশে যে-সমস্ত বিষয়গুলির উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত সেগুলো হল বয়স্থ লোকেদের এবং মহিলাদের শিক্ষা, দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিস্তৃতি ও উন্নতিসাধন এবং আরো অধিকসংখ্যক সপ্রতিভ ছাত্রদের ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও তাদের বৈজ্ঞানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া।' মনে হয়, স্কুল সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটির দৃষ্টি ছিল (সমাজের) নিম্ন এবং উচ্চ, উভয় শ্রেণীর লোকেদের শিক্ষার প্রতি (প্রথম রিপোর্টের একাদশ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২-রা মে স্কুল সোসাইটির পরবর্তী বার্ষিক সভায় রেভারেণ্ড মিঃ কিথ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করলেন। তাছাড়া প্রধান বিচার-পতিও বললেন যে এদেশবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের কেউ কেউ যে এদিকে নজর দিচ্ছেন, তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। কোনকোন ক্ষেত্রে তাঁরা আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের (পরিবারের) মহিলাদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনাগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট হচ্ছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ সঙ্কলিত হয়েছে দ্বিতীয় রিপোর্টে; তাতে জানা যায় যে (সেইসময়ে) পাঁচটি নিয়মিত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল এবং আরপুলিতে হেয়ারের বিদ্যালয়টি 'বস্তুতঃ তাঁর নিজের ব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানাধীনে থাকার ফলে বিদ্যালয়টির উন্নতি

হচ্ছিল।' বার্ষিক পরীক্ষায় একত্রিত হত দেশীয় বিদ্যালয়-গুলির অগ্রণী ছাত্ররা এবং হিন্দু কলেজে পাঠরত সোসাইটির বৃত্তিভোগী ছাত্ররা। এ ছাড়া বাঙালী মহিলাদের শিক্ষার জন্য জুভেনাইল সোসাইটি যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন তার বাঙালী ছাত্রীরা এতে উপস্থিত থাকত। এখানে তাদের পুরস্কার দেওয়া হত। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য সোসাইটি ৩০ জন ছাত্রকে হিন্দু কলেজে প্রেরণ করেছিল যাতে তারা সেখানে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে। তৃতীয় রিপোর্ট সঙ্কলনের তারিখ হল ৯ই মার্চ, ১৮২৪। এতে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৪ সাল পর্যন্ত সময়ের বিবরণ দেওয়া আছে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, 'এই পরীক্ষা-গ্রহণের কাজ শুরু হোল ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রায় ৪০ জন ছাত্রীকে নিয়ে।* এর পর স্কুল সোসাইটির খরচায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এবং দেশীয় বিদ্যালয়গুলির অগ্রণী ছাত্রদের পরীক্ষা গৃহীত হোল। এই সব ছাত্রদের ও তাদের গুরুমশায়দের পুরস্কৃতও করা হোল।

১৮২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ বিবরণীতে বলা হয়েছে:

অর্থের অভাবে কমিটি আরপুলির বিদ্যালয়টি ছাড়া আর সব নিয়মিত বিদ্যালয়ের পরিচালনভার ত্যাগ করেন। আরপুলি বিদ্যালয়টির অগ্রগতি রইল অব্যাহত। হেয়ার

---

* রাজা রাধাকান্ত তাঁর রিপোর্টে বলেছেন: 'ফিমেল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন দেশীয় বালিকারও পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। পড়া এবং বানানে তাদের পারদর্শিতা খুবই সন্তোষজনক হয়েছিল। সমস্ত ঘটনাটিতে উপস্থিত সকলেই খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।'

বাংলাভাষায় পারদর্শিতা লাভের ওপর খুব জোর দিতেন। ইংরেজী বিভাগে যারা উন্নীত হত, তাদের সকালে এবং সন্ধ্যায় পাঠশালাতে যেতে হত। বাংলা ভাষাতেও তাদের দক্ষতা আশপাশের দেশীয় বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির যে প্রিপ্যারেটরি ইংরেজী বিদ্যালয়টি ছিল তাতে ভর্তি হতে গেলে একটি শর্ত পালন করতে হত। বাংলায় যে-সমস্ত ছাত্রের যথেষ্ট জ্ঞান হয়নি বলে বিবেচিত হোত, নিয়ম ছিল যে তাদের প্রতিদিন অন্তত দু-ঘণ্টার জন্য অবশ্যই যে কোন একটি দেশীয় বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে হবে।

পরবর্তী বিবরণ হল ১৮২৬-১৮২৭ সালের। আরপুলি বিদ্যালয় সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে : 'দেশীয় বিদ্যালয়গুলির কাছে এ বিদ্যালয়টি যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তাই হল এর অন্যতম প্রধান সার্থকতা। বিদ্যালয়-সন্নিহিত অঞ্চলের দেশীয় অধিবাসীরা বিদ্যালয়টি সম্পর্কে কি উঁচু ধারণা পোষণ করেন তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়, নিজেদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য দেশের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত লোকেদের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে।' আরপুলি বিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগ সম্পর্কে এই বিবরণে বলা হয়েছে : 'অধিকাংশ ছাত্রই খুব উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। সবচেয়ে যোগ্য ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজনকে কলেজ স্কোয়ারের ইংরেজী বিদ্যালয়ে এবং অন্য কয়েকজনকে তাদের কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ হিন্দু কলেজে উন্নীত করা হয়েছে। এর ফলে বিদ্যালয়ে তাদের সহাধ্যায়ীরা তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার উৎসাহ পাবে।' এতে আরো বলা হয়েছে যে, কলেজ স্কোয়ারে স্কুল সোসাইটির দ্বারা পরিচালিত

ইংরেজী বিদ্যালয়টির (যার পূর্বনাম ছিল পটলডাঙা স্কুল) অগ্রগতি আজও অব্যাহত। তাছাড়া, 'কমিটি একথা বলতে পেরে সুখী যে সাধারণভাবে সোসাইটির বৃত্তিভোগীরা আজও কলেজের উজ্জ্বলতম রত্নদের মধ্যে পরিগণিত হবার যোগ্য।'

বাংলা স্ত্রীশিক্ষায়তন স্থাপনের জন্য এবং সেগুলির সাহায্যার্থে ক্যালকাটা জুভেনাইল সোসাইটির প্রয়াসের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। এ দেশীয় শিক্ষক জোগাড় করা ছিল খুব কষ্টকর। সভাপতি রেভারেণ্ড ডব্লু এইচ পিয়ার্স বলেছিলেন: '১৮২০ সালের এপ্রিল মাসে একজন সুযোগ্য শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গেল এবং ১৩ জন বিদ্যার্থী সংগৃহীত হল। ধীরে ধীরে যে-অনুপ্রেরণা লাভের সৌভাগ্য সোসাইটির হয়েছে তা সোসাইটির আপন উদ্যমের ক্ষুদ্র সাফল্য থেকে ততটা আসেনি যতটা এসেছে অন্য ক্ষেত্র থেকে। ভারতবর্ষের মহিলারা যদি আরো বেশি উদ্যমের সঙ্গে, আরো ব্যাপক সহযোগিতার সঙ্গে তাঁদের চারিপাশে অজ্ঞতাচ্ছন্ন স্ত্রীজাতির মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের চেষ্টা করেন, তাহলে যে সুদূর প্রসারী সাফল্য অর্জিত হবে, তার সম্ভাবনাই সোসাইটিকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

শ্যামবাজার, জানবাজার, এণ্টালী, প্রভৃতি অঞ্চলে সোসাইটি মহিলাদের জন্য বিদ্যালয়-স্থাপনে তৎপর হল। এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষার ওপর লেখা 'স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ক' নামে একটি বাংলা পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি সোসাইটিকে দান করলেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা যে প্রচলিত ছিল, এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য ছিল তাই দেখানো। তাছাড়া অনেক হিন্দু মহিলার নাম যে তাঁদের কৃতিত্ব-গৌরবে ভাস্বর হয়ে আছে

এবং স্ত্রীশিক্ষায় 'অনুপ্রেরণা জোগালে তা যে সুফলপ্রসূ হবে, সেগুলি প্রদর্শন করানোও ছিল এই পুস্তিকাটির উদ্দেশ্য।' ক্যালকাটা জুভেনাইল সোসাইটির কর্মসমিতি পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণ করলেন এবং সেটিকে মুদ্রিত করা স্থির হল। রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষায় শুধু এইভাবেই প্রেরণা জোগাননি। তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেসব পরীক্ষা গৃহীত হত, তাতে তিনি বালক-বালিকাদের পরীক্ষা নিতেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রসার যে স্কুল সোসাইটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল একথা আমরা আগেই বলেছি। বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটির (পূর্বনাম: ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল সোসাইটি) উদ্যোগে এই লক্ষ্য সাধিত হচ্ছিল। মনে হয় এই নামটি পরিবর্তিত হয়ে 'লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশনে'র রূপ ধারণ করে। ডেভিড হেয়ার এই সোসাইটিতে চাঁদা দিতেন। মাঝে মাঝেই যেসব পরীক্ষা গৃহীত হত, সেগুলিতে উপস্থিত থেকে তিনি এদেশীয় মহিলাদের শিক্ষায় উৎসাহ জোগাতেন। লণ্ডনের ব্রিটিশ অ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিকে লিখেছিল, একজন উচ্চগুণসম্পন্না মহিলাকে তাঁরা পাঠাতে পারেন যাতে এদেশীয় মহিলাদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্তন করা যায়। অবশ্য তাঁকে নিয়োগ করার মতো অবস্থা ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির যদি না থাকে, তাহলে তাঁকে তাঁরা নিয়োগ না-ও করতে পারেন। উল্লিখিত মহিলাটি হলেন মিস কুক, পরবর্তীকালে মিসেস উইলসন। মিস কুককে কর্মে নিয়োগ করার মতো যথেষ্ট অর্থ স্কুল সোসাইটির ছিল না; সেইজন্য চার্চ মিশনারী সোসাইটিতে তিনি নিজের ব্যবস্থা করে নিলেন এবং কলকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে

প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখাতে লাগলেন। এদেশীয় মহিলাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেডিজ সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল। মিসেস উইলসন যেসব দেশীয় স্ত্রীশিক্ষায়তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলির ভার চার্চ মিশনারী সোসাইটির ওপর ন্যস্ত হল। তবে লেডিজ সোসাইটি একটি স্বনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হিসাবেই চালু রইল। এই সোসাইটিতে কয়েকজন এদেশীয় ভদ্রলোক চাঁদা দিতেন। কর্নওয়ালিশ স্কোয়ারের পূর্বকোণে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ এতে ২০,০০০ টাকা দান করেন। মনে হয়, রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে যেসব পরীক্ষা গৃহীত হত, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই হিন্দু বালিকারা তাতে আর অংশ গ্রহণ করত না। স্কুল সোসাইটির যে পরিমিত সঙ্গতি ছিল তাই দিয়ে তারা প্রথমে পুরুষদের শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নততর করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করেছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জানুআরির বিবৃতিতে রাজা রাধাকান্ত বলেছেন : 'আমার বিনীত অভিমত হোল, সোসাইটি রাজধানীর দেশীয় শিক্ষালয়গুলির প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে এদেশবাসীর অনেক উপকার সাধন করেছেন। একথা এখানে লেখা আমি সংগত বলে মনে করছি। সব সম্ভ্রান্ত এদেশীয় পরিবারের সন্তানেরাই সেখানে শিক্ষালাভ করে, কারণ বিদ্যালয়গুলি হয় তাদের বাড়িতে, নয়তো তাদের বাড়ির কাছেই অবস্থিত। সোসাইটির কর্মোদ্যোগের ফলে খুবই উন্নতি সাধিত হচ্ছে এবং ছাত্রদের অগ্রগতির মাত্রা প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জন্যই এই দেশীয় বিভাগটির প্রতি সোসাইটির সদয় মনোযোগ অবিচল থাকা একান্তভাবে অভীপ্সিত।'

স্কুল সোসাইটি এবং স্কুল বুক সোসাইটি ছিল যমজ ভ্রাতৃ-দ্বয়ের মতো। তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করত এবং শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করত। সৌভাগ্যবশত, সুদক্ষ এবং বাস্তব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই এই দু-টি প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন।

জাতিবৈষম্যের কোন অনুভূতি এর মধ্যে ছিল না—ছিলনা কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি। যে আবেগ এই দুইটি প্রতিষ্ঠানেই সঞ্চালিত হয়েছিল তার লক্ষ্য ছিল সঙ্ঘবদ্ধভাবে সকলে একমত হয়ে এদের উপযোগিতাকে কার্যকরী করে তোলা। সোসাইটি দু-টির দৃষ্টি একটি লক্ষ্যের প্রতি স্থিরনিবদ্ধ ছিল, তা হল: জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির এবং নীতিবোধের উন্নতি সাধন করা। অষ্টম বিবরণীতে স্কুল বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে: 'সোসাইটি একটি মহান উদ্দেশ্যসাধনে তৎপর। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে-পদ্ধতি অবলম্বিত হচ্ছে, তা ইংরেজ, মুসলমান, সকলের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব। কোন মতামতই এতে অনাদৃত হচ্ছে না, কোন ধর্মীয় সংস্কারকেও এতে আঘাত করা হচ্ছে না। সাধারণ জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করাই এর উদ্দেশ্য, তার ফলাফল যা হবার তা আপনিই হবে।'

দ্বিতীয় বাৎসরিক সভায় ডঃ কেরীর প্রস্তাবক্রমে, 'কমিটির ভিতরের এবং বাইরের যে-সমস্ত দেশীয় ভদ্রলোক সময়োপযোগী সোৎসাহ উদ্যোগের সঙ্গে সোসাইটির বিভিন্ন বিভাগের কর্মপ্রয়াসে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ দেওয়া হল; স্বীকার করা হোল, তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা ছাড়া বিবরণীতে উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের কাজগুলি

সুসম্পন্ন করা সম্ভব হত না।' আমাদের স্বদেশবাসীরা আরো একটি সৎকাজ করেছিলেন। দেশীয় ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত কতকগুলি অশ্লীল পুস্তক সম্পর্কে তাঁদের বিরূপ মনোভাব তাঁরা সোসাইটিকে জানিয়েছিলেন।

'কয়েকজন সম্ভ্রান্ত দেশীয় ভদ্রলোকের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রয়াস' বলে এই কর্মোদ্যোগকে চিহ্নিত করেছিলেন মিঃ লার্কিন্স। স্কুল বুক সোসাইটি তার মূল নিয়মকানুন মেনে কাজ করে যেতে লাগল। একটি বাৎসরিক সভায় মিঃ হোল্ট ম্যাকেঞ্জী তাঁর ভাষণে বললেন যে, দেশীয় ভাষাগুলির চর্চায় সোসাইটির তৎপরতায় তিনি আনন্দিত। কেননা, সোসাইটির যা প্রধান এবং প্রান্তিক লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেই ইংরেজী চর্চার পথ এতেই প্রশস্ত হবে। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার দৌত্যেই যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও স্বার্থের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, এই সত্যের ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করলেন।

তিনি বললেন, ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে দেশীয় ভাষায় রচিত পুস্তকসমূহে। সেই পুস্তকগুলিই আমাদের ভাষা, সাহিত্য এবং বিজ্ঞানের ভূমিকা রচনা করেছে। যেসব ভাবধারার আশ্রয়ে ভাষা পুষ্ট, সেই ভাবধারাগুলি যদি একবার পরিচিত হয়ে পড়ে, তাহলে সেই ভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনের পথ আর দুর্গম থাকে না।—ঝর্ণার উৎসের থেকে দূরবর্তী জলে যাঁরা তৃষ্ণা মিটিয়েছেন, তাঁদের স্বভাবতই তখন আগ্রহ থাকে উৎসমুখের পবিত্র গভীর ধারার স্বাদ নিতে। অভিজ্ঞতা একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছে যে, বাংলা রচনার চাহিদা এবং সমাদর যেমন

বেড়েছে, ইংরেজী-চর্চার আকাঙ্খাও ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।' একাদশ বিবরণীতে কমিটি তাঁদের স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন : 'ইংরেজী ভাষায় পরিণত জ্ঞান ভারতবর্ষের উন্নতির পথে অনেকখানি সহায়তা করবে।'

দেশীয় বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দেবার জন্য এবং তাদের প্রেরণা জোগাতে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। কেরী, মার্শম্যান এবং ওআর্ড ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক। শ্রীরামপুরের সন্নিহিত অঞ্চল, কাটোয়া এবং ঢাকায় অনেকগুলি দেশীয় বিদ্যালয় ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির তত্ত্বাবধানাধীনে তাদের কাজের ধারা ছিল ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির মত। ডেভিড হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানটিতে চাঁদা দিতেন। এদেশবাসী ভদ্রমহোদয়েরা এখানে যে সাহায্য করেছিলেন তার উল্লেখ করে দ্বিতীয় বিবরণীতে বলা হয়েছে : 'কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁদের স্বজাতির সহৃদয়তার জন্য গভীরতম কৃতজ্ঞতার অনুভূতি অন্তরে পোষণ করেন। সেই সঙ্গে তাঁরা এই দেখেও খুবই আনন্দিত যে, জনহিতব্রতী অনেক এদেশীয় ভদ্রলোকও প্রতিষ্ঠানটিতে যোগ দিচ্ছেন। বর্তমানে তাঁদের সংখ্যা প্রায় আমাদের স্বজাতীয়দের সংখ্যারই সমান।' মহান কর্মী হিসাবে ডেভিড হেয়ার ইতিমধ্যেই সুপরিচিত ছিলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির বাৎসরিক সভায় তাঁকে উপস্থিত হতে দেখা গেল। একটি প্রস্তাবও সেখানে তিনি উত্থাপন করলেন।

১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। সেই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময় তিনি ঐ সালেরই ৬ই মার্চ স্কুল বুক সোসাইটিকে একটি চিঠি লেখেন :

কয়েকদিন আগে আপনাদের চিঠি পেয়েছি। তার উত্তর দিচ্ছি। স্কুল বুক সোসাইটি যে উদ্দেশ্যসাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তকগুলি প্রকাশ করেছেন, আমার ধারণা, তার মধ্যে কতকগুলি পুস্তক সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফল হবে।

আমার মনে হয়, যেসব বিদ্যালয়ে এই পুস্তকগুলিই একমাত্র পাঠ্যপুস্তক, স্কুল সোসাইটির আনুকূল্যপুষ্ট সেই বিদ্যালয়গুলি এইসব পুস্তক থেকে যথেষ্ট সুফল লাভ করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, দেশীয় বিদ্যালয়গুলিতে যে-অগ্রগতির লক্ষণ সুস্পষ্ট, এদের ছাড়া তা কখনই সম্ভব হত না।

আমার ধারণা, কলিকাতায় আর এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যেখান থেকে এই ধরনের বই প্রকাশিত হয়। আপনাদের সোসাইটির উদ্যোগেই যে নিয়মিত বইয়ের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়েছে, আমার মনে হয়, সেজন্য এদেশের শিক্ষার সুহৃদ্‌রা সোসাইটির কাছে গভীর ঋণে ঋণী।

স্কুল সোসাইটি প্রধানত যেসব বই প্রকাশ করেছেন এবং যেগুলির সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় আছে, সেইগুলি হয় ইংরেজীতে নয়ত বাংলায় লিখিত, আর তাছাড়া, প্রাথমিক পর্যায়ের। এইসব বইগুলিতে কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করার কল্পনা আমার মাথায় নেই।

আমি কেবল সোসাইটির কাছে কতকগুলি বই পুনঃপ্রকাশ করার যৌক্তিকতা তুলে ধরছি। ইংরেজী-তে গোল্ডস্মিথ-কৃত ইংলণ্ড রোম এবং গ্রীসের ইতিহাসের যে সংক্ষিপ্তসার আছে, তার ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রকাশ করা চলে। কৌতুকপ্রদ গল্প আর ঐতিহাসিক বিবরণে সমৃদ্ধ এমন সব ছোট ছোট দ্রুত পঠনোপযোগী ইংরেজী বইও প্রকাশ করা উচিত, ঠিক বানান শেখার ধাপ উত্তীর্ণ হলেই যেগুলি পড়তে পারা যায়। এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজন এদেশে খুবই বেশি। আমার দৃঢ় ধারণা, ন্যায়সঙ্গত দামে এধরনের বই অনেক বিক্রী করা যাবে।

পুরস্কারোপযোগী একটি গ্রন্থমালা আপনারা প্রকাশ করবেন বলে

স্থির করেছেন। যেধরনের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন, এই গ্রন্থমালায় সেই উপযোগিতা নিশ্চয়ই থাকবে। এদের সাহায্যে অধ্যবসায়ী বিদ্যার্থীকে পুরস্কৃত করা যাবে, এবং তার ফলে এই বিদ্যার্থীদের সহাধ্যায়ীরা তাদের অনুকরণ করবার প্রেরণা পাবে। তাছাড়া বইগুলি প্রকাশিত হলে এদেশের সাধারণ যুবক সম্প্রদায় নিজেদের বাড়িতে বসেই পড়ার বা বিদ্যাভ্যাস করার উৎসাহ পাবে। আর, এসবই একান্তভাবে আমাদের কাম্য। তবে এ প্রসঙ্গে আমার একটি নিবেদন আছে। উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে উভয় ভাষায় সুপণ্ডিত এমন কয়েকজন কর্মক্ষম দেশীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে হবে, যাঁরা অনুবাদ কাজগুলিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তত্ত্বাবধান করতে পারবেন। তাহলেই প্রচলিত এবং সর্বজনবোধ্য ভাষায় এই বইগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। আমার ধারণা, এছাড়া বইগুলির উপযোগিতা খুবই সামান্য হবে। স্কুল সোসাইটি যেসব বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করে, তাতে পুরস্কার দেবার জন্য যদি স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত এই ধরনের বই সংগ্রহ করার সুযোগ স্কুল সোসাইটি পায় তাহলে সে নিঃসন্দেহে সুখী হবে। তবে আমাদের স্কুল সোসাইটির আর্থিক অবস্থা এমন শোচনীয় যে কত সংখ্যক বই আমরা নিতে পারব তা এখন সঠিক করে বলা মুস্কিল। বইগুলির দাম কত হবে এবং আমাদের তহবিলের অবস্থা তখন কি রকম থাকবে, তার ওপর এই সংখ্যা অনেকটা নির্ভর করবে। আমি দুঃখিত যে আপনাদের দেবার মত কোন পাণ্ডুলিপি বর্তমানে আমার হাতে নেই, সেরকম কিছু আপনাদের জোগাড করে দিতে পারলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হ'ব।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুআরি স্কুল বুক সোসাইটির যে বার্ষিক সভা হ'ল, তাতে—

ডেভিড হেয়ার বললেন, শব্দের ওপর যথেষ্ট দখল না থাকায় তিনি যদিও নিজের মতামত এবং অনুভূতি ঠিকভাবে প্রকাশ করতে

পারছেন না, তবুও এটুকু অন্তত তিনি বলবেনই যে এদেশবাসীর উন্নতিসাধনে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির চাইতে মহত্তর আর কোন প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁর জানা নেই।

এই প্রথম ডেভিড হেয়ার সর্বসাধারণের কাছে জানালেন, দেশীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁর 'সদাসর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার কথা', জানালেন যে এদেশবাসীরা তাঁকে বিদেশী হিসাবে নয়, নিজেদেব একজন 'জাতভাই' হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। হেয়ার এবং অপর কযেকজনের সঙ্গে পরামর্শ করে জি. সি. পি. আই (জেনারেল কমিটি অফ্ ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্)-এর সম্পাদক ডঃ এইচ. এইচ. উইলসন ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই এক চিঠি লেখেন। তাতে তিনি একটি নতুন গ্রন্থমালা প্রকাশেব প্রস্তাব করেছিলেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত রাজা রাধাকান্ত দেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ডেভিড হেয়ার সম্পর্কে নিম্নলিখিত উল্লেখ আছে :

'তিনি (রাধাকান্ত) অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে (ভূতপূর্ব) স্কুল সোসাইটির অবৈতনিক দেশীয সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন। তিনি মানবহিতৈষী স্বর্গত ডেভিড হেযারের সঙ্গে মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষার উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে দেশীয় বিদ্যালযগুলিকে সক্রিয নিযন্ত্রণে এনে তাঁরা সেগুলিতে নিয়ম এবং শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে চাইলেন। বিদ্যালয়গুলির অগ্রগতির সঠিক হিসাব নেবার জন্য মাঝে মাঝে পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা চালু করলেন।'

শহরের অন্যতম আদি বাসিন্দা বাবু কৃষ্ণমোহন মল্লিক শীল্'স্ ফ্রি কলেজের ১৮৬৮-৬৯ সালের রিপোর্টে মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষার প্রথম যুগ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন :

'একথা খুবই সুবিদিত যে আগেকার দিনে আমাদের সন্তানদের কাছে পড়তে যাবার একমাত্র জায়গা ছিল গুরুমশায় চালিত বেসরকারী পাঠশালা। এইসব গুরুমশায়েরা আসতেন প্রধানত বর্ধমান জেলা থেকে ; বাংলাভাষা আর গণিতের প্রাথমিক পাঠ দেওয়াই ছিল তাঁদের কাজ। প্রত্যেক পাঠশালার ছাত্রসংখ্যা ছিল তখন ২০ থেকে ৪০-এর মধ্যে। পাঠশালার মাহিনা হিসাবে পর্যায় অনুযায়ী মাথা পিছু দু আনা থেকে আটআনা দক্ষিণা দিতে হত ; এ ছাড়া হিন্দু পরব উপলক্ষে উপরি দক্ষিণা হিসাবেও গুরুমশায়দের কিছু দিতে হত।

প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্রদের ঘরের মেঝেতে কিংবা তালপাতায় অক্ষর লেখা অভ্যাস করতে হত। তারপর যখন তাদের বর্ণপরিচয় ও বানান শেখা হয়ে যেত এবং তারা যখন শব্দ ও বাক্যগঠন শিখে ফেলত তখন তাদের উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত করা হত। সেখানে যোগ, বিয়োগ, গুণ, জমা ওয়াসিল বাকি ও অন্যধরনের গণনা শেখানো হোত তাদের। এছাড়া তাদের কলাপাতার ওপর চিঠিপত্রাদি লিখতে হোত এবং গুরুদক্ষিণা, গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি কতকগুলি ধরা-বাঁধা বিষয়ের ওপর পড়তে হত। সবচেয়ে উঁচু স্তরে উঠলে, প্রধানত হস্তাক্ষর সুন্দর করবার জন্য তারা বিভিন্ন ধরনের জমিদারী দলিলপত্র বা ঐ সংক্রান্ত রচনা লিখতে শিখত। এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে হিসাবপত্র-সংক্রান্ত যেসব নিয়মকানুন পাঠশালায় শেখানো হোত পরবর্তী জীবনে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণিত হত ; তার সার্থকতা এখনও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশত সাহিত্যবিষয়ে এই পাঠশালাগুলির ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ শূন্য ; পাঠশালা ত্যাগ করার পরেও ছাত্রদের মন যুক্তি বা বিচার করার মতো প্রশস্ততা লাভ করত না ; শুধুমাত্র সুসম্বদ্ধ শিক্ষাবিধিতেই বস্তু সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে ওঠে পাঠশালায় পড়ার পর তারা সেই দৃষ্টি লাভ করতে পারত না। আপন ভাষায় তাদের এমন দখল থাকত না যাতে তারা নিজে থেকে কিছু রচনা করতে পারে। নির্ভুল বাক্য রচনা করা কিংবা

ব্যাকরণ, রচনাশৈলী ও ভাষার সামঞ্জস্য ঠিক ঠিক বজায় রেখে কিছু লেখা ছিল তাদের ক্ষমতার বাইরে। কোন গ্রন্থে বা কোন লেখায় সাধারণ ভাষার চাইতে একটু ঐশ্বর্যশালী ভাষায় বিবৃত কোন মহৎ ও উচ্চ ভাব বোঝবার ক্ষমতাই ছিল না তাদের। সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেক লেখকই নিজের নিজের মতো বানান তৈরি করত; তাছাড়া, আমাদের বর্তমান শাসকদের পূর্ববর্তী শাসকদের সময়কালীন সুদূর অতীত থেকে যেসব ফার্সী শব্দ বা শব্দপ্রয়োগের খুঁটিনাটি চলে আসছে নিজেদের নিয়মশৃঙ্খলাহীন অসংলগ্ন ভাষায় সেইসব মিশিয়ে দিত এই লেখকেরা। সাধারণ হিন্দুদের ব্যক্তিগত কথাবার্তায় এই ত্রুটি আরও প্রকটভাবে ধরা পড়ত।

তাদের কথাবার্তায় অথবা সম্ভাষণে মনের ভাবপ্রকাশের উপযোগী সুষ্ঠু শব্দের অভাব অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ত। আলাপ-আলোচনার স্রোত হয় মাঝপথেই থামাতে হত, নয়ত শ্রোতাকেই উপযুক্ত শব্দ জুগিয়ে পাদপূরণ করতে হত। এদেশবাসীরা নিজেদের মাতৃভাষাতেই ছিল অজ্ঞ; অথচ আমাদের সন্তানদের মানসিক অগ্রগতির ভিত্তিই হওয়া উচিত মাতৃভাষার গভীর অনুশীলন। হে আমার তরুণ বন্ধুরা, আপনারা জানেন এদেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কলঙ্কমোচনের পথে প্রথম পদক্ষেপ কি? যিনি প্রকৃতই মহৎ এবং প্রকৃতই মানবপ্রেমিক এদেশীয় শিক্ষার সুহৃৎ সেই ডেভিড হেয়ারই শিক্ষাক্ষেত্রে অসাধারণ সফলপ্রদ এক পরিবর্তন এনেছিলেন। একথা সুবিদিত যে এখন তাঁর নামে যে-অঞ্চলের নাম হয়েছে 'হেয়ার স্ট্রীট' সেখানে বড় ও ছোট বিভিন্ন ধরণের ঘড়ি নির্মাণের কাজ করতেন তিনি। আমাদের সন্তানেরা যে উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছে তার পথ প্রশস্ত করার জন্য তিনি হৃদয় মন অর্পণ করেছিলেন; সেই মহৎ উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আক্ষরিক অর্থে পার্থিব সব ঐশ্বর্যই ত্যাগ করেছিলেন তিনি। সেইজন্য তাঁর স্মৃতির কাছে আমার স্বদেশবাসীর চিত্ত ঋণী হয়ে আছে, আর থাকবেও চিরকাল। এদেশের শিক্ষাদান-পদ্ধতির কি গলদ ছিল

তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। তাছাড়া আমাদের দেশের তরুণেরা যে উন্নতি করতে পারবে সে ভরসাও তাঁর ছিল। তাই সংস্কৃত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের পয়সায় তিনি কালীতলায় কাছে ঠনঠনিয়ায় একটি অবৈতনিক পাঠশালা খুললেন। তরুণমতি ছাত্রদের উপযোগী প্রাথমিক বা ঐ ধরনের বই ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করার জন্য পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হল। এইভাবে ছেলেরা সর্বপ্রথম নির্ভুল বানান বা প্রকৃত পাঠ শেখবার সুযোগ পেল। খাতায় নাম ছিল প্রায় ৫০০ জন ছেলের, যাতে তারা নিয়মিত হাজিরা দেয় বা ঠিকমতো পড়াশুনা করে, সেজন্য যোগ্যতা অনুযায়ী তিনি মাসে চার আনা থেকে এক টাকা করে দিতেন তাদের প্রত্যেককে। নিজের সাংসারিক কাজকর্ম অবহেলা করে প্রতিদিন ১১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত কিংবা তারও পরে তিনি স্বয়ং পণ্ডিতদের কাজ তত্ত্বাবধান করতেন, কিংবা যখন দরকার পড়ত তখনই শিশুদের আদর পবিচর্যায় মেতে উঠতেন। এর ফল আশানুরূপই হত এবং তাঁর পাঠশালার ছাত্ররা লেখাপডায় মোটামুটি পারদর্শী হয়ে উঠত। আমার বিশ্বাস, এর পরে হেয়ারের সুপারিশে আমাদের বেসরকারী পাঠশালাগুলিতে একই ধরনের ছাপা বই চালু করা হয়েছিল। তাঁব এবং সবকারেব পক্ষ থেকে যেসব পণ্ডিতদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তাঁরা মাঝে মাঝে এই পাঠশালাগুলি পরিদর্শন করতে যেতেন। শিক্ষাদানের উন্নততর পদ্ধতিতে উৎসাহ দান করার জন্য গুরুমহাশয়দের পুরস্কাব দেওয়া হতো।'

অ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হবার কথা আমরা (পূর্বেই) উল্লেখ করেছি। এটি পরে হেয়ারের বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ডিরোজিওর পদত্যাগের পরে হেয়ার সভাপতি নির্বাচিত হন। সপ্তাহে একদিন করে সভা বসত এবং তা কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হত। সভাভঙ্গের পব চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে কয়েকজন সদস্যের

সঙ্গে পায়চারি করতে করতে হেয়ার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী এবং অপর কয়েকজনের ব্যবস্থাপনায় ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ সংস্কৃত কলেজে হিন্দু ভদ্রলোকেদের একটি সভা বসল। পারস্পরিক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিশন অফ্ জেনারেল নলেজ' প্রতিষ্ঠিত হল। ঠিক হল যে মাসে একটি করে সভা বসবে এবং তাতে লিখিত বা মৌখিক আলোচনা চলবে। আলোচনা যাঁরা করবেন আলোচনার বিষয় তাঁরা আগেই স্থির করে নেবেন। তবে সবরকমের ধর্মীয় আলোচনা একেবারেই বাদ দেওয়া হবে।

ডেভিড হেয়ার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে সম্মানিত পরিদর্শক নির্বাচন করা হল। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাতে যেমন, এই সোসাইটির সভাগুলিতেও তেমনি হেয়ার নিয়মিতভাবে হাজির থাকতেন।

১৮৪০ থেকে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সভাগুলিতে যে যে বিষয় সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে কতকগুলি বেছে নিয়ে সোসাইটি তিন খণ্ডের সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেছিল। নীচের তালিকাটিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ-গুলির নাম পাওয়া যাবে

১। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : ইতিহাস-চর্চার প্রকৃতি এবং গুরুত্ব প্রসঙ্গে

২। বাবু উদয়চরণ আঢ্য : মাতৃভাষা অনুশীলনের গুরুত্ব

৩। বাবু রাজনারায়ণ দেব : কবিতা-প্রসঙ্গে

৪। বাবু হরচন্দ্র ঘোষ : বাঁকুড়ার ভৌগোলিক এবং পরিসাংখ্যিক বিবরণ

৫। বাবু গৌরমোহন দাস : জ্ঞান-প্রসঙ্গে

৬। বাবু মহেশচন্দ্র দেব : হিন্দু স্ত্রীজাতির অবস্থা

৭। বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন : হিন্দুস্থানের ইতিহাসের রূপরেখা (চারটি সংখ্যা)

৮। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসাক : চট্টগ্রামের বর্ণনামূলক বিবরণ (চারটি সংখ্যা)

৯। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র : হিন্দুদের অধীনে হিন্দুস্থানের অবস্থা (পাঁচটি সংখ্যা)

১০। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : এদেশীয় শিক্ষিতসমাজের মধ্যে সাধারণ এবং সামাজিক সংস্কার

১১। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র বসাক : বানান শিক্ষার একটি নূতন বইয়ের পরিকল্পনা

১২। ঐ : ত্রিপুরার বর্ণনামূলক বিবরণ

১৩। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র : এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে রেভারেণ্ড কে-এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনান্তর্ভুক্ত : 'স্ত্রীজাতির স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হিন্দু ধর্মের বিধানগুলিব একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা'—এই বিষয়-প্রসঙ্গে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্য।

১৪। বাবু প্রসন্ন কুমার মিত্র : শব-ব্যবচ্ছেদের শারীরবৃত্তীয় দিক।

মাতৃভাষাশ্রয়ী শিক্ষা যে কিছু অগ্রগতি লাভ করেছে, তা লক্ষ ক'রে হিন্দুকলেজের পরিচালক-সমিতি কলেজের কাছাকাছি একটি পাঠশালা স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। ১৮৩৯-৪-এর শেষের দিকে এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন

ডেভিড হেয়ার। (এই উপলক্ষে আয়োজিত) অনুষ্ঠানটির উদ্বোধনও তাঁকে করতে হল; তাঁর ভাষণের পর কমিটি অফ পাবলিক ইন্স্ট্রাক্‌শন্‌স্‌-এর তৎকালীন সভাপতি সার ই, রিয়ান উচ্ছ্বসিত ভাষায় সাধুবাদ জানালেন তাঁকে। হেয়ার এবং রাজা রাধাকান্ত যখন এদেশীয় বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধনের জন্য পরিশ্রম করতে স্বরু করেন, তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত। এই পাঠশালাটিতে ব্যাকরণ, ভূগোল, জ্যামিতি, নীতিশাস্ত্র এবং অন্যান্য বিষয় শেখাবার ব্যবস্থা হল। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সাগ্রহে পাঠশালাটির তত্ত্বাবধান করতেন। হেয়ারের মৃত্যুর পর পাঠশালাটির আর বিশেষ যত্ন নেওয়া হত না। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' লিখেছিল:

এই পাঠশালার বারান্দায় প্রতিদিন পায়চারি করতেন ডেভিড হেয়ার। মহানুভবতায় তাঁর দু'টি চোখ দীপ্ত হয়ে উঠত, পাঠশালার খুঁটিনাটি জানবার জন্য তাঁকে আগ্রহী দেখা যেত, কি কর্মপন্থা এবং কি কর্মসূচী গ্রহণ করলে পাঠশালার প্রতিটি বিভাগে দৃঢ় শক্তি জোগান যাবে তা নিয়ে গভীরভাবে তিনি চিন্তা করতেন, এর ফলে তাঁর স্নিগ্ধ পবিত্র মুখে এক তন্ময়তার ভাব প্রকাশ পেত। কে ভাবতে পেরেছিল সেই পাঠশালাটি এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে? পাঠশালাটির সাফল্য সম্পর্কে হেয়ার নিশ্চয়ই স্থির-বিশ্বাস ছিলেন; (যদি তিনি জীবিত থাকতেন) তাহলে আপন নীরব কর্মসাধনা এবং বিনম্র মানবহিতৈষণা দিয়ে এর সাফল্যের সৌধ গড়ে তুলতে তিনি সাহায্য করতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে মাতৃভাষা বিষয়ক জ্ঞানের ক্রমিক প্রসার সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস এত দৃঢ় ছিল যে তিনি তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিলেন, আরো দশ বছর যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহলে এদেশীয় মহিলাদের শিক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

এদেশকে সেবা করবার জন্য ডেভিড হেয়ার সর্বদাই আগ্রহী ছিলেন। যদিও শিক্ষা-সংস্কারক হিসাবেই তিনি অবিরত পরিশ্রম করতেন তবুও বাংলাদেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের কোন সুযোগই তিনি অবহেলা করতেন না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুআরি টাউনহলে কলকাতার অধিবাসীদের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে প্রেসনিয়ন্ত্রণ-সম্পর্কিত আইনটি রহিত করার উপায়-নির্ধারণ এবং জনসভাগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করার জন্য সপরিষদ গভর্নর জেনারেল অথবা আইনসভার কাছে আবেদন জানানো। তাছাড়া কোম্পানির সনদ পুনর্বহাল রাখার জন্য বিধিবদ্ধ বিগত আইনটি সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আবেদনলিপি পাঠানোর বিষয় আলোচনা করাও ছিল এই সভার অন্যতম কর্মসূচী। ক্যালকাটা মান্থলি জার্নালের প্রথম সংখ্যায় এই সভার কার্য-বিবরণী পাওয়া যাবে। এই সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন মেসার্স টি. টার্টন; ই. এম. গর্ডন, সি. এস. টি. ডিকেন্স; দ্বারকানাথ ঠাকুর; রসিককৃষ্ণ মল্লিক; লংভিল ক্লার্ক; বার্কিন ইয়ং এবং ডেভিড হেয়ার। 'সভাতে যে যে আবেদনপত্রগুলি পাঠানো স্থির হয়েছে সেগুলি শহরের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শেরিফ স্বাক্ষর করবেন,' এ প্রস্তাব আনতে গিয়ে ডেভিড হেয়ার বললেন :

'ভদ্রমহোদয়গণ, আমার চারিদিকে তাকিয়ে আজ আমি যখন দেখছি যে এত অধিক সংখ্যক এদেশীয় ভদ্রলোক নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইওরোপীয়দের সঙ্গে একযোগে এগিয়ে এসেছেন, তখন আমি বোধহয় বলতে পারি, আজকের দিন ভারতবর্ষের পক্ষে এক বিশেষ গর্বের দিন (হর্ষধ্বনি)। এ শহরে অনেক সভাই আমি দেখেছি কিন্তু এরকম শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিদের এত অধিক সংখ্যায় কোন সভায় উপস্থিত হ'তে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইংলণ্ডেও অনেকগুলি জনসভায় উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাতে মনে হয় যে আবেদনপত্রে সকলের হয়ে শেরিফের স্বাক্ষর দেওয়াই রীতি।'

এই সভার লক্ষ্যগুলিকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে যে-কমিটি গঠিত হয়েছিল ডেভিড হেয়ার ছিলেন তার অন্যতম সদস্য।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই টাউনহলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কি উপায় অবলম্বন করলে সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানি মামলাগুলিতে জুরির সাহায্যে বিচার প্রবর্তন করা যায়, তা স্থির করা ছিল এই সভার উদ্দেশ্য। তাছাড়া সমস্ত দেশের মধ্যেই জুরি-প্রথার প্রবর্তন ও তার বিস্তার সাধনের চেষ্টা করাও ছিল এ সভার অন্যতম লক্ষ্য। উপযুক্ত আইনের খসড়া তৈয়ারি করা কিংবা যাতে সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদনপত্রের সঙ্গে কিছু গঠনমূলক প্রস্তাব পাঠানো যায়, সেজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। প্রস্তাবিত লক্ষ্যে পৌছানর জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা যদি মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, তাহলে সে সম্পর্কে ব্যবস্থাগ্রহণও

এই কমিটি গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ডেভিড হেয়ারকে এই কমিটির অন্যতম সদস্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। আইনসভার একাদশ অ্যাক্টের বলে আইনের একটি ধারা (107th Sec. of 53rd of George III chapter 153) রহিত করে দেওয়া হয়েছিল এবং তার ফলে ব্রিটিশ প্রজারা প্রাদেশিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইংরেজী বিচারালয়ে আপীল করার অধিকার হারিয়ে ফেলেছিল। পার্লামেণ্টের কাছে এই একাদশ আইনটির বিরুদ্ধে আবেদনপত্র পাঠানোর উদ্দেশ্য নিয়ে এই সভাটি আহূত হয়েছিল। সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন টি টার্টন, দ্বারকানাথ ঠাকুর; জে এইচ. স্টোকুইলার; টি ডিকেন্স; ওআইবোর্ন; ডব্লু পি. গ্রাণ্ট; এল. ক্লার্ক; এস. স্মিথ এবং অন্যান্য অনেকে। হেয়ার নীচের প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন:

'যাতে আবেদনপত্রটি ঠিকভাবে পাঠানো যায় এবং যাতে নিজেদের সাধারণ সুযোগসুবিধার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করান যায়, সেইজন্য আবেদনকারী এবং কলকাতার অধিবাসীদের উচিত একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাঁর ওপর দায়িত্বভার ন্যস্ত রাখা। এই প্রতিনিধির কি কি ক্ষমতা থাকবে এবং কি কি উপায়ে তিনি কাজ করবেন তা স্থির করবার ভার এখন যে-কমিটি গঠিত হল তাকে দেওয়া হোক।'

১৮৩৫ সালে শুরু হয়েছিল মরিশাস এবং বুর্বঁতে ভারতীয় শ্রমিকদের দেশান্তরীকরণের পালা। দেখা গেল, যে-সমস্ত লোক দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারা সকলেই স্বেচ্ছায় যাচ্ছে

না—অনেককেই ভুলিয়ে ভালিয়ে কিংবা জোর করে পাঠানো হচ্ছে। (একসময়) প্রায় একশ কিংবা আরো বেশি সংখ্যক কুলিকে 'কলকাতার একটি বাড়িতে আটক করে রাখা হয়েছিল।' আমাদের মনে আছে, পটলডাঙার এমন একটি বাড়িতে তাদের আটক করে রাখা হয়েছিল যেখানে হেয়ার প্রায় রোজই যেতেন। কুলিদের এরকমভাবে আটক থাকতে দেখে তিনি মিঃ এল. ক্লার্কের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মিঃ ক্লার্ক হেয়ারের সঙ্গে পটলডাঙায় গেলেন এবং দুজনে মিলে চেষ্টা করে যে-সমস্ত কুলিকে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটক রাখা হয়েছিল তাদের মুক্তি দিলেন। একবার যদি কোন অশুভ বিষয়ের দিকে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা যায়, তাহলে সমর্থকের দল চারদিক থেকেই জুটে যায়। এই বিষয়টি নিয়েও আরো ব্যাপক অনুসন্ধান চালান হল এবং তার ফলে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই টাউনহলের একটি জনসভায় এর বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ জানানো হল। সভায় বক্তা ছিলেন বিশপ উইলসন, ডঃ চার্লস, রেভারেণ্ড টি. বোয়াজ; মিঃ টি. ডিকেন্স; মিঃ এল ক্লার্ক; দ্বারকানাথ ঠাকুর; ডঃ ডানকান স্টুয়ার্ট এবং আরো অনেকে। সভায় ঠিক হল যে সপরিষদ প্রেসিডেণ্টের কাছে একটি আবেদন পাঠানো হবে। এই আবেদনপত্র পাঠানোর ফলেই ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সরকার থেকে একটি কমিটি নিয়োগ করা হল। মরিশাস এবং দিমেরারার উপনিবেশগুলিতে কুলি চালান দেওয়ার ব্যাপারে যে-সমস্ত অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া হত বলে অভিযোগ করা হয়েছিল, সেগুলি সম্পর্কে তদন্ত করাই ছিল এই কমিটির কাজ। এই কমিটির কাছে যেসব সাক্ষী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন

হেয়ার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কমিটির অধিকাংশ সদস্য মিলে নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন :

'আমাদের মনে হয় সন্দেহাতীতভাবে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে মরিশাস এবং অন্যান্য জায়গায় যেসমস্ত এ-দেশীয় লোকেদের চালান দেওয়া হয়, সাধারণত দেশীয় দালালরাই নানারকমভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে প্রতারণা করে তাদের কলকাতায় নিয়ে আসে। এই সমস্ত দালালদের বলা হয় দফাদার ও আড়কাঠি। ইওরোপীয় এবং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ঠিকাদার কিংবা জাহাজ ব্যবসায়ীরা এদের নিযুক্ত করে। এরা এই সব প্রতারণার কথা বেশ ভালভাবেই জানে এবং প্রত্যেকটি কুলি চালান দেওয়ার জন্য বেশ মোটা রকমের টাকা পায়।'

তারপর থেকেই কুলি চালান দেওয়ার ব্যাপারে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। মরিশাস এবং অন্যান্য উপনিবেশের শিল্পাঞ্চলগুলিতে বসবাস লাভজনক দেখে শ্রমজীবীরা এখন স্বেচ্ছায়ই সাগর পাড়ি দিচ্ছে। বর্তমানে মরিশাসে বসতি স্থাপন করেছে এমন শ্রমিকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়।

ইংরেজী ভাষাচর্চার প্রসার করা এবং সেই ভাষাশ্রয়ী বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য হেয়ার খুব সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একটি আবেদনপত্র রচনা করে সেটিকে সপারিষদ গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাতে আবেদন করা হয়েছিল, বাংলাদেশের বিচারালয়গুলিতে সওয়াল এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের কাজে মফঃস্বলের বিচারকেরা ফারসী এবং বাংলাভাষার সঙ্গে যেন ইংরেজী ভাষা বিকল্প হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি পান।

হিন্দুকলেজের পরিচালকেরা যে-উত্তর পেয়েছিলেন তা নিম্নরূপ :

হিন্দু কলেজের পরিচালকবৃন্দ সমীপেষু,

ভদ্রমহোদয়গণ,

হিন্দু কলেজের পরিচালকেরা, ছাত্রেরা, তাদের পিতামাতা, অভিভাবক এবং আত্মীয়স্বজন-সকলে মিলে যে-আবেদনটি পাঠিয়েছেন সপরিষদ গভর্নর-জেনারেল সে সম্পর্কে চিন্তা করে দেখেছেন। এই আবেদনপত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের বিচারালয়গুলিতে সওয়াল এবং অন্যান্য কার্য পরিচালনার ব্যাপারে ফারসী এবং বাংলাভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হোক; বলা হয়েছে যে সবত্র না হলেও রাজধানীর কতকগুলি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আইন বিধিবদ্ধ করা হোক; তাহলে ইংবেজী ভাষাব চচাতে উৎসাহ জোগান হবে। সপরিষদ মহামান্য গভনর-জেনারেল বর্তমানে আবেদনকারীদের একথা জানাতে পেরে আনন্দিত যে তাঁদের আবেদনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই ভারতের আইনসভার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আপনারা যা যা চেয়েছেন সেই সেই চাহিদাগুলি মেটাবার জন্য একটা আইন বিধিবদ্ধ করা আইনসভার বিবেচনাধীন রয়েছে। যেখানে যেখানে ইংরাজী ভাষার ব্যবহার জনসাধারণের পক্ষে সুবিধাজনক এবং তাদের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে হবে, সেইদিকে দৃষ্টি রেখে বিচারালয়সমূহের এবং সরকারী অফিসগুলিব কার্যনির্বাহে ইংরেজী ভাষার অনু-

প্রবেশ ঘটানোর জন্যও এই আইন বিধিবদ্ধ করার চিন্তা চলছে।

নিবেদনান্তে,

কাউন্সিল চেম্বার, সরকার বাহাদুরের সচিব,
১০ই ফেব্রুআরি, ১৮৩৫ এইচ. টী. প্রিন্সেপ

ইংলণ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করবার উদ্দেশ্যে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি সভা আহূত হল। হেয়ার এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। রাজা কালীকৃষ্ণ ইংলণ্ডের সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করার অনুকূলে একটি প্রস্তাব আনলেন এবং হেয়ার সেই প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

হেয়ার ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে 'এগ্রিকালচারাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া'র সভ্য ছিলেন। এই সোসাইটির মাসিক সভাগুলিতে তিনি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। এশিয়াটিক সোসাইটিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিতে তিনি নিয়মিত সাহায্যদান করতেন।

১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে হেয়ার কলেরায় আক্রান্ত হলেন। এতে কিন্তু তিনি এতটুকু বিচলিত হননি। বরং তাঁর সদার বেয়ারাকে ডেকে তিনি বললেন, 'যাও, মিঃ গ্রে-কে গিয়ে বল আমার জন্য একটা কফিন তৈরি করতে।' সর্দার বেয়ারা অবশ্য এখবর মিঃ গ্রে-র কাছে পৌঁছে দেয়নি। চিকিৎসা করেও তাঁকে বাঁচান গেল না। পরের দিনই তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন। মৃত্যুর পূর্বে সাব-অ্যাসিস্টেণ্ট সার্জন প্রসন্ন

মিত্রকে আর সরিষার প্রলেপ লাগাতে নিষেধ করেছিলেন—তিনি চেয়েছিলেন শান্তিতে জীবনত্যাগ করতে। হেয়ারের মৃত্যুসংবাদ প্রত্যেকেরই হৃদয়কে গভীর ব্যথায় অভিভূত করে তুলল। যাঁরা তাঁকে জানতো সকলেই শোকাশ্রু বিসর্জন করল। মিঃ গ্রে-র বাড়িতে হেয়ার থাকতেন—সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সেই বাড়ি হিন্দু ভদ্রলোকেদের ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল। এদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাধাকান্ত, বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, বাবু রসময় দত্ত এবং আরো অনেকে। বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর হেয়ারের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার ব্যবস্থাদি করে রেখেছিলেন। রেভারেণ্ড ডঃ চার্লস আসার সঙ্গে সঙ্গেই শবযাত্রা শুরু হল। শোকযাত্রায় কতকগুলি গাড়িও অনুগমন করেছিল—সবকটিই ছিল শিশুতে ভর্তি। শবযানের পিছনে প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু ছিলেন, প্রত্যেকেরই হৃদয় গভীর শোকে অভিভূত। কেউ ফোঁপাচ্ছিলেন, কেউ বা কাঁদছিলেন। দিনটি ছিল বর্ষণসিক্ত, তা সত্ত্বেও যা জনসমাবেশ হয়েছিল এই শহরে তা আর কখনও হয়েছে বলে জানা নেই।

প্রত্যেকের কাছ থেকে এক টাকা করে চাঁদা নিয়ে হেয়ারের সমাধিস্তম্ভ নির্মিত হল। খুব অল্পসময়েই প্রয়োজনীয় চাঁদা আদায় হয়ে গিয়েছিল। এর পরেও অনেকে চাঁদা দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তা নেওয়া হয়নি।

সমাধিস্তম্ভটিতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ ছিল :

'এই সমাধিসৌধ

ডেভিড হেয়ারের এদেশীয় বন্ধুবর্গ এবং ছাত্রদের দ্বারা

তাঁর নশ্বর দেহাবশেষের উপর নির্মিত।

তিনি স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এই শহরে এসেছিলেন ১৮০০খ্রীষ্টাব্দে; ৬৭ বছর বয়সে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘড়ি প্রস্তুত-কারক হিসাবে তিনি তাঁর সততা এবং নিষ্ঠার দ্বারা বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রবাসভূমিকেই তিনি আপন দেশ বলে বরণ করে নিয়েছিলেন; তাঁর অবশিষ্ট জীবনকে অক্লান্ত কর্মোদ্যোগ এবং সদাশয়তার সাথে তিনি সানন্দে নিয়োগ করেছিলেন একটি ব্যাপক এবং প্রিয় লক্ষ্যসাধনের জন্য। সেই লক্ষ্য হল বাংলাদেশের অধিবাসীদের শিক্ষাব্যবস্থার এবং নৈতিক জীবনের উন্নতি। এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মন অধিকার করেছিল, এই-ই ছিল তাঁর একমাত্র প্রিয় বিষয়। এর জন্য তিনি ব্যক্তিগত সুখসুবিধা, টাকাকড়ি, প্রভাব প্রতিপত্তি—কোন কিছুর কথাই চিন্তা করেননি। বাংলাদেশের সহস্র সহস্র লোকের কাছে তিনি ছিলেন সবচেয়ে স্বার্থবিরহিত পরম সুহৃৎ; এমনকি আপন পিতার মতো। তাঁর জীবদ্দশায় সন্তানোচিত ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা দিয়ে তারা তাঁকে বরণ করেছিল, তাঁর মৃত্যুতে তারা তাঁর জন্য শোকপ্রকাশ করছে।'

বেঙ্গল স্পেক্টেটরে হেয়ারের মৃত্যু-সম্পর্কিত সংবাদ :

গভীরতম বেদনার সঙ্গে আমরা এই মানবহিতৈষী এবং হিন্দুদের কল্যাণসাধকের মৃত্যু-সংবাদ জানাচ্ছি। গত মাসের ৩১ তারিখে রাত্রি ১টার সময় তিনি কলেরায় আক্রান্ত হন এবং পয়লা প্রায় সকাল ৬টায় ৬৭ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ এত আকস্মিক ছিল যে তাঁর অনেক এদেশীয় বন্ধু সত্যিসত্যিই বজ্রাহতের মতো হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর বিয়োগযন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে দলে দলে সমবেত হয়েছিলেন তাঁর শবদেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। শবাধারটি

কলেজ স্কোয়ারে ডেভিড হেয়ারের সমাধিস্তম্ভ
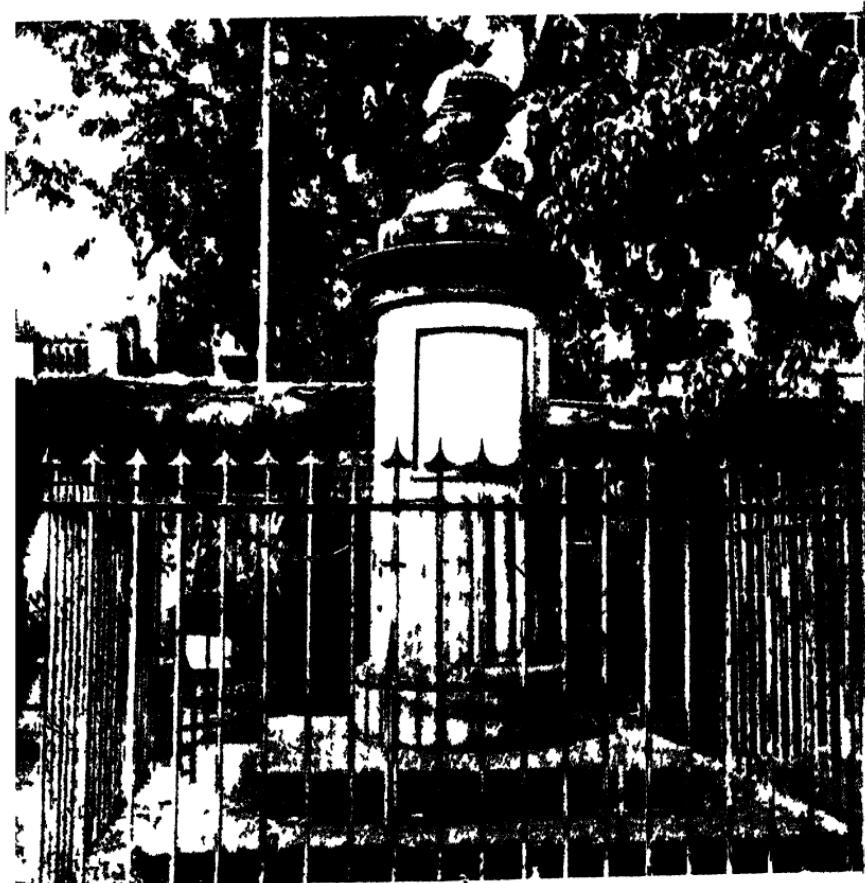
যতক্ষণ মিঃ গ্রে-র বাড়িতে ছিল ততক্ষণ বলতে গেলে হিন্দুরাই সেটিকে ঘিরে রেখেছিল। তাদের অধিকাংশেরই মুখে পড়ে ছিল দুঃখ ও মানসিক অশান্তির গভীর কালো ছায়া, তাদের কেউ কেউ শবদেহটি পরীক্ষা করে দেখছিল, কেউ কেউ তাঁর অতুলনীয় মহানুভবতার কথা আলোচনা করছিল; কেউ কেউ আবার এই বিষাদময় ঘটনাটির জন্য আপন অকৃত্রিম বেদনা প্রকাশ করছিল। তাদের কল্যাণকামী হেয়ারের একটি ছাঁচ নেবার জন্য কয়েকজন আগ্রহী হয়ে উঠল এবং এই উদ্দেশ্যে মিঃ মোদির কাছে গিয়ে তাঁকে ধরে নিয়ে এল। কিন্তু পরলোকগত হেয়ারের মুখ পরীক্ষা করে মিঃ মোদি বললেন যে, তখন আর ভালোভাবে ছাঁচ নেওয়া সম্ভব নয়। বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ শবানুগমনকারীদের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেল, হিন্দু কলেজের চত্বর পর্যন্ত প্রত্যেকে শবযানটিকে অনুসরণ করল। আবহাওয়া (সেদিন) বেশ খারাপ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় পাঁচ হাজার এদেশীয় ব্যক্তি সেখানে তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করবার জন্য সমবেত হয়েছিল।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ঘড়ি প্রস্তুতকারক হিসাবে হেয়ার এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন; কয়েক বৎসর ধরে এই ব্যবসা পরিচালনার পর তিনি নিজের প্রতিষ্ঠানটি মিঃ গ্রে-র কাছে হস্তান্তর করেন। যে-দক্ষতা তিনি (এখানে) অর্জন করেছিলেন, তা নিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে গেলেন না; তার পরিবর্তে দেশীয় শিক্ষার উন্নতিবিধানের জন্য আপন বিত্ত এবং সময় উৎসর্গ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'স্কুল সোসাইটি' স্থাপনে সহায়তা করলেন এবং সেযুগের পক্ষে যতখানি সম্ভব এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন যাতে বাংলাভাষার উপযুক্ত চর্চা হয়। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত পাঠশালাগুলি তিনি পরিদর্শন শুরু করলেন, ছাত্র ও শিক্ষকদের যাতে আপন আপন ক্ষেত্রে প্রেরণা অব্যাহত থাকে, তাই তাদের উৎসাহ দেবার জন্য তিনি পুস্তক ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। বেশ কিছু হিন্দু ছেলেকে নিজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রেখে সুনির্দিষ্ট পথে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি পটলডাঙায়

একটি পাঠশালা স্থাপনও করেছিলেন ; আমাদের বিশ্বাস এর ফল মঙ্গলজনকই হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারেও তাঁর সমান উৎসাহ ছিল। এদেশীয় ভাষাগুলিতে চিত্তপ্রসারের উপযোগী বইয়ের অভাব দেখে, ব্যবসা থেকে অবসর-গ্রহণের পর থেকেই শহরের বিত্তশালী এবং সম্ভ্রান্ত এ দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে পরিচয়স্থাপনে তিনি আগ্রহী হয়েছিলেন এবং দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতীচ্যের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত করার জন্য তাঁদের উৎসাহিত করেছিলেন। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুকলেজ স্থাপনে তাদের সাহায্য লাভ করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির কল্যাণবিধানে তাঁর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে সজীব ; যে মূল্যবান কাজ এই কলেজের জন্য তিনি করেছিলেন তা এর ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলির অন্যতম হয়ে থাকবে। কলেজের পরিচালক হিসাবে তিনি মাঝে মাঝে কলেজ পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না, প্রায় প্রতিদিনই কলেজে এসে তাঁর অনেকখানি সময় তিনি এখানে ব্যয় করতেন। প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিতেন, তার পড়াশুনার উন্নতি কেমন হচ্ছে, সে নিয়মিত হাজিরা দেয় কি না, তার স্বাস্থ্য কিংবা কলেজে ও বাড়িতে তার আচার-ব্যবহার কেমন ইত্যাদি ; অমনোযোগী বা অভদ্র ছাত্রদের তিনি পিতৃসুলভ স্নেহে ভৎর্সনা করতেন, আবার মেধাবী ও বিশিষ্ট ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও পুরস্কার পেত। একছাত্রের সঙ্গে আরেক ছাত্রের বিবাদ-বিরোধের তিনি মীমাংসা করে দিতেন, পিতামাতা বা অভিভাবকদের অনুরোধ সুপারিশও তিনি ধৈর্যের সঙ্গে শুনতেন। কলেজ পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত খুঁটিনাটি তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখতেন ; যেখানেই ত্রুটি বিচ্যুতি অপসারিত করে তার পরিবর্তে উন্নততর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হত, সেখানেই তিনি তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়টির উন্নতিবিধানের জন্যও তিনি অক্লান্ত

পরিশ্রম করেছিলেন। এই বিত্থালয়টি থেকেই অনেক কৃতী ছাত্র হিন্দু কলেজে পড়তে যেত। আর্থিক সাহায্যের কথা যদি ধরা হয়, তাহলে বোধহয় বিত্থালয়টি সোসাইটির তহবিলের চাইতে তাঁর উদারতার কাছেই বেশী ঋণী। পববর্তীকালে কোর্ট অফ্ রিকোয়েস্ট এ নিযুক্ত হওয়ার জন্ম তিনি যখন বিদ্যালয়টিতে দিনের বেলা উপস্থিত হতে পারতেন না তখন তাঁর সন্ধ্যাগুলি তিনি সেখানে অতিবাহিত করতেন, এবং বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তন্ন তন্ন করে খোঁজ নিতেন। মেডিক্যাল কলেজেব সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে এদেশীয় লোকেদের অস্ত্রোপচাব বিরোধী মনোভাব শান্ত করাব সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন, এর জন্য তিনি বৃদ্ধ হিন্দু ভদ্রলোকেদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা যে এত সহজে তাঁদের সন্তানদের মেডিক্যাল কলেজে পড়বার অনুমতি দিযেছিলেন, তা এছাড়া এত সহজে সম্ভব হত না। যে শ্রদ্ধা এবং সম্মান তিনি পেযেছিলেন, এবং তাঁর মৃত্যুতে মেডিক্যাল কলেজেব অধ্যাপক এবং ছাত্রেরা যে গভীর শোক প্রকাশ কবেছে তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায যে তাঁর কাজকে কতখানি মূল্য দেওযা হয়। এদেশীযদের মানসিক উৎকর্ষ বিধানেব জন্ম যতগুলি শিক্ষাযতন প্রতিষ্ঠিত হযেছিল তাব সবকটিতেই হেযাব উৎসাহী ছিলেন, তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব সেগুলিকে সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন তিনি।

কিন্তু তিনি শুধু দেশীয শিক্ষার স্রষ্টা ও উন্নতিবিধাযক ছিলেন বলেই আমরা তাঁর স্মৃতির কাছে ঋণী নই। অসুস্থকে সুস্থ করে তুলতে, ভাগ্যহীনকে সান্ত্বনা দিতে, অজ্ঞজনকে উপদেশ দিতে, সহায়হীনকে রক্ষা করতে এবং অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করতে তাঁর যে ব্যাকুলতা এবং আগ্রহ ছিল তা এই শহরেব আবালবৃদ্ধ বনিতার কাছে তাঁর নামকে প্রিয় করে তুলেছে। আমরা আর কোন ব্যক্তির কথা জানি না যিনি একটি বিদেশী জাতির জন্য এরকমভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, এবং নিজেব সময় ও অর্থ উৎসর্গ করে আমাদের আলোচ্য বিষযটির মতো

মহানুভব প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনকেই জীবনের সকল আনন্দের কেন্দ্র-বিন্দু বলে ভেবেছেন। তাঁর যে-মহৎ গুণগুলি সম্পর্কে আমরা আভাস মাত্র দিয়েছি সেগুলি ছাড়াও তাঁর একটি গণচেতনা ছিল যা সকলের প্রশংসার দাবি রাখে। এই শহরে অনুষ্ঠিত অনেকগুলি সৎ কাজেই তাঁর ভূমিকা ছিল মুখ্য। দেওয়ানী মকদ্দমায় জুরির দ্বারা বিচারের প্রবর্তন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রচলিত সনদের কতকগুলি ত্রুটিপূর্ণ ধারার সংশোধন, বিচারালয়গুলিতে ফারসী ভাষার ব্যবহার রদ—এই ধরনের ব্যাপারগুলিতে তাঁর কর্মোদ্যোগ ও শ্রম সকলের কাছেই সুপরিচিত। কুলি ব্যবসায়ের অন্ধকার দিকগুলি উদ্‌ঘাটিত করে তোলবার জন্য তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল, পটল-ডাঙায় যে একদল ধাঙড়কে অন্যায়ভাবে আটক করে রাখা হয়েছিল তাদের উদ্ধারের কাজেও তাঁর হাত ছিল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অথবা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানোর জন্য যখনই কোন সভা আহ্বান করা হত, তিনি ঠিক তাতে উপস্থিত থাকতেন এবং তাতে অংশ নিতেন। কলকাতার প্রায় সবকটি সোসাইটির সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল এবং তিনি এগুলির উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।

এই হল হেয়ারের জীবন এবং কর্মের পরিচয়। আমাদের কল্যাণের জন্য তিনি আপন জীবন নিয়োজিত রেখেছিলেন, আমাদের উচিত আমাদের শক্তিতে যতখানি সম্ভব তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য এগিয়ে আসা। ঔদাসীন্যের অভিযোগে প্রতিদিনই আমরা কলঙ্কিত হচ্ছি। সেই মহানুভব ব্যক্তির যে-অনুভূতি আমরা হৃদয়ের গভীরে লালন করি তাকে রূপ দেবার সুযোগ যদি আমরা অবিলম্বে গ্রহণ না করি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার উপযুক্ত ব্যবস্থা না নিই তাহলে আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর ধারণা নিঃসন্দেহে নীচু হয়ে যাবে। শহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের তাই আমরা অনুরোধ জানাই এই উদ্দেশ্যে একটি জনসভা

আহ্বানের জন্য , মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারটিই হবে এই কাজের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। আমাদের মতে, প্রস্তাবিত স্মৃতিস্তম্ভের কাছে একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করাই হবে যুক্তিসঙ্গত— কেবলমাত্র দেশীয় সমাজের মধ্য থেকে সংগৃহীত চাঁদায় এই প্রতিমূর্তির ব্যয় নির্বাহ হবে। উপযোগিতার বিচারে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের জন্য আরো কতকগুলি পথ আছে, কিন্তু আমরা যে-প্রস্তাবটি দিয়েছি সেটি কার্যকরী করলে তাঁর স্মৃতি এত সুন্দর-ভাবে প্রকাশ পাবে এবং তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগের অনুভূতি এমন উদ্রিক্ত হবে যা আর কোন কিছুতেই সম্ভব নয়।

ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া :

স্বর্গত মিঃ ডেভিড হেয়ার—গত ৩১শে মে দেশীয় শিক্ষার সুপরিচিত পৃষ্ঠপোষক • মিঃ ডেভিড হেয়ার কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ভারতবর্ষের কোন ব্যক্তিই বোধহয় ডেভিড হেয়ারের মতো উল্লেখ্য জীবন যাপন করেননি। ঘড়ি প্রস্তুতকারক এবং রৌপ্যদ্রব্যের কারিগর হিসাবে প্রায় ৪২ বৎসর আগে তিনি এদেশে এসেছিলেন , উল্লেখযোগ্য দক্ষতা অর্জন করে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যবসা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। স্বদেশবাসীদের মতো দেশে ফিরে না গিয়ে আপন সম্পত্তির মূল্যে কলকাতায় জমি জায়গা কিনে তিনি এদেশেই থেকে গেলেন ঠিক যখন মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংস জনসাধারণের উন্নতিবিধানের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেই সময়ই হেয়ার ব্যবসা থেকে অবসর নেন। এর আগে ধারণা ছিল যে এদেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষার (প্রচলন) ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের স্থায়িত্বের পরিপন্থী। হেষ্টিংস কিন্তু প্রকাশ্যভাবে এদেশবাসীর শিক্ষায় উৎসাহ যোগাচ্ছিলেন। যখনই জানা গেল সরকারের কর্ণধার জ্ঞানবিস্তারের অনুকূলে তখনই কোন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছুটে এলেন সময় ও মনোযোগ ব্যয় করে (উদ্দেশ্যটিকে সফল করার জন্য)। অপর কয়েকজনের মতো হেয়ারও একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করলেন ; শোনা যায়, তিনি আপন খরচেই অনেকদিন এই

বিদ্যালয়টি চালিয়েছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপনে প্রধান ভূমিকা যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন হেয়ার তাঁদের অন্যতম। ধর্মনিরপেক্ষ যে শিক্ষাব্যবস্থা দেশীয়দের জন্য প্রবর্তিত হল, এইভাবে আস্তে আস্তে তিনি তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলেন; শহরের দেশীয় যুবকদের বিশ্বাস এবং তার সঙ্গে শ্রদ্ধাও তিনি যে-পরিমাণে অর্জন করেছিলেন, তা এর আগে কেউই পাননি। দেশীয়দের মধ্যে বর্তমান যুগের যেসব ব্যক্তি সরকারী শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষালাভ করে বড হয়েছেন, তাঁরা তাঁকে পিতার মতো শ্রদ্ধা করতেন; এদেশীয় সমাজে তাঁর যতখানি প্রভাব ছিল, কোন বেসরকারী ব্যক্তির পক্ষেই এর আগে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। কিভাবে একটি ব্যক্তি শিক্ষার শাণিত দীপ্তি ও প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া বা পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের অধিকারী না হয়েও শুধুমাত্র উদীয়মান (তরুণ) সম্প্রদায়ের উন্নতি-বিধানের অব্যাহত প্রচেষ্টায় রত থেকে বছরের পর বছর ধরে দেশীয় সমাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবময় আসনটি অধিকার করে রাখতে পারে, হেয়ার তার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, এবং এক্ষেত্রে ভারতবর্ষে তিনি অনন্য। তিনি যে দেশীয়দের জন্য কল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছিলেন এবং শহরের দেশীয় অধিবাসীদের শিক্ষা যে তাঁর অব্যাহত ও অক্লান্ত প্রয়াসের কাছে অনেকখানি ঋণী একথা সকলেই দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করবেন। তবে, একই সময়ে গভীর দুঃখের সঙ্গে একথাও স্বীকার করতে হবে যে দেশের যুবক-সম্প্রদায় তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল বলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতি তাঁর সুদৃঢ় বিরোধিতা তাদের মনের উপর একটি বেদনাদায়ক প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধর্ম-সম্পর্কিত সত্যের সর্বপ্রকার অনুসন্ধিৎসা থেকে তাদের মন নিবৃত্ত হয়েছিল এবং সাধারণভাবে নাস্তিকতার প্রবণতা তাদের মনে সংক্রমিত হয়েছিল। বর্তমান যুগে শিক্ষিত এদেশবাসী যাঁরা রয়েছেন বহুদিন ধরে তাঁদের আচার-ব্যবহার ও ধ্যানধারণায় এর বিষাদজনক ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যাবে।

চতুর্থ অধ্যায়

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন রাজা কৃষ্ণনাথ রায় মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে একটি জনসভা আহ্বান করলেন। কি ভাবে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতির প্রতি সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা যায়, তা নির্ধারণ করাই ছিল ঐ সভার উদ্দেশ্য। সভাটিতে অগণিত লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। বাবু দিগম্বর মিত্র, ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় সভায় বিস্তারিত ভাষণ দিলেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় স্বর্গত হেয়ারের অমূল্য অবদানের কথা এবং এদেশের অধিবাসীদের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতিতে তাঁর সজীব উৎসাহের কথা বক্তারা তাঁদের বক্তৃতায় উল্লেখ করলেন। কিছু আলোচনার পর স্থির হল যে, এদেশের জনসাধারণের মধ্যে থেকে চাঁদা তুলে তাই দিয়ে হেয়ারের একটি প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে; কমিটির সদস্যেরা ইচ্ছা করলে নিজেদের দলবৃদ্ধি করতে পারবেন :

রাজা কৃষ্ণনাথ রায়

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবু নন্দলাল সিংহ

„ হরচন্দ্র ঘোষ

„ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ

„ বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী

„ রামগোপাল ঘোষ

রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবু তারাচাঁদ চক্রবর্তী

„ দিগম্বর মিত্র

„ রমাপ্রসাদ রায়

এই সভ্যতালিকায় পরে কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম যুক্ত হয়েছিল। কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন হরচন্দ্র ঘোষ। প্রতিমূর্তিটি তৈয়ারি করতে দেওয়া হল। তারপর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে প্রথমে সংস্কৃত কলেজের চতুঃসীমার মধ্যে সেটিকে স্থাপন করা হল। এখন প্রেসিডেন্সী কলেজ এবং হেয়ার বিদ্যালয়ের মাঝখানের খোলা প্রাঙ্গণটিতে সেটিকে দেখা যাবে।

(প্রতিমূর্তিটির পাদপীঠে নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে) :

যিনি নিরলস কর্মোদ্যোগের দ্বারা
প্রভূত ঐশ্বর্য অর্জন করেও
যাকে স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন
তার উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে
সে ঐশ্বর্যের ফল উপভোগ করতে
আপন দেশে ফিরে যাওয়ার বাসনা
সানন্দে ত্যাগ করেছিলেন—

সেই ডেভিড হেয়ারের সম্মানে।

তাঁর অনিন্দনীয় ও সার্থক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত

তিনি বাঙালী সমাজের যুবকদের বুদ্ধিগত ও নৈতিক

উৎকর্ষ-সাধনে প্রয়াসী ছিলেন

এবং তাদের রোগজীর্ণ অবস্থায় যেমন,

স্বাস্থ্যোজ্জ্বল অবস্থাতেও তেমনি

তাদের প্রতি মনোযোগী ছিলেন—

তারাই ছিল তাঁর অক্লান্ত পরিচর্যা

এবং অব্যাহত অনুগ্রহের পাত্র।

তাদের (সেই) সদা-উদার ও সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ উপকারকের

স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অভিজ্ঞান হিসাবে

তারা এই প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভাস্কর—

লিউলিন অ্যাণ্ড কোং,

কলিকাতা।

কমিটি (এই ব্যাপারে) শহরের মেসার্স জি. অ্যাণ্ড সি. গ্রাণ্ট-এর মূল্যবান উপদেশ ও সাহায্যের কাছে অশেষ ঋণী ছিল।

হেয়ারের বিদ্যালয়ে দেওয়ালের গাত্রস্থিত ফলক :

"এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই ফলক ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিতে পবিত্র। তিনি জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তনের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে দমন করে——আপন ঐশ্বর্য, কর্মশক্তি ও জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন ভারতবর্ষের সর্বোত্তম মঙ্গলের জন্য, ভারতবর্ষকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন আপন দেশ বলে। দেশীয় শিক্ষার

জনক বলে তিনি চিরদিন ভারতবর্ষে সমাদরের সঙ্গে স্মৃত হবেন।

ইংলণ্ডে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কলকাতায় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তিনি পরলোক গমন করেন।

হে অকৃত্রিম মানবপ্রেমী, হে বিশ্বস্ত সুহৃৎ,
তোমার জীবন উৎসর্গিত ছিল
একটি মহান লক্ষ্যের প্রতি,
বৃটিশ জাতির জ্ঞানালোকের আশিস্ তুমি চেয়েছিলে
হিন্দু-মনে বর্ষণ করতে,
চেয়েছিলে—সত্য আর প্রকৃতির ম্লান শিখা
আবার পুনরুদ্দীপ্ত করে তুলতে।
সে মহান লক্ষ্যসাধনা যদি এক দিনের জন্যও ব্যাহত হত,
টাইটাসের মতোই ক্ষুব্ধ হতে তুমি—
একটি দিন ব্যর্থ হল।
হায়, তোমার প্রয়াণে
শুধু কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্মানের সম্ভাবনা ভাগ্য থেকে মুছে গেল না,
যে-জাতিকে আপন ভেবে তুমি ভালোবেসেছিলে
সে আজ গভীরতর শোকে আচ্ছন্ন।
হায়, জীবনে জীবন সঞ্চার করেছিল যে-জীবন, সে কোথায়!"

স্মৃতিরক্ষা সমিতি যখন চাঁদা সংগ্রহে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র তাঁর কয়েকজন বন্ধুর কাছে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। তিনি বললেন যে হেয়ারের স্মৃতি যাতে যথাযোগ্যভাবে রক্ষিত হয় সেজন্য তাঁর বন্ধুরা প্রতি বছর ১লা জুন

মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করুন। কিশোরীচাঁদের অনুরোধক্রমে হেয়ারের প্রায় চল্লিশজন বন্ধু কিশোরীচাঁদের নিমতলা স্ট্রীটের বাড়িতে মিলিত হলেন। বাবু রামচন্দ্র মিত্র সভাপতি বৃত হলেন। প্রথম প্রস্তাব আনলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; এই প্রসঙ্গে তিনি এ-দেশীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে ডেভিড হেয়ারের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে যে নিঃস্বার্থপরতা ও মানবহিতৈষণা প্রকাশিত হয়েছিল সে বিষয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। সভায় আর যাঁরা বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন বাবু রামচন্দ্র মিত্র, রামগোপাল ঘোষ এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। সকলেই হেয়ারের উন্নত চরিত্র এবং গুণাবলীর কথা বললেন। হেয়ার যে দেশবাসীর কতখানি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার অধিকারী তাও তাঁরা বর্ণনা করলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হল:

প্রতিবছর ১লা জুন স্বর্গত ডেভিড হেয়ারের মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য তাঁর বন্ধুরা মিলিত হবেন। যে স্বার্থশূন্যতা এবং মানবহিতৈষণা পাঁচশ বছরের অধিককাল ধরে হেয়ারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর সেই গুণগুলি স্মরণীয় করে রাখাই হবে এই সম্মিলনের উদ্দেশ্য। হিন্দু শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য হেয়ার যে অক্লান্ত এবং অতুলনীয় পরিশ্রম করেছিলেন প্রত্যেক ভারতবাসীরই তা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। ভারতবাসীর হৃদয়ের সেই গভীর অনুভূতিকেই প্রকাশ করা হবে এই বাৎসরিক সভাগুলিতে।

বাৎসরিক সভায় ভারতবর্ষের বুদ্ধিবৃত্তির এবং নৈতিক উন্নতি সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে একটি বক্তৃতাদানের কিংবা প্রবন্ধ

পাঠের ব্যবস্থা করা হবে। বক্তা বা প্রবন্ধ-পাঠক কে হবেন তা আগে থেকেই ঠিক থাকবে।

বার্ষিক সভার খুঁটিনাটি দিকগুলি স্থির করবার জন্য নিম্নোক্ত ভদ্রলোকেদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হবে। এঁরা ইচ্ছা করলে নিজেদের দলবৃদ্ধি করতে পারবেন। হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার উপযুক্ত পথ এঁরা নির্ধারণ করবেন। কমিটির সভ্যদের নাম হল: রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়; বাবু রামচন্দ্র মিত্র; বাবু রামগোপাল ঘোষ; বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র এবং বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র (সম্পাদক)।

দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল ফৌজদারী বালাখানায়, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ।

সম্পাদক তাঁর বিবৃতিতে বললেন যে কমিটির কাজ শুধুমাত্র মৃত্যুবার্ষিকীর আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তাঁদের স্বর্গত সহৃদয় বন্ধুর স্মৃতি যাতে চিরন্তন হয়ে বেঁচে থাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করাও তাঁদের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা আগের বছর দুইটি সভার আয়োজন করেছিলেন। প্রথম সভাটিতে ডেভিড হেয়ারের একটি জীবন-কাহিনী লেখবার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। স্মৃতিরক্ষা কমিটি যাতে এই লক্ষ্যসাধনে সফল হতে পারে, সেইজন্য স্থির হয়েছিল যে লণ্ডনের জোশেফ হেয়ারের কাছে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর চেয়ে পাঠানো হবে, যাতে ডেভিড হেয়ারের জীবনের আদিপর্ব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়—তাঁকে অনুরোধ করা হবে, তিনি যেন তাঁর সুবিধামতো প্রশ্নগুলির উত্তর তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কতকগুলি

প্রশ্ন রচনা করা হয়েছিল এবং বাবু রাজারাম রায়ের মাধ্যমে সেগুলি মিঃ জোশেফ হেয়ারের কাছে পাঠানো হয়েছিল ; কিন্তু কমিটি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছে যে তার কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। অবশ্য এরকম হতে পারে যে কন্টিনেণ্টে চলে যাওয়ার দরুন মিঃ জোশেফ হেয়ার সমিতির প্রেরিত বার্তা পাননি। সেইজন্য কমিটি স্থির করেছে যে তাঁর কাছে আবার অনুরোধ জানানো হবে। কমিটি যথাসম্ভব ডেভিড হেয়ারের একটি নির্ভরযোগ্য এবং সম্ভব হলে পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত রচনা করতে উদ্‌গ্রীব। কমিটির ধারণায় তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করে রাখবার এই হল সর্বোৎকৃষ্ট উপায় ; এতে তাঁদের দেশের স্বর্গত সুহৃদের প্রতি কর্তব্যও পালন করা হবে।

সভায় রেভারেণ্ড কে এম. বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ভাষণ দিলেন। তারপর সম্পাদক কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড নামে একটি ফাণ্ড খোলা এবং তার জন্য বাৎসরিক চাঁদাদানের কথা এই প্রস্তাবগুলিতে ছিল। স্মৃতিরক্ষা কমিটি কর্তৃক নিবাচিত এবং বিজ্ঞপিত সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা রচনাগুলিকে পুরস্কার দেওয়াই ছিল এই ফাণ্ড গঠনের উদ্দেশ্য। রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাব অনুযায়ী বিষয়টি বিশদভাবে বিবেচনার জন্য কমিটির কাছে পাঠানো হল ; কমিটিকে অনুরোধ জানানো হল, যদি সম্ভব হয়, তাঁরা যেন প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করে তুলতে প্রয়াসী হন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডের চাঁদাদাতারা টাউনহলে একটি সভায় মিলিত হন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন জনসাধারণের সভায় যে ডেভিড হেয়ার স্মৃতিরক্ষা

কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার বিবরণ তিনি পাঠ করলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন তারিখে কমিটির যে অধিবেশন বসেছিল তাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়েছিল :-

প্রথম—এদেশের শিক্ষার জন্য স্বর্গত ডেভিড হেয়ার মহোদয়ের ক্লান্তিহীন, বিশেষভাবে প্রশংসনীয় ও সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য কার্যাবলীর কথা বিবেচনা করলে তাঁর স্মৃতিকে চিরন্তন করে রাখার সবচেয়ে ভাল পথ হল শিক্ষাবিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এমন কিছুর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত করা, যাতে শিক্ষার উন্নতিরই পথ আরো প্রশস্ত হয়।

দ্বিতীয়—এই উদ্দেশ্যে হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড নামে একটি অর্থভাণ্ডার খোলা হবে। প্রতিশ্রুত চাঁদার পরিমাণ যখন ৪,০০০ টাকার বেশি হবে, তখন চাঁদাদাতাদের সাধারণ সভায় নির্বাচিত একজন কর্মচারী সেগুলি সংগ্রহ করবেন। তারপর সেই অর্থ সরকারী লগ্নিতে খাটানো হবে এবং কেবলমাত্র তার সুদ থেকে বাংলা রচনাগুলিকে পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কোন্ কোন্ বিষয়ে এইসব রচনা লেখা হবে তা কমিটি আগেই স্থির করবেন এবং সেই অনুযায়ী বিজ্ঞাপন দিয়ে রাখবেন।

তৃতীয়—সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ যদি চার হাজার টাকার কম হয়, তাহলে যে-উদ্দেশ্য নিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করা হচ্ছিল, তা পরিত্যক্ত হবে ; কারণ পরিকল্পনাটিকে স্থায়ীভাবে কার্যকরী করতে না পারলে এ সম্পর্কে আর চেষ্টা-চরিত্র করা যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না।

চতুর্থ—প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরই চাঁদাদাতাদের একটি সভা আহ্বান করা হবে। সেই সভায় অর্থভাণ্ডারটি

সম্পর্কে সুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়েকজন কর্মী নিয়োগ এবং কতকগুলি আবশ্যকীয় আইন বিধিবদ্ধ করা হবে। যে-উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে তাকে সফল করে তোলাই হবে চরমতম লক্ষ্য।

এদেশীয় সমাজের লোকেরা যা চাঁদা দিলেন তার মোট পরিমাণ দাঁড়াল কোম্পানির টাকায় ১৮০০, অর্থাৎ পরিকল্পিত তহবিলের অর্ধেকও নয়। তখন কমিটি এদেশের ইওরোপীয় অধিবাসীদের দিকেও চাঁদার খাতা বাড়িয়ে ধরা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন; এঁদের মধ্যে এদেশীয় শিক্ষার যে কয়জন মুষ্টিমেয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁদের অকুণ্ঠ সাহায্যের ফলে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ আরও ৭০০ টাকা বাড়ল। যদিও এই দুই দিক দিয়ে সংগৃহীত অথের যোগফল পরিকল্পিত পরিমাণের চেয়ে কম হল, তবু পুনরালোচনাব পর কমিটি তাঁদের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাব বিরোধী ছিলেন; সেইজন্য তাঁরা নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করলেন:

প্রথম—প্রদেয় চাদার অর্থ সংগ্রহ করে সরকারী লগ্নিতে নিযুক্ত রাখা হবে এবং সেখান থেকে প্রাপ্য সুদে কেবলমাত্র একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হবে।

দ্বিতীয়—যাতে আরো চাঁদা সংগৃহীত হতে পারে, সেজন্য অর্থভাণ্ডারটি উন্মুক্তই রাখা হবে। মোট অর্থের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা বা তার বেশি হলে, পুরস্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে।

তৃতীয়—অর্থভাণ্ডারটির রক্ষক হবেন ব্যাঙ্ক অফ্ বেঙ্গল।

চতুর্থ—নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের নিয়োগ করা হবে: [ক] তিনজন ট্রাস্টি, এঁদের একজন হবেন অর্থসংগ্রাহক

[collector], [খ] বিচার্য রচনাগুলির গুণাগুণ নির্ণয় করার জন্য তিনজন বিচারক।

নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল :

[ক] সদ্যপঠিত রিপোর্টটি গৃহীত হবে।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র এবং এটিকে সমর্থন করেছিলেন বাবু রামচন্দ্র মিত্র।

[খ] নিম্নোক্ত ভদ্রমহোদয়গণকে ট্রাস্টি নিযুক্ত করা হবে :

বাবু রামগোপাল ঘোষ, হরিমোহন সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুরোধ জানান হবে অর্থসংগ্রহের ভার গ্রহণ করার জন্য।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন বাবু শ্যামাচরণ সেন এবং সমর্থন করেছিলেন বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়।

(গ) কোন্ কোন্ বিষয়ে লিখিত রচনাকে পুরস্কৃত করা হবে তা নির্বাচনের ক্ষমতা থাকবে কমিটির। এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগীরা যে-সমস্ত রচনা পাঠাবেন, তাদের গুণাগুণ স্থির করবার জন্য তিনজন বিচারকও নিয়োগ করবেন এই কমিটি। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন বাবু রামগোপাল ঘোষ; বাবু রামচন্দ্র মিত্র এটি সমর্থন করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ফৌজদারী বালাখানা হলে হেয়ারের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ। সভাপতি মহাশয় বললেন, হেয়ারের মৃত্যুবার্ষিকী সভা আহ্বানের জন্য প্রচারিত একটি ইস্তাহার তাঁর হাতে রয়েছে। এই সভার উৎপত্তি হয়েছে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুনে গৃহীত একটি প্রস্তাব থেকে। স্বর্গত ডেভিড হেয়ার তাঁর অক্লান্ত,

অতুলনীয় কর্মোদ্যোগ এদেশীয় শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত রেখেছিলেন। পঁচিশ বছরের অধিককাল ধরে নিঃস্বার্থ মানবহিতৈষণাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই চারিত্রিক উদারতা ও দেশীয় শিক্ষার স্বার্থে তাঁর উদ্যোগের কথা স্মরণ করে, তাঁর পুণ্য স্মৃতির প্রতি এদেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণের জন্য ঠিক হয়েছিল যে প্রতি বৎসর ১লা জুন তারিখে তাঁর বন্ধুরা একটি বাৎসরিক স্মৃতিসভার আয়োজন করবেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠান। যে-মনীষীর পুণ্য নাম তাঁদের সকলেরই প্রিয়, তাঁদের হৃদয়ের মণিকোঠায় প্রদীপ্ত, তাঁদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবোধের সঙ্গে যাঁর নাম বিজড়িত, তাঁরই মানবপ্রেমকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য তাঁরা সমবেত হয়েছেন। গত দু'বছরের সভায় ভারতবর্ষের নৈতিক, মানসিক ও সামাজিক প্রগতি নিয়ে লেখা রচনা পাঠ করা হয়েছে। সভাপতি মহাশয় আরও বললেন, আজও, তাঁর ডানদিকে যে বন্ধুটি রয়েছেন, তিনি অনুরূপ একটি রচনা পাঠ করে শোনাবেন। বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত তখন বাংলায় লেখা একটি রচনা পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। শিক্ষা হিন্দুদের মনোজগতে কি কি পরিবর্তন সাধন করেছে তাই ছিল তাঁর রচনার বিষয়। তিনি প্রথমেই তাঁর দেশের আগের অবস্থা কি ছিল সে সম্পর্কে বললেন। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করলেন তিনি। তিনি বললেন যে এক সময় এমন অবস্থা ছিল যখন হিন্দুরা জনহিতকর কাজের উপযোগিতা একেবারেই বুঝতে পারত না। এবং তার জন্য এক পয়সা চাঁদা দেওয়াও কর্তব্য বলে মনে করত না। তাদের জৈবিক প্রয়োজনগুলির পরিতৃপ্তি

সাধন ছাড়া আর কিছুই তারা তখন বুঝত না। কিন্তু তারপর তাঁর (বক্তার) স্বদেশের ভাগ্যাকাশে সুপ্রসন্ন উষার উদয় হল। যদিও স্বদেশবাসীর অধিকাংশের মধ্যেই গণচেতনার উন্মেষ ঘটল না, যদিও প্রায় সকলেই উদাসীন, নিস্পৃহ হয়েই রইলেন, তবু এদেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত এমন সব লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগল যাঁদের এই সমস্ত অভিযোগে অভিযুক্ত করা চলে না। তাঁদের চিন্তা এবং কর্মের প্রকরণ অজ্ঞানতার তমসায় আচ্ছন্ন অন্যান্য স্বদেশবাসীদের ধ্যানধারণা এবং কর্মপ্রবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রশংসার্হ উদ্যোগে নিজেদের নিয়োজিত করছিলেন স্বদেশের উন্নতি সাধনের এবং মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য, দেশের নৈতিক এবং রাষ্ট্রিক অবস্থাকে উন্নততর করার সাধনায় স্থাপন করছিলেন বিভিন্ন ধরনের সমিতি। যে-শিক্ষার আশীর্বাদ তাঁরা নিজেরা পেয়েছিলেন, তার কল্যাণশিখা যাতে আরো অনেককে স্পর্শ করে, সেজন্য তাঁরা বিভিন্ন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করছিলেন— তাঁরা জেনেছিলেন দেশের সমস্ত অমঙ্গল অপসারণ করার সবচাইতে প্রশস্ত পথ হলো শিক্ষার আলো বিকীর্ণ করা। বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত তারপর বললেন . যে স্বর্গত ডেভিড হেয়ারের চেষ্টায় অবস্থার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তা সুফলপ্রসূ হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বললেন, অনন্যোদ্যোগী, অক্লান্ত কর্মী স্বর্গত হেয়ার ছিলেন দেশীয় শিক্ষার শুভার্থী। দেশব্যাপী যে মহৎ নৈতিক বিপ্লবের সাড়া অনুভূত হচ্ছিল, হেয়ারই ছিলেন তার স্রষ্টা। হেয়ারের কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা

করে তিনি মন্তব্য করলেন যে ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে যে যে বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় মনে হোত, হেয়ার তার প্রায় সবকটির সঙ্গেই নিজেকে জড়িত রেখেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রেসের স্বাধীনতা, কুলী ব্যবসায় নিরোধের প্রচেষ্টা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হেয়ারের চরিত্রের সবচেয়ে লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য যা ছিল, তাঁর সেই সদাসক্রিয় হিতাকাঙ্ক্ষার প্রশস্তিবাচন করে বাবু অক্ষয় কুমার তাঁব বক্তৃতার উপসংহার টানলেন এবং তারপর বক্তৃতান্তিক সশব্দ উৎসাহব্যঞ্জক হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

তারপর উঠলেন বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি বললেন :

'এইমাত্র আমার এক বন্ধু বলেছেন যে মিস্টার হেয়ার ছিলেন সেইসব লোকেদেরই অন্যতম যাঁরা সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ বলে মনে করেন, সমস্ত মানবজাতিকে মনে করেন স্বজাতি। আমাদের নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের সাধনায় তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেও সে সম্পর্কে যথেষ্টভাবে বলা হয় না। আমাদের নবজন্ম দান করার কল্পনাকে তিনি বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন, সেই সঙ্কল্পে আপনার সমস্ত শক্তিকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। তাঁর স্বপ্ন সফল হবে, এই ছিল তাঁর একমাত্র আশা, একমাত্র কামনা। ইংলণ্ড, তথা ইওরোপ, তথা সমগ্র পৃথিবী যেসমস্ত মানবহিতৈষীদের জন্ম দিয়েছে ডেভিড হেয়ার সন্দেহাতীতভাবে তাঁদের মধ্যে উচ্চাসন পাবার যোগ্য—আমার দৃঢ় প্রত্যয়, আমার এ মন্তব্যের জন্য আমি অতিরঞ্জনের দায়ে অভিযুক্ত হবো না। এদেশে

মনীষার আলো বিকীর্ণ করে দেশকে প্রগত করার পথ যে প্রচণ্ড বাধাগুলি রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের জয় করার মতো শক্তি হেয়ারের ছিল। তাঁর ধৈর্য ছিল অটল; কোন দলবিশেষের প্রতি নয়, সর্বসাধারণের প্রতিই তাঁর সদাশয়তা ছিল অবারিত। তাঁর এই সমস্ত সদ্‌বৃত্তিকে পাথেয় করেই তিনি একটি বিদেশী জাতির কল্যাণসাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর উপচিকীর্ষা যে গোপন ও নির্জন পথে তাঁকে চালিত করেছিল, সেখানে মানুষের কাছ থেকে যশ পাবার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু এই পথে গৌরবের যে-আসন পাতা তার কাছে রাজসম্মান তুচ্ছ; এপথের পথিক হওয়ার যে-আনন্দ ইন্দ্রিয়সুখ তার কাছে কিছুই নয়। অবশ্য এখানে অনেকে উপস্থিত আছেন যাঁরা হেয়ারের কাছে নানাদিক দিয়ে গভীরভাবে ঋণী, চিন্তার স্বাধীনতা এঁরা পেয়েছেন হেয়ারের কাছ থেকেই। এঁদের প্রথম যৌবনের দিনগুলি থেকেই এঁরা জেনে এসেছেন, হেয়ার হলেন তাঁদের সর্বোত্তম বন্ধু, সবচাইতে অকৃত্রিম সুহৃৎ। সুতরাং এঁদের কাছে হেয়ারের মানবহিতৈষণা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া সময়ের অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যে আলোচনাটি এইমাত্র শুনেছি তা খুবই বুদ্ধিদীপ্ত এবং উৎসাহোদ্দীপক; বাংলায় লেখা হলেও এর উৎকর্ষ কিছু কম নয়। সভাপতি মহাশয়, আমি জানি আমাদের শিক্ষিত বন্ধুদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁদের কাছে বাংলায় লেখা কিছুই ভাল লাগে না; তাঁদের রুচি বোধহয় মাতৃভাষায় যা কিছু লেখা আছে, তারই বিপরীতধর্মী। যত উন্নত ভাবনা, যত সূক্ষ্ম অনুভূতিই হোক না কেন, তা যদি মাতৃভাষায় প্রকাশ

করা হয়, তাহলে তা তাঁদের কাছে মনে হয় নিতান্ত সাদামাটা, পুরনো, কিংবা অনুপযোগী। তবে আমার ধারণা, এই আত্মাভিমান অতি দ্রুত লোপ পাচ্ছে। বাংলাভাষা আমাদের দেশের ভাষা, আমাদের শৈশবের ভাষা। আমাদের প্রথম জীবনের ধ্যানধারণা, ভাবানুষঙ্গ এই ভাষার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীসূত্রে জড়িত; আমি মনে করি, এই ভাষাচর্চার উপযোগিতা ও গুরুত্ব অবিলম্বেই সকলের কাছে স্বীকৃত হবে।'

চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন, ফৌজদারী বালাখানায়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ।

রেভারেণ্ড কে. এম বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় একটি রচনা পাঠ কবেন।

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রকে রাজসাহী যেতে হয়েছিল বলে ২০শে এপ্রিল, ১৮৪৬-এব একটি আবেদনের মাধ্যমে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেছিলেন। সভায় সেটি পাঠ করা হল।

কিশোরীচাঁদকে হেয়াব স্মৃতিরক্ষা কমিটিতে তাঁর সক্রিয় উদ্যোগ ও পরিশ্রমের জন্য ধন্যবাদ দানের প্রস্তাব উত্থাপন করলেন রামগোপাল ঘোষ। রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় এটি সমর্থন করলেন এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব উত্থাপন করলেন যে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রকে হেয়ার স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত করা হোক। প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন বাবু রামচন্দ্র মিত্র, সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ

এম. জে. কার হেয়ারের চরিত্রকে বিচার করে দেখবার অনেক সুযোগ পেয়েছিলেন, সেই অভিজ্ঞতার আলোতে হেয়ারের সদাশয়তা এবং মানবহিতৈষণা সম্পর্কে তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র বললেন যে অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন হেয়ারের প্রতিমূর্তিটি মিঃ বেইলির কাছ থেকে সুন্দরভাবে নির্মাণ করিয়ে নিতে। ডাঃ গুডিভ এবং মিঃ জোশেফ হেয়ার প্রতিমূর্তিটি দেখেছেন। তাঁরা দু'জনেই স্বীকার করেছেন যে হেয়ারের সঙ্গে প্রতিমূর্তিটির বিস্ময়কর ও অনিন্দ্য সাদৃশ্য আছে। তিনি আরো জানালেন যে শীঘ্রই সেটিকে জাহাজে করে পাঠানোর (অর্থাৎ, এদেশে আনানোর) ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হেয়ারের যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনার কথা ছিল, সে সম্পর্কে দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বললেন যে এ নিয়ে কমিটি এখনও কিছু করে উঠতে পারেননি। তার কারণ অবশ্য, হেয়ারের জীবনের আদিপর্ব সম্পর্কে তথ্য তাঁরা পাননি। হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড সম্পর্কে তিনি জানালেন, সংগ্রাহকের হাতে যে অর্থ রয়েছে তার পরিমাণ হল ১,৬৩১।৵০। তিনি অবশ্য আন্তরিক আশা প্রকাশ করলেন যে প্রয়োজনীয় অর্থ নিশ্চয়ই সংগৃহীত হবে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হল। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেয়ারের অনন্যসাধারণ গুণাবলী এবং কল্যাণমূলক কার্য-কলাপ সম্পর্কে বাংলায় একটি ভাষণ দিলেন পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন হিন্দু কলেজে ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী সভা আহূত হয়েছিল। সভাপতির আসন

গ্রহণ করেছিলেন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সভায় বাংলাতে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন বাবু রাজনারায়ণ বসু।

হিন্দু কলেজেই সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়, ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন। এবার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ। সভায় অনেক জনসমাগম হয়েছিল। মাননীয় অতিথিদের মধ্যে ছিলেন অনারেবল জে. ই. ডি বেথুন, ডঃ এফ জে. মৌয়াট; মিঃ বেলফোর। এদেশীয় শিক্ষার জনক হেয়ারের মানবহিতৈষণাকে উপজীব্য করে লেখা একটি রচনা পাঠ করলেন রেভারেণ্ড কে. এম বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বললেন, হেয়ারের কাছে উপকৃত এ দেশের প্রত্যেক লোকেরই উচিত স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করা।

মাননীয় জে ই. ডি বেথুন আলোচনাটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং প্রস্তাব আনলেন যে, এটিকে মুদ্রিত করা হোক।

১৮৫০-এর ১লা জুন সংস্কৃত কলেজে অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী সভা আহূত হয়েছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন রেভারেণ্ড কে. এম বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাভাষাকে শক্তিশালী করে তোলবার সর্বোত্তম উপায় আলোচনা করে বাংলায় রচনা পাঠ করেন সভাপতি স্বয়ং। নিবন্ধটির উপসংহারে হেয়ার সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ছিল।

নবম বার্ষিকী সভা ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। অধ্যাপক রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন; সভাতে বাংলায় একটি নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজে অনুষ্ঠিত দশম বার্ষিকী সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ। সভায় বাংলায় লেখা একটি রচনা পাঠ করেন নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। একাদশ বার্ষিকী সভাও মেডিক্যাল কলেজেই অনুষ্ঠিত হয়—১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন; সভাপতির আসনে ছিলেন অধ্যাপক রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বাংলায় লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মেডিক্যাল কলেজেই দ্বাদশ মৃত্যুবার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বাবু শিবচন্দ্র দেব। ভারতবর্ষের জনসাধারণ দেশ-ভ্রমণে কি কি সুফল লাভ করতে পারে সে সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ডাঃ চক্রবর্তি।

ত্রয়োদশ বার্ষিকী সভা বসেছিল ১৮৫৫-এর ১লা জুন—জোড়াসাঁকোয় বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। বাবু অম্বিকাচরণ ঘোষাল, বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহ আলোচনানিবন্ধ পাঠ করেছিলেন। নিজ নিবন্ধের উপসংহারে বাবু কৃষ্ণদাস হেয়ার প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন:

আমার বিনীত হৃদয়, এবাব স্থির হও।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা এতক্ষণ 'শিক্ষিত বাঙালীর' কথা আলোচনা করছিলাম। কিন্তু, কে তাকে আলোচনার যোগ্য করে তুলেছে, কে তাকে এই ঈর্ষাযোগ্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে? আরো পরিষ্কারভাবে বলি—যে শিক্ষার ফলে সে সঙ্গতকারণেই গর্ব অনুভব করে, তার জন্য সেই

শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম কে করে দিয়েছে? ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা নিজেদের কাছে প্রশ্ন করুন, প্রশ্ন করুন তাঁদের যাঁরা আপনাদের সেই সুহৃৎকে আপনাদেরই স্বার্থে পরিশ্রম করতে দেখেছেন, প্রশ্ন করুন প্রবীণ স্বদেশবাসীদের, প্রশ্ন করুন অমর, নির্বাক ও সর্বজ্ঞ ইতিহাসবেত্তা সেই 'মহাকাল'-কে; সকলেই আপনাকে (এক) উত্তর দেবে যে তিনি হলেন 'ডেভিড হেয়ার'; সেই মহান পুরুষের স্মৃতি উদ্‌যাপনের জন্য এই সন্ধ্যায় আমরা সমবেত হয়েছি। তাঁর কাছে—

জীবন ছিল বাস্তব, জীবন ছিল সত্য
এবং 'একটি মহৎ লক্ষ্যের জন্য উৎসর্গীকৃত';
(সেই জীবনসাধনা ছিল) 'হিন্দুমনে বৃটিশজাতির জ্ঞানালোকের
আশিস্‌ধারা বর্ষণ করা,
সত্য ও প্রকৃতির ম্লান আলোককে পুনরুদ্দীপিত করে তোলা।'
ডি. এল. আর*

ডেভিড হেয়ার ভারতবর্ষের প্রকৃত সুহৃৎ ছিলেন। মানুষ চিরদিন ধরে যেসব কাজের ব্রত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে সবচাইতে পবিত্র কাজেই তিনি আপন শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বাংলাদেশের অধিবাসীরা যাতে শিক্ষা পায়, যাতে প্রকৃত অর্থে (জ্ঞানের) আলোয় দীপ্ত হয়ে ওঠে, তারই জন্য তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার অগ্রগতির পথে কোন কাজ অসম্পূর্ণ থাকলে, কি দিনে কি রাতে তাঁর বিশ্রামের অবকাশ ঘটত না, সমস্ত হৃদয়মন তিনি নিয়োগ করতেন সেই কাজে। তাঁর সেই প্রয়াসের সাফল্য প্রতিফলিত হয়েছে 'নব্যবঙ্গের' উন্নত আত্মার মধ্যে।

দেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ লোহার (রেল) পথ ও বৈদ্যুতিক তার বসেছে, খালের সাহায্যে জলসেচের ব্যবস্থা হয়েছে, নির্মিত হয়েছে বাঁধানো রাজপথ। তাছাড়া, ডাকবিলির ব্যবস্থা এখন সহজ হয়ে এসেছে; যা একদিন শুধু জঙ্গল ছিল তা আজ রূপান্তরিত হয়েছে সমৃদ্ধ শস্যক্ষেত্রে

* ডি. এল. রিচার্ডসন

আর মানুষের হাস্যোজ্জ্বল আবাসে। এই পরিবর্তনের যে স্বল্প কয়েকজন রূপকার আছেন তাঁরা আমাদের গভীরতম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। কিন্তু অজ্ঞতা ও বর্বরতার অন্ধকার আবরণ সরিয়ে, কুসংস্কার ও প্রাচীন ধ্যানধারণার জীর্ণ দুর্গ ধূলিসাৎ করে দিয়ে (তার পরিবর্তে) প্রকৃত উন্নত ও সুন্দর, প্রকৃত সৎ ও মহতের জন্য আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যে-কাজের আদর্শ, তার উপযোগিতা ভাষায় অবর্ণনীয়। সে কাজের ভার যিনি গ্রহণ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধা ও অনুরাগের উপর তাঁর দাবি সীমাহীন। স্টিফেনসন, ওসঘ্‌নেসি, টমসন অথবা নেপিয়ারের মত লোক সঙ্গতকারণেই আমাদের প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু আমাদের এই সাধারণ দেশে ডেভিড হেয়ার যে অতুলনীয় কাজ করেছেন তার যোগ্য মর্যাদা কে দেবে? লোকে যাদের অভিভাবকরূপী দেবদূত বলে, যাঁরা আমাদের ভাগ্যকে পরিচালিত করেন এবং আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখেন এ পৃথিবীতে তাঁদের অস্তিত্ব কোথাও যদি থাকে, তাহলে হেয়ার নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন। তিনি ছিলেন বন্ধুহীনের বন্ধু, অভিভাবকহীনের অভিভাবক, সহায়হীনের সহায়। তাঁর সম্পর্কে যেসব গল্প বলা হয় তা ঠিক রোমান্টিক না হলেও রোমান-সদৃশ। তাঁর প্রতিটি কাজে একটি নৈতিক আদর্শ প্রকাশ পেত। তাঁর জীবনই ছিল নৈতিক দর্শনের একখানি পুঁথি, অসঙ্কোচ মানবহিতৈষণার প্রোজ্জ্বল বাণীরূপ। তাঁর সদ্‌বৃত্তিগুলি ছিল সক্রেটিসের মতো, তাঁর চরিত্র ছিল ঋষিতুল্য। সত্যই, (কোন) মানুষ যদি স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি হয়, তাহলে তিনিই ছিলেন সেই মানুষ। তিনি তাঁর বংশের সম্মান, তাঁর দেশের গৌরব, তাঁর জাতির অলঙ্কার। মহান ছিল তাঁর আত্মা, উদার ছিল তাঁর হৃদয়। লর্ড বায়রনের মতো তিনি আপন জন্মভূমি—যৌবন ও প্রেমের লীলাঙ্গন—ত্যাগ করেছিলেন বুদ্ধিহীনতার দাসত্ববন্ধন থেকে ভারতবর্ষের হতভাগ্য সন্তানদের মুক্ত করবার জন্য। একটি মহৎ উদ্দেশ্যসাধনের আগ্রহে দ্বিধাহীন চিত্তে যে-বিদেশকে তিনি ভালোবেসেছিলেন অবশেষে সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।

আজ সন্ধ্যায় যাঁরা তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখাতে সমবেত হয়েছেন তাঁদেরই কাজে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন নিজের সমস্ত সম্পদ। যে সৎ কাজ তাঁকে অমরত্ব দান করেছে, কোন খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা কিংবা জাগতিক সুখের প্রেরণায় তিনি সে কাজে প্রবৃত্ত হননি—একথা সত্যই শিক্ষাপ্রদ। আমাদের মঙ্গলের জন্য তাঁর আন্তরিক আগ্রহ, আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর অকৃত্রিম উদ্বেগ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে দাক্ষিণ্য ও আত্মোৎসর্গের এই মহৎ কাজে আত্মনিয়োগ করতে—কোন বিজেতার অত্যুজ্জ্বল সাফল্য, কোন দার্শনিকের গৌরব-দীপ্ত আবিষ্কারের কৃতিত্বই এই কাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। লোকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তিনি আপন মহানুভব কর্মের কথা জাহির করে বেড়াতেন না, আপন মানবহিতৈষণার কথা সাড়ম্বরে প্রচারও করতেন না।

তিনি সৎকাজ করতেন দৃষ্টির আড়ালে থেকে। নিঃশব্দে, অতি-সংগোপনে তিনি আপন কল্পনাগুলিকে রূপ দিতেন। তাঁর দৈনন্দিন কাজের তালিকা সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান রাখা খুব প্রয়োজনীয়। এখানে সংক্ষেপে তাঁর দৈনন্দিন কাজের একটি সুন্দর বিবরণ তুলে ধরছি: সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। তারপর প্রাতঃকৃত্য সেরে যে পবিত্র কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার অগ্রগতির দিকে মনোযোগ দিতেন। একদল অভাবগ্রস্ত পিতা তাদের ছোট ছোট নিষ্পাপ ছেলেদের নিয়ে তাঁর কাছে হাজির হত, তিনি তাদের অভিযোগ জিজ্ঞাসা করতেন এবং সেগুলির জবাব দিতেন, ছেলেদের তিনি নিজের যত্নে রাখবার জন্যে গ্রহণ করতেন—যে সৈন্যদলের তিনি ছিলেন সবাধিনায়ক বা সর্বাধ্যক্ষ সেখানে সৈনিক হিসাবে তাদের নাম লেখা হয়ে যেত। বিদ্যালয়ই ছিল তাঁর অভিনয়ের রঙ্গমঞ্চ, তাঁর যুদ্ধের প্রান্তর, তাঁর সক্রিয়তার ক্ষেত্র, তাঁর কাজের জগৎ। বিদ্যালয়ে যাবার সময় যখন হোত, তিনি বেরিয়ে পড়তেন, তাঁর বিদ্যালয়ে এসে দেখতেন কে অনুপস্থিত হয়েছে এবং কি কারণে।

পাড়ার ছাত্রদের কাছে খোঁজ নিতেন, গরহাজির ছেলেদের বিদ্যালয়ে না আসার কারণ কি, তারপর নিজেই বেরিয়ে পড়তেন তাদের অনুপস্থিতির কারণ জানতে। যেখানে তিনি শুনতেন যে ছেলেটির পক্ষে আর্থিক সঙ্গতি পড়াশুনা চালানোর অনুকূল নয় সেখানে ব্যাঙ্কের কাজ করতেন তিনি অর্থ দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু এত নিঃশব্দে এবং গোপনে তিনি এই কাজ করতেন যে আমি বা আপনারা এই মুহূর্তে অস্ট্রিয়া বা রাশিয়ায় কি ঘটছে যতটা জানি, তার বেশি জানতে পারত না সেই ছেলেটির সঙ্গে যারা পড়ত তারাও। আবার যেখানে তিনি দেখতেন যে ছেলেটি অসুস্থ সেখানে তিনি চিকিৎসকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। যতদিন না সে সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করত ততদিন তিনি প্রত্যহ তাকে দেখতে যেতেন, পিতৃসুলভ উদ্বেগের চিহ্ন সেই সময় তাঁর চোখেমুখে প্রকাশ পেত। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী ছিলেন না কিন্তু শিক্ষাদানে তাঁর এমন সহজাত নৈপুণ্য ছিল যে তাঁর শিক্ষায় ছাত্রদের চরিত্র বিস্ময়কর বৈদগ্ধ্যে সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠেছিল। একটি মাত্র গর্বে তিনি সুখ পেতেন—সেই পবিত্র গর্ব হল যে তাঁর ছাত্রেরা ছিল হিন্দু কলেজের ফুলের দল। তাঁর আচরণ এত সহজে হৃদয় জয় করত, তাঁর ব্যবহার এত মধুর ছিল যে ছেলেরা তাঁকেই একমাত্র সুহৃৎ মনে করে তাঁর দিকে আকৃষ্ট হত। হেয়ারের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকতে, হেয়ারের বিদ্যালয়ের ছাত্র হতে তারা আনন্দ অনুভব করত। তাঁর সৎ কাজের এত গল্প আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে যে এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তাদের আভাস মাত্র দেওয়াও খুব কঠিন। একজনের কাছে শুনেছি তাঁর লাইব্রেরি ছিল ছাত্রদের লাইব্রেরি—তাঁর কাগজ কলম সবই তারা ব্যবহার করত। আর একজন বলেছে, তিনি এত উদার ও দয়ালু ছিলেন যে যদি কারো উপকারে লাগত তাহলে হতভাগ্য গোল্ডস্মিথের মতো তিনিও পরবার জামাকাপড় বন্ধক দিতেন। আর একজনের কাছে শুনেছি যদি কেউ তাঁর শরণাপন্ন হোত তাহলে তার মঙ্গলের জন্য

তিনি চরম কষ্ট এবং আত্মত্যাগ করতে পারতেন। এইরকমভাবে যতজনের কাছেই হেয়ারের মহানুভবতা সম্পর্কে প্রশ্ন করি, একটি করে নূতন গল্প শুনতে পাই—তাঁর সৎ কাজের সীমা এতটাই বিস্তৃত ছিল। মহত্ত্বরূপী যে দেবদূতের ধ্যান মানুষ করে হেয়ার ছিলেন তাই; সদ্‌গুণ তাঁর মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল, মানবহিতৈষণাই ছিল তাঁর আত্মা।

কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বর্ণ বা জাতির অজুহাতে তিনি কখনও কাউকে সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতেন না। কোন বিশেষ শ্রেণীর জন্য তিনি কর্মের ব্রত গ্রহণ করেননি, তাঁর শরণার্থী প্রত্যেকের জন্যই তিনি এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দুরা সানন্দে তাদের ছেলেদের পাঠাত তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য, শুধু তাঁর দাক্ষিণ্যে নয়, তাঁর জাতিনিরপেক্ষতাতেও তারা উৎসাহিত হত। তাঁকে জানত এমন হিন্দু ভারতবর্ষে ছিলনা যে তাঁর মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেনি। তাঁর মৃত্যু দেশের সবাইয়ের কাছেই ছিল গভীর দুঃখবহ। স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলেই তাঁর জন্য কেঁদেছিল। এমনই মূল্য এবং ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন।

ভদ্রমহোদয়গণ, সেই মহান মানবপ্রেমীর অবশেষ এখন কোথায় নিহিত আছে? যে হিন্দুদের তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বোত্তম সুহৃৎ, তাদেরই হৃদয়ে তাঁর আসন পাতা। অবশ্য তাঁর আর একটি সমাধিও আছে। কলেজ স্কোয়ারে যান, সেখানে তাঁর প্রিয় ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হিন্দু বন্ধু এবং ছাত্ররা যে পবিত্র স্মৃতিস্তম্ভটি স্থাপন করেছে সেটি দেখতে পাবেন। তবে শিক্ষিত এদেশবাসীর ধ্যান ও চিন্তাই তাঁর যথার্থ যোগ্য স্মারক।

এখানে ডেভিড মৃত্যুর বিশ্রামে শয়ান,
অমর যশোগাথায় তাঁর নাম
টেমস হতে গঙ্গা পর্যন্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

স্মৃতিগাথায় কবি স্যামুয়েল রোজার্স বলেছেন :

সৎ মানবের সমাধির পাশে একা যখন বসি,
মনে হয়
শিলাখণ্ডের উপর বসে আছেন এক দেবদূত—
পুরনো যুগের সেই 'তিনগুণ' পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত রাত্রিতে
স্বর্গীয় দ্যুতিতে উজ্জ্বল পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে
উপবেশন করতেন কিংবা ঘুরে বেড়াতেন যেসব দেবদূত,
ইনিও তাঁদের মতো।
তাঁর কণ্ঠস্বর হৃদয়ে ভয় আনে না, প্রেরণা দেয়,
ঊর্ধ্বপানে অঙ্গুলি মেলে তিনি বলেন, 'শোন, তিনি তো এখানে নেই,
তিনি লাভ করেছেন পুনর্জীবন।'

আমাদের বর্তমান উন্নত অবস্থার জন্য আমরা যাঁর কাছে ঋণী, তাঁর কথা আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কি একই অনুভূতি আমাদের হৃদয়কে দোলা দেয় না, একই সুরের ছোঁয়া মনে লাগে না? বাস্তবিকই, যদি কোন মানুষের কাছে আমরা এমন কৃতজ্ঞতার ঋণে বাঁধা পড়ে থাকি, যা কোন মানুষ কোনদিন শোধ করতে পারবে না, তাহলে সে মানুষ ডেভিড হেয়ার। কবির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত না করে (এই প্রসঙ্গে) ছেদ টানতে পারছি না.

ডেভিড হেয়ার! হে মানব! হে সহোদর!
তুমি কি প্রয়াণ করেছ অনন্ত কালের জন্য?
জীবনের বিষণ্ন সীমানা ছাড়িয়ে সেই অপরিচিত প্রবাহিনীর
পরপারে উত্তীর্ণ হয়েছ তুমি?
যে-জগতের মধ্যে আমাদের বাস
সেখানে তোমার মতো আর কাকে পাবো?

খ্যাতিমান যাঁরা,
শিল্পিত সমাধিমন্দিরের সাড়ম্বর উজ্জ্বল তুচ্ছতা

তাঁদের (অন্তিম) আশ্রয়;
কিন্তু হে যোগ্যতম, পবিত্র তৃণাচ্ছাদনই (তোমার আবরণ),
সেখানে আমরা প্রতীক্ষায় থাকব,
অশ্রুবিসর্জন করব এই ভেবে—
মহত্তম পুরুষের জীবন লীন হয়ে আছে পৃথিবীর মৃত্তিকায়।*

এই-ই ছিলেন ডেভিড হেয়ার। তাঁর কাছে আমরা অশেষ কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। সে-ঋণ শোধের জন্য আমরা সেই কাজই করব যা আমাদের শিক্ষা আমাদের করতে নির্দেশ দেয় এবং হেয়ার জীবিত থাকলে যা করতে সম্মতি দিতেন। এমন কাজই আমাদের করা উচিত যা মনুষ্যোচিত, যা দেশপ্রেমিকের যোগ্য। তিনি অসৎপথকে ঘৃণা করতেন, আমাদেরও কর্তব্য সে পথ পরিত্যাগ করা। ভদ্রমহোদয়গণ, লর্ড হ্যালিফক্সের মতো তাৎপর্যময় ভাষায় (এই প্রসঙ্গের) সমাপ্তিতে বলি, আমরা যেন আমাদের চরিত্র সেইভাবে উন্নত করে তুলতে পারি, যাতে পরের যুগ আরও গৌরবময় হয়ে ওঠে, আমাদের দৃষ্টান্তে উপকৃত হয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যেন আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করে। ঈশ্বরের কৃপা যদি থাকে, এ কাজে আমরা ব্যর্থ হবো না। আসুন, আমরা মানুষ হই—আমাদের মুখের কথাকে কাজে পরিণত করি, আমাদের করণীয় যা কিছু তাকে বাস্তবে রূপ দিই। তা'হলেই আমরা গৌরব এবং দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করব।

চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে, ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। সভাপতি সভাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন ও হেয়ারের জনহিতৈষণা-

* ক্যাপ্টেন ম্যাথু হেণ্ডারসন সম্পর্কে বার্ন-এর লেখা গাথা। প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রাখবার জন্য ছত্রগুলিতে আমি হেণ্ডারসন-এর জায়গায় 'ডেভিড হেয়ার' বসিয়েছি, কাজটা বোধহয় খুব নিন্দনীয় নয়।

মূলক কর্মপ্রবৃত্তি এবং মহৎ আত্মত্যাগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বললেন।

বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায় জনাই-এর শিক্ষণ-বিদ্যালয় (Training school) সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ করে ইংরেজীতে লেখা একটি আলোচনা নিবন্ধ পাঠ করলেন। মাতৃভাষা অধ্যয়ন সম্পর্কে বাংলায় একটি রচনা পড়লেন বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ। এবপর শুরু হল একটি আগ্রহোদ্দীপক এবং সুদীর্ঘ বিতর্ক। এতে একপক্ষে ছিলেন পেরেণ্টাল অ্যাকাডেমির মিঃ ম্যাক্‌লাকি, প্রোফেসব বার্গেস এবং অপরপক্ষে বাবু কৃষ্ণদাস পাল ও যদুনাথ ঘোষ। প্রথম পক্ষের প্রতিপাদ্য ছিল যে সরকার যদি ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে নীতিশিক্ষার বীজ দৃঢভাবে বোপণ করতে চান এবং তাদের বাস্তব নীতি-বোধকে খুব উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে চান তাহলে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদেব গঠিত সবকার হিসাবে তাঁদেব উচিত হবে শিক্ষার অঙ্গরূপে বাইবেল পাঠ স্কুল এবং কলেজে প্রবর্তিত কবা। এঁদের বিপক্ষেব যাঁরা, তাঁবা এঁদের বক্তব্যের তীব্র বিবোধিতা করলেন। তাঁবা বললেন যে বাস্তবাশ্রিত উচ্চ নীতিবোধ শিক্ষা দেবার জন্য খ্রীষ্টীয ধর্মশাস্ত্র পাঠেব প্রয়োজন হয় না, নীতিবোধেব শিক্ষা যে কোন ধর্মগ্রন্থ বা নীতিশাস্ত্র থেকেই পাওয়া যায়; আব তাছাড়া, নীতিবোধ আব ধর্মের মধ্যে ব্যবধান দুস্তব।

বেভাবেণ্ড মিঃ এইচ. এ ডাল এদেশীয বক্তাদের সমর্থন করলেন। তিনি আরো বললেন যে সম্প্রতি নীতিশিক্ষা সম্পর্কে লেখা একখানি পুস্তিকা তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে পেয়েছেন —তাতে খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে কোন আলোচনা নেই। সরকারী স্কুল

এবং কলেজগুলিতে যাতে এটি পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে, সেইজন্য একজন সহ-পরিদর্শক বইটিকে মিঃ গর্ডন ইয়ং-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। কতকগুলি অংশ ছাড়া বইটি প্রায় সম্পূর্ণই গৃহীত হয়েছে এবং এখন প্রকাশিত হতে চলেছে।

সভাপতি তারপর সভাস্থ সবাইকে জানালেন যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা সম্পর্কে কোন বিবরণ তখনও বিচারকদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। সভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে একজন প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন যে বাংলায় হেয়ারের একটি জীবনী রচনা করা হোক। সভাপতি এই প্রস্তাবে তাঁর সম্মতি জানালেন। তিনি আশা করলেন যে আগামী বৎসর এইরূপ আর একটি স্মৃতিসভায় বইটি প্রকাশিত হবে।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাড়িতে পঞ্চদশ স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বাবু যাদবকৃষ্ণ সিংহ। বাংলাদেশে শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন বাবু নীলমণি দেব। ষষ্ঠবার্ষিকী স্মৃতিসভা আহূত হল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন। সভাটি বসল বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং সভায় বাংলা নাটক সম্পর্কে লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সপ্তদশ বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হল বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহেরই বাড়িতে। এবারেও সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর। সভাপতি মহাশয় সভা আহ্বানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এদেশীয় শিক্ষার উন্নতিবিধানার্থে হেয়ারের মহৎ কর্মপ্রয়াসের বিশদ পরিচয় দিলেন।

বাংলায় লেখা আলোচনানিবন্ধ পাঠ করলেন বাবু বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন অষ্টাদশ বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হল একই জায়গায়। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন বাবু বলাইচাঁদ সিংহ। বাংলায় লেখা একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ঊনবিংশ স্মৃতিসভা আয়োজিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা জুন। এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ; হিন্দু কলেজ এবং তার প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র একটি প্রবন্ধ পাঠ কবলেন। বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্ট 'খ' হিসেবে এই প্রবন্ধটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসো-সিয়েশনের বাড়িতেই বিংশতিতম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হল। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা এবং কৃষিপ্রদর্শনী সম্পর্কে একটি আলোচনা নিবন্ধ পাঠ করলেন বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েশনেব বাড়িতে অনুষ্ঠিত একবিংশতিতম হেয়ার স্মৃতিসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন বাবু দিগম্বর মিত্র। মেডিক্যাল কলেজ এবং তার প্রথম সম্পাদক সম্পর্কে একটি অভিভাষণ দিলেন বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসো-সিয়েশনের বাড়িতেই ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন যে দ্বাবিংশতি-তম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হল, তাতে সভাপতিত্ব করলেন

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র। সভায় একটি প্রবন্ধ পাঠ করলেন বাবু নবগোপাল মিত্র।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে ত্রয়োবিংশতিতম স্মৃতিসভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বাবু কৃষ্ণদাস পাল এবং একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। চতুর্বিংশতিতম স্মৃতিসভাটিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন এই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজধানী (কলিকাতায়) শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি আলোচনা সভায় করেছিলেন বাবু কেশবচন্দ্র সেন। উপসংহারে তিনি বললেন যে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের যাতে নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায়, সে জন্য আরো সুষ্ঠু বন্দোবস্ত থাকা উচিত। বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু কৃষ্ণদাস পাল, বাবু কিশোরী চাঁদ মিত্র এবং বাবু কাশীশ্বর মিত্রকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। সরকারী বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্যে আরো কল্যাণকরভাবে নৈতিক শিক্ষা এবং অনুশীলনের ধারা প্রবর্তনের জন্য যাতে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে জনশিক্ষা অধিকর্তার কাছে দরবার করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিচারের জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছিল।

কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের নাম পরিবর্তন করে হেয়ার স্কুল রাখার জন্য জনশিক্ষা অধিকর্তাকে ধন্যবাদ জানানোর প্রস্তাব এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

পঞ্চবিংশতিতম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন। সভায়

সভাপতিত্ব করেন বাবু দিগম্বর মিত্র। হিন্দুদের মনোজগতে ইংরেজী শিক্ষার কি ফলাফল হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন টাউনহলে অনুষ্ঠিত সপ্তবিংশতিতম স্মৃতিসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় 'দ্বারকানাথের জীবন চরিত' পাঠ করলেন বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন উনত্রিংশতিতম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হল টাউনহলেই। সভায় সভাপতিত্ব করলেন শ্রদ্ধেয় জে. বি. ফিয়ার। বাংলাদেশে শিক্ষার আদিপর্ব নিয়ে আলোচনা করলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিংশতিতম স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয় টাউনহলেই. ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়; বাবু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র নিম্নলিখিত বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করেন :

'আমাদের তরুণেরা যে-ধরনের শিক্ষা পায় তার চাইতে আরো ব্যবহারিক শিক্ষা তাদের দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।'

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন টাউনহলে অনুষ্ঠিত দ্বাত্রিংশতিতম স্মৃতিসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুর। শিক্ষিত বাঙালীর সৈনিক বৃত্তি গ্রহণের যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেন বাবু নবগোপাল মিত্র।

চতুস্ত্রিংশতিতম স্মৃতিসভাটি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন সিনেট হাউসে অনুষ্ঠিত হল। সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন শ্রদ্ধাস্পদ রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর। স্বর্গত ডেভিড হেয়ারের মানবহিতৈষণা এবং এদেশীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে

তাঁর অমূল্য অবদান সম্পর্কে কিছু প্রারম্ভিক মন্তব্য করার পর সভাপতি মহাশয় সভায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে পরিচিত করিয়ে দিলেন। তারপর ডাঃ সরকার একটি অভিভাষণ দিলেন।

হেয়ার প্রাইজ কাণ্ড

এতে বিচারক ছিলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১। একশত টাকা মূল্যের পুরস্কার।
বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে গল্পাকারে বাংলাভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য। এই পুরস্কারটি হিন্দু কলেজের উচ্চতর বিভাগের বাবু সীতানাথ ঘোষকে প্রদত্ত হয়েছিল।

২। পঁচাত্তর টাকা মূল্যের পুরস্কার।
হিন্দু মহিলাদেব শিক্ষা সম্পর্কে বাংলাভাষায় লিখিত সর্বোত্তম রচনার জন্য। সংস্কৃত কলেজের তারাশঙ্কর শর্মাকে প্রদত্ত।

৩। একশত টাকা মূল্যের পুরস্কার (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত)
সমসাময়িক বাংলাসাহিত্য পরিক্রমা এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করার উপায় সম্পর্কে আলোচনার জন্য বাংলা প্রবন্ধের লেখক পণ্ডিত হরনাথ শর্মাকে প্রদত্ত।

৪। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত রচনার জন্য একটি পুরস্কার দেওয়ার বিষয় আলোচনা করা হল।
এ সম্পর্কে বাবু রামগোপাল ঘোষ নিম্নোক্ত মন্তব্য করলেন : 'আমার সন্দেহ আছে জীবনচরিতটি আকর্ষণীয়

করে রচনা করবার মতো যথেষ্ট উপকরণ লেখক পারেন কিনা। জীবনচরিতের বদলে হয়তো ডেভিড হেয়ারের চরিত্র সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত মন্তব্য সম্বলিত অসংলগ্ন একটি প্রবন্ধ আমাদের হাতে আসবে।' রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই বক্তব্যকে সমর্থন করলেন।

একশ কুড়ি টাকার পুরস্কার (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত)
প্রাচীন এবং বর্তমান যুগের আদর্শ মহিলাদের জীবনী-সম্বলিত বাংলাভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার। কোন রচনা পাওয়া যায়নি।

৫। দু'শো টাকা মূল্যের পুরস্কার (১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত)
'কোন জাতির মহত্ব কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল'— এই সম্পর্কে সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা প্রবন্ধের জন্য পণ্ডিত হরনাথ শর্মাকে প্রদত্ত।

৬। দু'শো টাকা মূল্যের পুরস্কার নিম্নোক্ত বিষয়টির জন্য ঘোষিত হয়েছিল :
'বাঙালী সমাজের বর্তমান অবস্থায় সামাজিক উৎকর্ষ-সাধন সবচাইতে প্রয়োজনীয়। সেই কাজ সফল করে তোলার প্রকৃষ্ট পথ কি ?' এই বিষয়ে একটিমাত্র প্রবন্ধ পাওয়া গিয়েছিল এবং যোগ্যতার মাপকাঠিতে সেটি খুব উঁচুদরের বিবেচিত না হওয়ায় ১০০ টাকা মূল্যের একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

৭। সাড়ে তিনশ' টাকা মূল্যের পুরস্কার—ঘোষিত হয়েছিল শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বাংলাভাষায় লিখিত সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য। তিনটি রচনা পাওয়া

গিয়েছিল এবং বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে একশ' টাকা মুল্যের একটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

৮। আড়াইশ' টাকা মূল্যেব পুরস্কার। দুই অংশে লেখা সর্বোৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য ঘোষিত। প্রবন্ধটির প্রথম অংশে থাকবে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা এবং দ্বিতীয় অংশে থাকবে বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য প্রসারের বিবরণ।

এ সম্পর্কে একটিমাত্র রচনা পাওয়া গিয়েছিল এবং সেটিকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল।

৯। চারশ' টাকা মূল্যের পুরস্কার।

নিম্নোক্ত বিষয়ে বাংলাভাষায় লেখা সর্বোত্তম রচনার জন্য পুরস্কারটি ঘোষিত হয়েছিল : 'ভারতবর্ষের রেলওয়ে এবং ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ, তাদের সূচনা, অগ্রগতি এবং প্রসার। রাজনীতির ক্ষেত্রে, বাণিজ্যে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণের সমৃদ্ধিতে তাদের গুরুত্ব এবং প্রভাব।'

এ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু যোগ্যতার মাপকাঠিতে কোনটিই উপযুক্ত বলে চিহ্নিত হয়নি।

বিচারকমণ্ডলীর কাছে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেছিলেন : 'প্রতি বছর বাংলায় লিখিত রচনা আহ্বানের পিছনে আমাদের যে-উদ্দেশ্য ছিল, তার একটি অনেকাংশে সফল হয়েছে—বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা অনেক রচনা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ; এখন বোধ হয় ভেবে দেখা যেতে পারে, হেয়ার

প্রাইজ ফাণ্ডের সব টাকাটাই এমন কতকগুলি বইকে পুরস্কার দেবার জন্য নিয়োজিত করা যায় কিনা, যেগুলি ব্যবহারিক গুরুত্ব-সম্পন্ন কয়েকটি বিষয়ের ওপর লেখা এবং যেগুলিকে 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড পুস্তক' হিসাবে আখ্যা দেওয়া চলে। আমি অবশ্য এটিকে শুধু একটি প্রস্তাব হিসাবেই পেশ করছি। যদি এটি কমিটির সমর্থন লাভ করে তাহলে এই উদ্দেশ্যে ফাণ্ডের চাঁদা-দাতাদের একটি বিশেষ সাধারণ-সভা আহ্বান করে প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।'

(এই উদ্দেশ্যে) হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডে চাঁদাদাতাদের একটি বিশেষ-সভা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হল। সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করলেন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সভাটি আহ্বানের জন্য যে-বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছিল, সভাপতি মহাশয় সেটি পাঠ করলেন। নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল :

প্রথম—বাংলায় শ্রেষ্ঠ নিবন্ধ রচনার জন্য পুরস্কার দেবার যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তা আশানুরূপভাবে কার্যকর না হওয়ায়, বর্তমানে হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ডের অর্থ স্ত্রীজাতির মানসিক উৎকর্ষ-সাধনোপযোগী নির্দিষ্ট মানের কতকগুলি বাংলা পুস্তক রচনার জন্য ব্যয়িত হবে।

দ্বিতীয়—বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বর্তমান বিচারকদের নিয়ে এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত

হবে। কমিটির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা এঁদের থাকবে।

তৃতীয়—বর্তমান সম্পাদক বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রই কমিটির সম্পাদক বহাল থাকবেন।

চতুর্থ—কমিটির অনুমোদনে যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হবে, হেয়ারের স্মৃতিকে চিরন্তন করে রাখবার জন্য তাদের প্রত্যেকটির আখ্যাপত্রে 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড রচনা' এই কথাগুলি লিখিত থাকবে।

পঞ্চম—কমিটি যে-রচনা অনুমোদন করবেন তাতে গ্রন্থকারেরই স্বত্ব থাকবে।

ষষ্ঠ—সভা-সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তির ব্যয় হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড থেকেই মেটানো হবে।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবু রামগোপাল ঘোষ কার্যভার ত্যাগ করলেন। বাবু শিবচন্দ্র দেব বিচারকমণ্ডলীর একজন সদস্য নির্বাচিত হলেন এবং সম্পাদককে রামগোপাল ঘোষের জায়গায় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল।

কমিটির তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল :

১। বাবু শিবচন্দ্র দেবের : 'আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান' বা 'অধ্যাত্ম-বাদের ভূমিকা'।

২। বাবু গোপীকৃষ্ণ মিত্রের : 'মহিলাবলী' বা 'আদর্শ মহিলা-চরিত'।

৩। বামাবোধিনী পত্রিকার নির্বাচিত অংশ সঙ্কলন : বাবু শিবচন্দ্র দেব কর্তৃক বিভিন্ন বিষয় অনুযায়ী যথাযথভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত।

৪। হিন্দু মহিলাদের রচনাসংগ্রহ।

৫০। বাবু প্রাণনাথ দত্তচৌধুরী বিরচিত হস্তশিল্প এবং চারুকলা শিক্ষাবিষয়ক নির্দেশ-পুস্তিকা [শীঘ্র প্রকাশিতব্য]

অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে, শিক্ষাপরিষদ বা হিন্দু কলেজের কার্যনির্বাহক সমিতি কেউই হেয়ারের মৃত্যুর পর যথোপযোগী কার্যসূচী গ্রহণ করেননি। (শুধু) হিন্দু কলেজ কার্যনির্বাহক সমিতির ১৩ই জুন, ১৮৪২-এর কার্যক্রমে হেয়ার স্কুলে একজন পরিদর্শক নিয়োগ-প্রসঙ্গে 'বিদ্যালয়ে তাঁর অমূল্য অবদানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।'

শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক বাবু রসময় ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুনের চিঠিতে (সংখ্যা: ১৬৯০) লিখেছেন :

'মনে হয় এই বিদ্যালযে (স্কুল সোসাইটির পটলডাঙাস্থিত ইংরেজী বিদ্যালয়ে) যা ছাত্র ভর্তি কবাবার তা সম্পূর্ণভাবে মিঃ হেয়ারই এতদিন করিয়েছিলেন ; ছাত্ররা বিদ্যালয়েব বেতন হিসাবে বা বইপত্র, কাগজ-কলমের জন্য কিছুই দিত না, বিদ্যালয়ের যা কিছু নিয়মশৃঙ্খলা তা হেয়ার ব্যক্তিগতভাবে একাই রক্ষা করতেন। সরকারের নির্ধারিত পাঁচশ টাকার বেশি যদি দৈবক্রমে খরচ হোত, তাহলে নিজের টাকা থেকেই তিনি সে খরচ মেটাতেন।'

আলোচ্য বিদ্যালয়টির রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত প্রকল্পটিকে মঞ্জুর কবতে গিয়ে সাধারণ বিভাগ (General Department) ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন যে চিঠিটি লিখেছিলেন, তাতে বলা হয়েছে :

যে-বিদ্যায়তনটির কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে মুখ্যত একটি ব্যক্তিরই (হেয়ারের) প্রযত্নে এবং দক্ষতায় তার এই

রকম উন্নতি সম্ভবপর হয়েছে। তাঁর বিয়োগে শিক্ষাজগতের যে ক্ষতি হয়েছে, বর্তমান উপলক্ষে, সপরিষদ গভর্নর সে জন্ত গভীর দুঃখ প্রকাশ না করে পারছেন না।'

১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় হিন্দু কলেজ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিকে পুরস্কার দানের জন্য টাউনহলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন বাংলাদেশের লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর এফ. জে. হ্যালিডে। এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ এবং শিক্ষাপরিষদের বিগঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি ডেভিড হেয়ারের স্মৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন; তিনি বললেন যে বর্তমানে হেয়ারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন তাঁর কাছে আরো গভীরভাবে প্রয়োজনীয় বলে অনুভূত হচ্ছে, কারণ হেয়ারের কাছে যে-কলেজ বিশেষভাবে ঋণী, সেই হিন্দু কলেজের নাম নূতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হতে চলেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

স্মৃতিচারণ

১। সি. গ্রান্ট মহোদয় :

পদব্রজে ভ্রমণের অসাধারণ ক্ষমতা

মিঃ হেয়ারের দৈহিক গঠন অবশ্যই ছিল অসামান্য স্বাস্থ্য-দীপ্ত। তাঁর শারীরিক সহনশীলতাও ছিল অসাধারণ। এর উদাহরণ হতে পারে এমন একটি ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। মিঃ আর্নেস্ট গ্রে বলে নামে একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হেয়ার এক সঙ্গে থাকতেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁরা টেবিলের চারধারে বসেছিলেন। হেয়ারের পাশেই একজন তরুণ অতিথি চা-পান করছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে হাঁটার অভ্যাসের কথা উঠল; সেই সময় কোন মন্তব্যেই হোক বা কোন সূক্ষ্ম রসিকতায় প্ররোচিত হয়েই হোক, হেয়ার সেই তরুণ অতিথিটিকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন. তাঁর হাঁটবার ক্ষমতার একটা পরীক্ষা হয়ে যাক। সেই তরুণ ভদ্রলোক তক্ষুনি চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করলেন। তাঁরা দু-জনে তখন যাত্রা শুরু করলেন এবং হাঁটতে হাঁটতে ব্যারাকপুর (১৪ মাইল) পর্যন্ত গেলেন; সেখান থেকে আবার হাঁটতে হাঁটতেই তাঁরা ফিরে এলেন। মিঃ গ্রে'র বাড়ি হেয়ার স্ট্রীটে অবস্থিত ছিল (আমাদের বিশ্বাস মিঃ হেয়ারের নামানুসারেই পরবর্তীকালে রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে) সেখানে যখন তাঁরা পৌঁছলেন তখন হেয়ারের তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীটি দস্তুরমতো হাঁফিয়ে পড়েছেন;

হেয়ার নিজে তাঁর যে কিছুই হয়নি তা দেখাবার জন্য গ্রে'র বাড়ির দরজা পর্যন্ত রাস্তা দৌড়ে গেলেন।

সাদাসিধা আহার

হেয়ার সাদাসিধে ধরনের পরিমিত আহার পছন্দ করতেন। তিনি মাখন খেতেন না; (ঠাট্টা করে) বলতেন, মাখন খালি গরুর গাড়ির চাকাতেই লাগানো চলে। তখনকার দিনে কলকাতায় যে মাখন পাওয়া যেত তা অত্যন্ত বাজে ধরনের। মাখনওয়ালার বাড়িব দরজার কাছে লোকের যাতায়াতের রাস্তার দম আটকানো ধূলোর মধ্যে আদিম গ্রাম্য প্রথায় মাখন তৈরি হওয়ার দৃশ্য তখন দেখা যেত। এই গুলিকে লক্ষ করেই খুব সম্ভবত হেয়ার ঐ কথাগুলি বলেছিলেন।

২। বাবু রাজনারায়ণ বসু :

রোগশয্যায় ছেলেদের দেখতে যেতে না পাওয়ায় বিরক্তি

একবার আমি জ্বর থেকে ভালো হয়ে যাবার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই, তাতে তিনি আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, কেন আমি তাঁকে আমার অসুখের খবর দিইনি, তাহলে তো তিনি ওষুধপত্র নিয়ে আমায় দেখতে যেতে পারতেন।

তিনি নিজের হাতে ছেলেদের গা মুছিয়ে দিতেন।

প্রায়ই তাঁকে বিকেলে ছুটির সময় বিদ্যালয়ের দরজার গোড়ায় তোয়ালে হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। ছেলেদের গায়ে কোন ময়লা আছে কিনা দেখার জন্য তিনি তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘষে দেখতেন। যেসমস্ত জাতের লোক নোংরামির জন্য কুখ্যাত তাদের ছেলেদের মধ্যে পরিষ্কার

পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা এইভাবে তিনি করতেন।

৩। বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত :

শিশু-প্রীতি

আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন আমার ঠাকুরদা নীলু দত্তের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারের বাড়িতে যেতাম। দুই বৃদ্ধ শান্ত হয়ে বসে আলাপ-আলোচনা করতেন, আর সারা বাড়িময় আমি ঘুরে বেড়াতাম—দিনের সেই অংশটা আমাব সবচেয়ে ভাল কাটত।

হেয়ারের নামাঙ্কিত একটি ঘড়ি আমার কাছে এখনও আছে।

হেয়ার বেত মারা অপছন্দ করতেন

আমার বয়স যখন ছয় কি সাত, তখন আমি পুরনো হিন্দু কলেজ (এখনকার হিন্দু স্কুল)-এর ছাত্র ছিলাম। সেখানে আমাকে একজন এদেশীয় শিক্ষকের কাছে পড়তে হোত। তাঁর ধারণা ছিল পাথর থেকে যেভাবে আগুন বের করা হয়, ঠিক সেইভাবে ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। এ ধারণা যে একেবারে ভিত্তিহীন তা অনেকদিন আগেই প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তখনকার দিনে কেবল এখানে নয়, সব জায়গাতেই এই ধারণাটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হোত। যাঁরা লে হাণ্টের আত্মচরিত পড়েছেন তাঁরা মনে করতে পারবেন আগেকার দিনে ইংলণ্ডের শিক্ষায়তনগুলিতে এই ধারণাটি কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্রাইষ্ট হস্‌পিট্যালের বয়ার ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকটির আদর্শস্থানীয়। বার্ষিক পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসত

আমাদের সুযোগ্য শিক্ষক মহাশয়টি তাঁর শাস্তির মাত্রা নিয়মিতভাবে তত বাড়িয়ে যেতেন। তাই পরীক্ষার যখন আটাশ দিন বাকি থাকত, তখন প্রত্যেকটি ভুলের জন্য আমাদের দু'ঘা বেত খেতে হোত, যখন ছাব্বিশ দিন বাকি থাকত, তখন, তিন ঘা, আবার যখন চব্বিশ দিন বাকি, তখন বেতের বরাদ্দ চার ঘা। এই ভাবে প্রায় শেষের দিকে প্রত্যেক ভুলের জন্য আমাদের বরাদ্দ হোত দশ বারো ঘা। আমার মনে আছে একবার যখন (প্রত্যেক ভুলের জন্য) আট ঘা বেত খাবার দিন, সেই দিনই আমি একটা ভুল করেছিলাম। কিন্তু শিক্ষকের সম্মানে একথা আমার বলা উচিত যে আমায় একঘা মাত্র বেত খেতে হয়েছিল। ক্লাশের মধ্যে আমিই ছিলাম সবকনিষ্ঠ। প্রথম ঘা খেয়েই আমি এত কাঁদতে লাগলাম যে তিনি বললেন, বাকিগুলো পরের জন্য জমা রইল; আমার নামে ঋণ হিসাবে সেগুলি জমা থাকবে, পরে পুরোপুরি তিনি আমার কাছ থেকে তা আদায় করে নেবেন। অবশ্য আজ পর্যন্ত তিনি সে ঋণ আদায়ের জন্য আমার কাছে হাজির হননি। যাক, বর্তমানে আমি বলতে চলেছি অন্যকথা। শিক্ষক মহাশয় গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনগুলোতে যে-তালপাতার পাখা দিয়ে হাওয়া খেতেন, সাধারণত তার বাঁট দিয়েই আঘাত করার কাজটা সুসম্পন্ন করতেন। একদিন তিনি একটি ছেলের উপর অস্বাভাবিক রকম নির্মম হয়ে উঠেছিলেন; তাকে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছিলেন। যেভাবেই হোক ব্যাপারটা হেয়ারের কানে উঠল। তিনি প্রতিদিন কলেজের প্রত্যেকটি ক্লাশ ঘুরে ঘুরে দেখতেন। পরের দিন বিকালবেলা যখন

তিনি ক্লাশে এলেন তখন তাঁর মুখে এক অদ্ভুত ধরনের হাসি দেখা গেল। শিক্ষকটির চেয়ারে বসে তিনি অনেকক্ষণ ধরে তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করতে লাগলেন। আমি জানি না তিনি কি নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলেন। ছাত্ররা সবাই তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। তবে আমার এটুকু মনে আছে যে হেয়ার হাসছিলেন এবং আমাদের শিক্ষক মহোদয়টিকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল। অবশেষে, তিনি বিশেষ ধরনের একটি পকেট ছুবি বার করলেন। সার ওয়াল্টার স্কট সাধারণত, এই ধরনের ছুরি সঙ্গে রাখতেন এবং সেজন্যে এট্রিক মেষপালক হগ বালক বয়সে তাঁর নাম করণ করেছিল 'সুন্দর ছুরিওয়ালা মানুষ'। যাই হোক, হেয়ার সেই ছুরি দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে পাখার হাতলটি কেটে দিলেন। তারপর তিনি উঠলেন, ক্লাশের দিকে অর্থপূর্ণভাবে তাকালেন, এবং উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তারপর ভবিষ্যতে শিক্ষকমহাশয়টি যাতে হাওয়া খেতে পারেন সেজন্য সেই হাতলবিহীন তালপাখাটি নত হয়ে তাঁর হাতে দিলেন।

হেযা’বব সাহসিকতা

হেয়ার বালকদের সামনে সর্বদাই সাহসিকতা এবং পৌরুষের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। এ ধরনের একটি উল্লেখ্য ঘটনার কথা আমার মনে আছে। পেশীবহুল বিরাট চেহারার, পালোয়ান গোছের একটা মাতাল নাবিক একদিন কলেজের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কলেজের গেটের কাছে একজন ছাত্রের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। নাবিকটি কি খেয়ালে কে জানে, সেই গাড়ির কোচোয়ানের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল। কোচোয়ান এবং সহিসেরা তো দৌড়ে পালাল।

তারপর সেই মাতাল নাবিক কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে একটা মোটা লাঠি তুলে নিয়ে গাড়িটা ভাঙতে শুরু করল। সংস্কৃত কলেজের দোতলায় জানালার পেছনে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে আমি আমার মতো পুঁচকে আরো দু'তিনজনের সঙ্গে ব্যাপারটা দেখছিলাম। সংস্কৃত কলেজের দারোয়ানেরা বেরিয়ে এসে বাধা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু মাতালটা যখন তার সেই ভীষণদর্শন তাড়াতাড়ি তৈরী করে ফেলা মুগুরটি নিয়ে তাদের দিকে তেড়ে এল, তখন তারা আর নিজেদের আশ্রয়ে পালিয়ে যাবার পথ পেল না। গাড়িটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হল ; বিজয়ী নাবিক মুগুরটি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল। সে যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে, তখনই দূরে হেয়ারের পাল্কিটিকে আসতে দেখা গেল। দারোয়ানেরা আবার আগের মতই চটপটে হয়ে দাঁড়াল। হেয়ার তখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'এসব কি ? এই গাড়িটা কে ভেঙেছে ?' তখন তারা ব্যাপারটি তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে বলল যে মাতালটা চলে গেছে। বৃদ্ধ হেয়ার তখনই তীরবেগে বেরিয়ে গেলেন। দশ মিনিটের মধ্যে লোকটিকে পাকড়াও করে পুলিসের কাছে সমর্পণ করা হল।

কুলিদের মুক্তিসাধন

যেভাবে অসীম সাহস দেখিয়ে তিনি একদল কুলিকে উদ্ধার করেছিলেন, তা আরো প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এই কুলির দলটিকে প্রলোভন দেখিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠনঠনিয়ার কাছে একটি বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ঠিক ছিল যে পরে জাহাজে করে তাদের মরিশাসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমার ধারণা, পরে ব্যাপারটি পুলিসী অনুসন্ধানের

বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিদ্যালয়ে যাবার পথে হতভাগ্য কুলিদের আমি দেখতে পেতাম, তবে এদের উদ্ধারকার্য আমার চোখে দেখা হয়ে ওঠেনি। সমস্ত ঘটনাটা আমার আবছা-আবছা মনে পড়ে।

হেয়ারের উদারতা

হেয়ারের সংস্পর্শে যিনি এসেছেন তিনিই তাঁর চরিত্রের মহৎ দিকগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অসংখ্য বালককে তিনি টাকাকড়ি, জামা-কাপড়, কিংবা বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। অগণিত বালক তাঁর সৎপরামর্শ এবং মৃদু ভর্ৎসনায় লাভবান হয়েছে, অসুখেবিসুখে তাঁর সেবা শুশ্রূষা পেয়ে ধন্য হয়েছে। এই একটি লোক, যিনি ধনবানও ছিলেন না, কৌশলীও ছিলেন না—একা শুধুমাত্র নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কতখানি মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন, তা কি পৃথিবীর কাছে কোনদিন উদ্‌ঘাটিত হবে?

হেয়ারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

হেয়ারের মৃত্যুর সুস্পষ্ট স্মৃতি আমার মনে গাঁথা আছে। তিনি তখন স্মল কজেস কোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং আমার পিতার একজন সহকর্মী ছিলেন। তাঁর মৃতদেহ সেই দিন আমি তিনবার দেখেছিলাম, এবং তাঁর শবযাত্রায় অনুগমনও করেছিলাম। সেইদিন প্রবল ধারাবর্ষণে রাস্তাগুলি আংশিক-ভাবে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। পরদিন উঠল প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা। শতশত লোকের বিপুল জনতা শান্ত হয়ে হেয়ার স্ট্রীট থেকে চলল কলেজ স্কোয়ার পর্যন্ত। এদের মধ্যে ছিল অফিসের কেরানী, নানাধরনের বিদ্যায়তনের ছাত্ররা, এদেশী ভদ্রলোকেরা, চাকর-বাকর, সরকার এবং তাঁর নিজের দেশের লোকেরা

(অবশ্য তাঁর স্বদেশবাসীরা সংখ্যায় খুব কম ছিলেন)। আমি তখন নিতান্ত ছোট। তাই ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে সমাধিস্থলের পাশে দাঁড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমার কেবল সেই দীর্ঘ শবযাত্রাটির কথা মনে আছে, আর মনে আছে এই শবযাত্রা দেখবার জন্য লোকেরা বাড়ির উপরে কিংবা জানালায় কি রকম ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। কলেজ স্কোয়ারে আমি যখন দেখলাম যে তাঁর শবাধারের কাছে ঘেঁষতে পারব না, তখন সংস্কৃত কলেজে চলে গিয়ে একেবারে ছাদে উঠলাম। সেখানে সম্পূর্ণ একা দাঁড়িয়ে সমস্ত দৃশ্যটি একনজরে চমৎকারভাবে দেখে নিলাম। কি বিষণ্ণ, শোককরুণ সেই দৃশ্য! কিন্তু তার থেকে শিক্ষা পাওয়ার কিছু আছে।

হেয়ারের ধর্ম

হেয়ার আমাদের পবিত্র ধর্মের নীতিগুলিতে বিশ্বাস করতেন না, তাঁর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ কখনো কখনো আনা হয়েছে। এই সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার কখনও কথাবার্তা হয়নি। তিনি যখন মারা যান তখন আমি নিজে খ্রীশ্চান ছিলাম না। থ্যাকারের এসমণ্ডে ক্যাসল্‌উডস্থ মন্ত্রী মিঃ বেনসন যেমন বলেছিলেন আমিও এ সম্পর্কে কেবল সেই রকমই বলতে পারি; 'আমি জানি না কর্নেল-এর ধর্মমত কি ছিল, কিন্তু তাঁর জীবন ছিল একজন খাঁটি খ্রীশ্চানের জীবন।'

৪। বাবু রামতনু লাহিড়ী :

মেডিক্যাল কলেজে হেয়ারের অবদান

রসিকের সহায়তায় মেডিক্যাল কলেজের জন্য হেয়ার কি করেছিলেন, আশা করি আপনারা তা জানেন।

ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তা জানা থাকতে পারে; আমার বিশ্বাস তিনিও এঁদের কাজে সহায়তা করেছিলেন, কারণ তিনি বোধহয় তখন স্কুল সোসাইটি পরিচালিত বিদ্যালয়টির একজন শিক্ষক ছিলেন। হেয়ার চাইতেন না যে বিদ্যালয়টির নামকরণ তাঁর নামে হোক, কিন্তু লোকে তা শোনেনি।

জঘন্য নোংরা জায়গাতেও হেয়ার অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যেতেন

'র' বলে পুরনো হিন্দু কলেজের একটি গরীব ছেলে কলেরা বা ঐ ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। হেয়ারের পাল্কিতে সবসময়ই ওষুধ মজুত থাকত, তিনি তার থেকে এক মাত্রা ওষুধ ছেলেটিকে দিলেন। প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি ছেলেটির বাড়িতে এসে হাজির হলেন সে কেমন আছে খোঁজ নিতে। বাড়ির লোকেরা ভয়ে কিছুতেই দরজা খুলতে চায় না। মাতাল নাবিকেরা মাঝেমাঝে রাত্রিতে সেখানে ঘোরাফেরা করত; তারা ভেবেছিল সেই নাবিকেরাই হয়তো দরজায় ধাক্কাধাক্কি করছে। হেয়ারও সেই রকম সন্দেহ করে চেঁচিয়ে নিজের নাম বললেন এবং কি জন্য তিনি এসেছেন তা-ও বুঝিয়ে দিলেন। যেখানে তিনি গিয়েছিলেন, কল্পনা করা যায় না কি রকম নোংরা ছিল সেই জায়গাটি। আর একবার 'র' প্রবল জ্বরে কিছুদিনের জন্য ভুগছিল। সে তেঁতো কুইনাইনের গুড়ো গিলতে পারত না বলে হেয়ার সেই পাউডারকে পিলের আকারে পরিবর্তিত করে তার কাছে নিয়ে গেলেন। সেখানে রোগীর হাতে ওষুধ দিলে, সে তাঁকে ওষুধ খাবে বলে প্রতিশ্রুতি দিল, কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার কথা, তা না করে সে একজন কবিরাজকে নিযুক্ত করল। কুইনাইনের উপযোগিতায় তার বিশ্বাস

ঠনঠনিয়ার কালীবাড়ির কাছে একটা চোর একটি শিশুর গা' থেকে অলঙ্কার চুরি করেছিল। তাকে তাড়া করতে গিয়ে হেয়ার কিভাবে মাথায় লাঠির আঘাত খেয়েছিলেন, তা অনেকেই ভালোভাবে জানেন। এই ঘটনার পর তাঁকে বেশ কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী নই বলে ঘটনাটির আভাস মাত্র দিলাম।

৫। বাবু চন্দ্রশেখর দেব

[illegible] মত আচরণ

হেয়ারের সঙ্গে সম্পর্কিত যে কাহিনীটির কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তা আমার মনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে আজ পঞ্চাশ বছরেরও বেশি দিন পরে সেই স্মৃতি আমার কাছে অম্লান হয়ে আছে।

(সেইদিন) আমি যখন তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। আমাকে দেখেই তিনি আমার পরবার জন্য একটি তোয়ালে এনে দিলেন। আমি আপত্তি করতে লাগলাম, কারণ আমার নগ্নতা ঢাকবার মতো যথেষ্ট বড়ো ছিল না তোয়ালেটা। তারপর একটা টেবল ক্লথ এনে তিনি নিজের হাতে সেটা আমায় পরিয়ে দিলেন, তার সঙ্গে নিজের একটা রুমাল দিয়ে আমার মাথাটাও মুছিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার ধুতিচাদরগুলো শুকনো করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তিনি নিজের হাতে সেগুলির জল নিংড়ে দিলেন; তারপর তাঁর বেয়ারার হাতে সেগুলি দিলেন নিচে নিয়ে গিয়ে একটা শুকনো জায়গা দেখে রেখে দিতে; পরে বৃষ্টি যখন থেমে

গেল তিনি চার্চের দিকের বারান্দা পরিষ্কার করে নিজের হাতে কাঁপড়-চাদরগুলি রৌদ্রে মেলে দিলেন শুকোবার জন্য। এইসব করবার সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিক মেশিন আর গ্যালভানিক ব্যাটারি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা বলে তিনি আমায় আনন্দ দিলেন।

আরো একটি ঘটনার কথা আমার মনে আছে। সেবার তাঁর কাছে গিয়েছিলাম বিকেল বেলায়। তাঁর বাড়িতে পৌঁছবার পরই ভীষণ বৃষ্টি শুরু হল। আলো জ্বালা হবার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ল, তারপর তাঁর খাবার সময় এসে গেল। আমি বাড়ি ফিরতে চাইলাম, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ছাড়া পাওয়া গেল না। তাঁর বাড়ির দরজার গোড়াতেই এক মুদির দোকান ছিল, তিনি সেই মুদিকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন আমি সন্দেশ বা অন্য আরো মিষ্টি আর কলা ইত্যাদি যত খেতে পারি তা আমায় দিতে। দোকানে পেট ভরে খেয়ে-টেয়ে ফিরে দেখি তিনি তখনও খাচ্ছেন। তাঁর নির্দেশে আমাকে তাঁর পাশে বসতে হল। প্রায় সাড়ে আটটা নটার সময় একটা লাঠি হাতে নিয়ে তিনি আমাকে বললেন তাঁর সঙ্গেসঙ্গে যেতে। আমি তাঁর পাশে পাশে চলতে লাগলাম; তিনি ছোটদের ভাললাগে এ-ধরনের, এই একটা, ওই আরেকটা বিষয়ে গল্প করতে করতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চললেন। এইরকমভাবে চুনাগলিতে এসে পৌঁছবার পর, তাঁর মধ্যে আমি ভয়ের চিহ্ন দেখলাম। তিনি আমাকে বলে দিলেন যে এই জায়গাটা হল মাতাল লোকদের আড্ডা মারবার জায়গা; আমাকে নিরাপদ রাখবার জন্য তাঁকে হয়তো তাদের সঙ্গে মারামারি

করতে হবে, তবে শয়তানগুলোর সঙ্গে লড়াই-এর ফল কি হবে তা তিনি বলতে পারেন না। যাক এই রকমভাবে তো আমরা পটলডাঙার পুরনো থানার কাছে এসে উপস্থিত হলাম। এখন কলেজ স্ট্রীটে, যেখানে হেয়ারের সমাধি রয়েছে, তার প্রায় উল্টোদিকে ছিল হেয়ারের দেওয়ান বৈদ্যনাথ দাসের বাড়ি। আবাব তার ঠিক উল্টোদিকে ছিল পটলডাঙার পুবনো থানা। নতুন রাস্তাগুলো তখনো তৈরি হয়নি, আশেপাশের বাস্তা ছিল ভীষণ সরু আর নোংরা। এখানে পৌঁছে তিান আমায বলে দিলেন যে, আমার বাড়ি সেখান থেকে একশ গজের বেশি দূর নয় এবং আমি বোধহয় সেখান থেকে একাই বাড়ি ফিবতে পারব। আমি 'নিশ্চয়ই' বলেই বাড়ির দিকে দৌড লাগালাম। তিনি কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না, সোজা (আমার বাড়ির) দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমাদের বাড়িটা ঠিক কোথায় তা তিনি জানতেন না। তাই রূপনারায়ণ ঘোষালের বাড়ির দক্ষিণপূব কোণে দাঁড়িয়ে তিনি 'চন্দর, চন্দব' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করলেন। আশেপাশেব লোকেরা আবার তাঁর কথা বুঝতে পারছিল না। আমার বাবা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলেন হেয়ার সাহেব আমাকে চাইছেন কিনা। তিনি উত্তরে বললেন, 'না, আমি শুধু জানতে চাইছি সে নিরাপদে বাড়ি ফিরেছে কিনা।' সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তিনি আবার ফিরে চললেন।

হিন্দু কালেজের জন্য হেয়ারের পরিশ্রম

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে আমার বয়স ছিল আট বছর। সেই বছরই বোধহয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের এই

শিক্ষায়তনটিকে গড়ে তুলতে তিনি কি পরিশ্রম করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমার অবশ্য কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই। কিন্তু আমি শুনেছি কি কঠোর পরিশ্রম তিনি করেছিলেন এই লক্ষ্যকে চরিতার্থ করবার জন্য, আক্ষরিক অর্থেই ভিক্ষাপাত্র হাতে দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। বর্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালবাসতেন। আমার বাড়ির খুব কাছেই এমন দু'তিনটি জায়গা ছিল যেখানে মরসুমের সময় ভালোভাবে ঘুড়ি ওড়ানো দেখবার জন্য তিনি প্রায়ই আসতেন। ১৮১৮ সালের বোধহয় কিছু আগে তিনি এরকম একটা জায়গায় এসেছিলেন। আমি শুনেছি যে হেয়ার সেখানে গিয়ে তাঁকে ধরলেন; তারপর তাঁব সঙ্গে কলেজ সম্পর্কে কথাবার্তা চালাবার পর প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলেন যে পরের দিন রাজা কলেজ পবিদর্শনে যাবেন। এসব অবশ্য আমার শোনা কথা, কেননা সে সময় আমার বয়স ছ'বছর কি সাত বছর।

হেয়ার সবসময়েই গরীব ছাত্রদের ভর্তি করতে চাইতেন

আমার বড় ভাই নিজে তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ত। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কোনসময়ে সে আমাকে কলেজে ভর্তি করতে গিয়ে শুনল যে আগামী কয়েকমাসের মধ্যে আমার ভর্তি হবার কোন সম্ভাবনা নেই; কেননা এমন কোন সিট খালি নেই, যার জন্য স্কুল সোসাইটির সম্পাদক হিসাবে তিনি (অর্থাৎ, হেয়ার) আমায় মনোনীত করতে পারেন। ভর্তি হবার জন্য কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই যেদিন প্রধান বিচারপতি ঈস্ট এবং অন্যান্যদের কাছে বালকদের পরীক্ষা ছিল তিনি নিজে মিঃ আনসেলেমের টেবিলে বসে একটি চিঠি লিখে ল্যাডলীমোহন

ঠাকুরকে দিয়ে সেইটি সই করিয়ে নিলেন। এইভাবে দু'তিনদিন পরেই আমি কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলাম। অনুসন্ধান করে দেখবেন, এরকম অনুগ্রহ শুধুমাত্র আমাকেই দেখানো হয়নি। তাঁকে কোন অনুরোধ করা হলে তিনি কখনও তা রক্ষা করতে রাজী হতেন না—কিন্তু যত দৃঢ়ভাবে তিনি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতেন ঠিক ততটা নিশ্চিতভাবে তাড়াতাড়ি সেই কাজটি করে দিতেন।

৬। বাবু চন্দ্রকুমার মৈত্র :

আমি যখন হেয়ারের বিদ্যালয়ে ছিলাম, তখন তাঁর মানবিকতায় এবং প্রশস্ত হৃদয়ের ঔদার্যে সমৃদ্ধ চরিত্রের বহু বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে। বর্ষণ-মুখর একটি দিনে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছিল। বিকেল চারটে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত বাতাস বইছিল প্রবল বেগে। তাঁর কাছে খবর এল, জনৈক রাধানাথ সেন সবিরাম জ্বরে ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়েছেন। রাধানাথ সেন তখন থাকতেন বাগবাজারে স্বর্গত লোকনাথ বসুর পরিবারে। খবর যখন এল, আমি তখন স্কুলে ছিলাম। হেয়ার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি সেই অঞ্চলে থাকি কিনা। আমি 'হ্যাঁ' বলাতে, তিনি আমাকে বললেন তাঁর সঙ্গে যেতে। রাত্রি প্রায় ন'টায় সময় গাড়ি ভাড়া করে আমরা চললাম। রাধানাথ সেনের বাড়িতে আমরা ছিলাম প্রায় দু'ঘণ্টা; এর মধ্যে যতটা চিকিৎসা করা সম্ভব তিনি করলেন।

এমন অসংখ্য ঘটনার কথা আমি জানি যাতে স্কুলের ছাত্রেরা অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি নিজে অর্থব্যয় করে সবরকমভাবে তাদের চিকিৎসা করিয়েছেন, এমনকি পথ্য

কেনবার জন্য তাদের পয়সা পর্যন্ত দিয়েছেন। বিশেষত বর্ষার দিনে তিনি কখনও ছাত্রদের বৃষ্টিতে ভিজতে দিতেন না। তার বদলে টিফিনে তাদের মিষ্টি দিতেন, আর গাড়ি ভাড়া করে, কিংবা ছাতাওয়ালাদের পয়সা দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। এর সঙ্গে যোগ করতে পারি আমার নিজের কথা। আমার যখন অসুখ করেছিল, তখন আমার পরিচর্যা তিনিই করেছিলেন।

৭। বাবু শিবচন্দ্র দেব :

তার বিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি তার আচরণ ছিল [illegible] [illegible]

হেয়ার সম্পর্কে বলা হোত যে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির স্কুলের (এখন এর নাম হেয়ার স্কুল) ছাত্রদের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে স্কুলটি পরিচালিত হোত তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে; তাই এই বিদ্যালয়টির কল্যাণের জন্য তাঁর বেশি উৎসাহ দেখানোই স্বাভাবিক। তখনকার দিনে চালু কতকগুলি নিয়মের বলে কিছু বিনা বেতনের ছাত্র এখান থেকে হিন্দু কলেজে (এখনকার হিন্দু স্কুলে) পড়তে যেত; আগের স্কুলে তারা যখন পড়ত, তখন তিনি যেমন তাদের মনোযোগ দিয়ে দেখতেন, এখানেও তাই করতেন। লোকে তাই ঠাট্টা করে এইসব ছেলেদের 'হেয়ারের পোষ্যপুত্র' নাম দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর কল্যাণ-কামনা কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের জন্যই সীমিত ছিল না, সকলের জন্যই তা ছিল অকুণ্ঠভাবে প্রসারিত।

সফলকাম ছাত্ররা তাঁর কাছ থেকে পেত উৎসাহ। এর প্রমাণ হিসাবে আমি আমার সঙ্গে জড়িত একটা ঘটনার কথা

বলি। তখন আমি হিন্দু কলেজে চতুর্থশ্রেণীর ছাত্র। একদিন ক্লাশে বসে আছি, এমন সময় হেয়ার সেখানে এসে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর ইংরেজী-বাংলা অভিধানের একটি কপি আমায় উপহার দিলেন। বইটি তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘটনায় আমি খুবই বিস্মিত হলাম, কারণ আমি ছিলাম কলেজের বেতনদায়ী ছাত্র; সেসময় হেয়ারের সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্যই ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ উপহারের উপলক্ষ কি? তিনি তখন জানালেন যে, দিনকতক আগে কয়েকজন ভদ্রলোক যে-পরীক্ষা নিয়েছিলেন, তাতে আমার ফলাফলে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছেন। তাঁর সেই আনন্দের স্বীকৃতিই হ'ল এই উপহার। তখন থেকেই তিনি আমার ভাল মন্দে অতিশয় উৎসাহ দেখাতে লাগলেন। তাঁর পরামর্শেই আমি একটি বৃত্তির জন্য আবেদন পাঠিয়েছিলাম, তারপর প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লাভ করেছিলাম সেই বৃত্তি।

৮। বাবু গোপীকৃষ্ণ মিত্র :

যাতে ছেলেরা কোনরকম অসৎ হয়ে উঠতে না পারে হেয়ার সর্বপ্রযত্নে তারই চেষ্টা করতেন, তাঁর তত্ত্বাবধানে ছেলেদের কল্যাণ কিভাবে সাধিত হয়, তাই দেখাই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা। পরিশ্রমীকে উৎসাহিত করা, অলসকে উজ্জীবিত করা, কর্মভ্রষ্টকে কর্তব্যের পথে ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর দিনের কর্ম, রাত্রির চিন্তা।

পলাতক ছাত্রদের ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা ছিল অসীম। সবচেয়ে অনিয়মিত হাজিরা দেয় যেসব ছাত্র, তারা কেন অনুপস্থিত থাকে তা অনুসন্ধান করে সে সম্পর্কে

রিপোর্ট দেবার জন্য তিনি কাশী মালি বলে একজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়োগ করেছিলেন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, তিনি নিজেই সশরীরে প্রায়ই হাজির হতেন তাদের বাড়িতে। সেখানে যদি তাদের না পাওয়া যেত, তাহলে হানা দিতেন তাদের আত্মগোপনের আস্তানায়। মাঝেমাঝে সে সব জায়গা এমন বিদ্‌ঘুটে হোত যে কল্পনা করা যায় না। সেখানে গিয়েই খপ করে ধরতেন তিনি তাদের। তাঁকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেত তারা। যে-উপায়ে তিনি এইসব ছেলেদের মতিগতি ফিরিয়ে আনতেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। পরবর্তী জীবনে এদের অনেকেই তাদের পিতামাতার গর্ব এবং দেশের রত্ন হয়ে উঠেছিল। এই বিস্ময়কর পরিবর্তনের কতকগুলি উদাহরণ আমি দিতে পারতাম, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে ফেলি, যাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে।

ধনীপুত্রদের প্রতি হেয়ারের আপাত পক্ষপাতের কারণ

এদেশবাসীদের মধ্যে যাঁরা বিত্তশালী ছিলেন, তাঁদের ছেলেদের হেয়ার একটু প্রশ্রয় দিতেন, তাদের ক্ষেত্রে অনেকখানি উদারতা দেখাতেন তিনি। এমনকি তাদের বাড়ির উৎসবে পর্যন্ত তিনি যোগদান করতেন : যেন আপন উপস্থিতি দিয়ে তাদের সমস্ত ত্রুটি সংশোধন করতে চাইতেন। যখন সেখানে থাকতেন আহার হিসাব শুধুমাত্র নারকেল দুধ আর ফলমূল খেয়ে মিতাচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন।

একবার যখন তাঁর কয়েকজন ছাত্র বড়োলোকদের প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের প্রতিবাদ জানাল, তিনি শুধু হাসলেন। তিনি বললেন যে তাঁর এই ধরনের আচরণের

পিছনে নিশ্চয়ই এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর কাছ থেকে দেশ অপরিমেয় সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। এখন তারা ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে। তাই তাঁর অক্লান্ত সাধনাই হ'ল কি করে এদের স্কুল আর কলেজের দিকে আকৃষ্ট করা যায়। তাঁর পরেও জীবিত ছিলেন তাঁর সমসাময়িক এমন অনেকে নিশ্চয়ই জানতেন সার্থকতায় কতটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তাঁর এই প্রচেষ্টা। গোঁড়া এবং সংস্কারান্ধ, এমন অনেক অর্থবান পিতা ছিলেন যাঁরা আগে ছেলেকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা চিন্তাও করতেন না, কিন্তু হেয়ারের পিতৃসুলভ তত্ত্বাবধানে তাদের পাঠাতে তাঁদের মনে কোন দ্বিধা থাকত না। তাঁরা মনে করতেন চিন্তায়, অনুভবে এবং কারুণ্যে হেয়ার হিন্দুই।

৯। বাবু নন্দলাল মিত্র :

সহায়হীনের মঙ্গলসাধন

ডেভিড হেয়ারের মানব-কল্যাণকামী আত্মার পরিচয় মিলবে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা থেকে। একদিন তিনি আর তাঁর এদেশী এক বন্ধু বসেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের এক ঘরে। এমন সময় এক দরিদ্র বিধবা এসে প্রার্থনা জানাল তিনি যেন তার একমাত্র ছেলেকে তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি করে নেন। তিনি জানালেন যে তাঁর পক্ষে এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়, কারণ সবচেয়ে নীচু শ্রেণী—যেখানে ছেলেটিকে ভর্তি করতে হবে, তা ইতিমধ্যেই একেবারে ভর্তি হয়ে গেছে। এই কথা শুনে সেখানেই কেঁদে ফেলল বিধবা মহিলাটি, তারপর ছেলের মন্দ ভাগ্যের জন্য সারা রাস্তা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে

অতি কষ্টে মন্থর পায়ে বাড়ি ফিরে চলল। হেয়ারের মন এত কোমল ছিল যে দরিদ্রের এই বিলাপে তিনি বিচলিত না হয়ে পারলেন না। তক্ষুণি তিনি তাঁর বন্ধুটির দিকে ফিরে বললেন যে বিধবাটির প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য তিনি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ঠিক হোল তিনি আর তাঁর বন্ধুটি মিলে সন্ধ্যাবেলায় সেই দরিদ্র স্ত্রীলোকটির বাসা খুঁজে বার করবেন। তাঁরা শুনেছিলেন স্ত্রীলোকটি সীতারাম ঘোষ লেনে থাকে, সেই-খানেই এসে হাজির হলেন তাঁরা। বিধবাটি যখন শুনল যে হেয়ার এবং আর একটি বাবু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, তখন সে ছেলেকে নিয়ে ঘরের বাইরে ছুটে বেরিয়ে এল তাঁদের অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। একটি কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে, বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা তার দু'গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। এই দৃশ্য দেখে উদারহৃদয় হেয়ার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কোমল অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর মন। কিছুক্ষণের জন্য তিনি কথা পর্যন্ত বলতে পারলেন না। তারপর দরিদ্র বিধবাটিকে কথা দিলেন যে তার ছেলের শিক্ষার ভার এখন থেকে তিনি নিজের হাতে তুলে নিলেন। তাছাড়া যতদিন না তার ছেলে নিজে রোজগার করতে শেখে ততদিন মায়ের এবং ছেলের ভরণপোষণের জন্য প্রতিমাসে চারটি করে টাকা তিনি নিয়মিতভাবে দিয়ে যাবেন। তাঁর এই উদারতায় বিধবাটি প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, তারপর আনন্দাশ্রু বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে আপন উপকারীর ওপর তার সমস্ত আশীর্বাদ বর্ষণ করতে লাগল; বলতে লাগল যে হেয়ার মানুষ নন, তিনি দেবদূত—ছদ্মবেশে পৃথিবীতে এসেছেন দুঃস্থের

দুর্দশা দূর করবার জন্য। হেয়ার নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসতেন না, তাই তাড়াতাড়ি সরে এলেন সেখান থেকে।

১০। বাবু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় :

আমাদের শিক্ষার জন্য হেয়ার অনেক অর্থব্যয় করতেন

স্কুল-কলেজ স্থাপনের দিকে হেয়ার গভীর মনোযোগ দিয়েছিলেন। তিনি পটলডাঙায় একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, আর ঠনঠনিয়াতে করেছিলেন আর একটি—এইটিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হোত। ঠনঠনিয়ার এই বিদ্যালয়টিতে কোন মাইনে লাগত না, সম্পূর্ণ তাঁর নিজের টাকায় স্কুলটি চলত। আমার পূর্বতন শিক্ষক এবং হেয়ারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র স্বর্গত বাবু তারকনাথ ঘোষের কাছে একদিন শুনেছিলাম, হেয়ার এদেশবাসীর উন্নতির জন্য কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি আলাদাভাবে টাকা সরিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু তাতেও যখন অর্থের ঘাটতি পড়ল তখন তিনি সাহায্য নিলেন চীনদেশবাসী তাঁর জনৈক বিত্তশালী আত্মীয়ের কাছ থেকে। অবশ্য সে আত্মীয়ও ছিলেন তাঁরই মত উদারহৃদয় এবং সহানুভূতি প্রবণ। পটলডাঙার গোলক কর্মকার বলে তাঁর একজন বেনিয়া'র নামে তাঁর যে ভূসম্পত্তি ছিল সে সবই তিনি বিক্রী করে দিয়েছিলেন। শোনা যায়, কলেজ স্কোয়ারের দক্ষিণে আর পশ্চিমে যেসমস্ত জমি রয়েছে, সে সবই নাকি একসময় হেয়ারের সম্পত্তি ছিল। স্কুলের খরচ চালানোর জন্য আত্মীয়ের কাছ থেকে টাকা চাওয়ার যে ঘটনাটি আগেই উল্লেখ করেছি তার সত্যতা আমি প্রমাণ করতে পারি হেয়ারের লেখা একটি চিঠির সাক্ষ্য দিয়ে। এই চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন চীনদেশস্থ তাঁর এক ভাইঝির কাছে।

চিঠিটি পাঠানোর আগে আমায় তিনি বলেছিলেন বানানে কোন ভুলটুল আছে কিনা দেখে দিতে।

মেডিক্যাল কলেজ

একটি ঘটনার কথা আমি উল্লেখ করব যাতে বোঝা যাবে, মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনাটি বিনা বিরোধিতায় সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করার জন্য হেয়ারের আগ্রহ কি রকম ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম, এমন সময় সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সেই সময়কার অধ্যাপক বাবু মধুসূদন গুপ্ত হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। হেয়ার তাঁকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে মধু, এতদিন কি করছিলে? তুমি জান না তোমার জন্য প্রায় এই সারা সপ্তাহ আমায় কি মানসিক অশান্তি আর উদ্বেগ ভোগ করতে হচ্ছে? আমি রাধাকান্তের কাছে গিয়েছিলাম, সে আমাকে যা বলেছে তাতে তো বেশ খানিকটা ভরসা পাচ্ছি। এখন তোমার কি বলবার আছে বল। তোমাদের শাস্ত্রে লাস কাটবার অনুমতি কোথাও দেওয়া আছে কিনা খুঁজে পেয়েছ?" মধুসূদন হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়ে বললেন, "সার, সমাজের রক্ষণশীল লোকেদের কাছ থেকে কোনরকম বিরোধিতার ভয় আপনি করবেন না। যদি তারা বাধা দিতে এগিয়ে আসে, তাহলে আমি আর আমার পণ্ডিত বন্ধুরা সে-বাধার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। তবে আমার নিশ্চিত ধারণা তারা কিছুই করবে না।" অধ্যাপকের কাছ থেকে এই কথা শুনে হেয়ার খুব আশ্বস্ত হলেন মনে হল। তিনি বললেন যে পরদিন তিনি মহামান্য লর্ডের সঙ্গে অর্থাৎ আমার যতদূর মনে আছে লর্ড অকল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করবেন।

স্কুলের এবং কলেজের ছাত্রদের গতিবিধির উপর হেয়ার কিরকম তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন একটি ঘটনা থেকে তার উদাহরণ পাওয়া যাবে। দুর্বিনীত প্রকৃতির একজন বয়স্ক ছাত্র ছিল, সে সবসময়ই হাঙ্গামা বাধাতে ভালবাসত। একদিন তার চেয়ে ছোট, মোটামুটি সুন্দর দেখতে একটি ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া হোল—বয়স্ক ছেলেটি তার সঙ্গে মিশতে চাইত, সে কিন্তু কিছুতেই তাকে পছন্দ করত না। প্রতিশোধ নেবার জন্য সে এক দেশী কাগজের সম্পাদককে দিয়ে ছেলেটির নামে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়ে সেটিকে ছাপিয়ে ফেলল। তার পরের কাজ হল কলেজের দেওয়ালে কবিতাটি সেঁটে দেওয়া যাতে প্রত্যেকে সেটি পড়ে তার শত্রুকে বিদ্রূপ করতে পারে। কার্যসিদ্ধির জন্য এক অন্ধকার, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাত্রিতে প্রায় একটার সময় কয়েকজন লোকের সাহায্য নিয়ে সে প্রবেশ করল কলেজের হলে—এদের সে নিশ্চয়ই আগে ঘুষ দিয়ে হাত করে রেখেছিল। হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে সে যখন কার্য-সিদ্ধি করতে (অর্থাৎ দেওয়ালে ছাপানো কাগজ আঁটতে) উদ্যত হয়েছে, সেই সময় আপাদমস্তক ভেজা, গা থেকে জল ঝরছে এমন অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করল এক জীবন্ত প্রাণী; বাইরে তখন মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে। কল্পনা করতে পারেন আগন্তুকটি কে? হ্যাঁ, তিনি সেই সদাজাগ্রত, সর্বত্র বিরাজমান ডেভিড হেয়ার। এই ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে সে আভাস তিনি আগেই পেয়েছিলেন, তাই যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি বিশিষ্ট ছাত্রকে কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। যে বদমাশটি তাকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ

করে তুলতে চেয়েছিল সে এক ধনী পরিবারের সন্তান, নিজের পাড়ায় সে এখন মহান লোক বলে গণ্য।

ওপরের ঘটনাটি শুনেছি হেয়ারের নিজের মুখ থেকে।

শুধুমাত্র শিক্ষায়তনগুলিতেই হেয়ারের দানপ্রবণতা সীমাবদ্ধ ছিল না, পারিবারিক ক্ষেত্রেও তা প্রসারিত হোত। দু'বার পূজার সময় আমাকে চারশ' টাকার ধুতি শাড়ি কিনে দিতে হয়েছিল, সবগুলি তিনি বিতরণ করেছিলেন। এই সব ধুতি শাড়ি যারা তাঁর কাছ থেকে পেত, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল তাঁর স্কুলের গরীব ছাত্র বা তাদের মা-বোনেরা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন উৎসবের দিনে ধনী দরিদ্র সব পরিবারেই গিয়ে হাজির হতেন হেয়ার, শহরের দেশীয় অধিবাসীদের পাড়ায় তাঁর নাম ছিল প্রায় পরিচিত প্রবাদের মতো। তাঁর প্রিয় কোন ছাত্র যদি অসুস্থ হয়ে পড়ত, তাহলে তিনি প্রত্যহ তাকে দেখতে যেতেন এবং উৎসাহের কথা বলে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করতেন। একবার অসুখে আমার নিজের জীবন সংশয় হয়েছিল। সেইসময় সদাশয় হেয়ারের উপস্থিতি আমার রোগযন্ত্রণা অনেকখানি লাঘব করেছিল।

হেয়ারের কাছে আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার ঋণ অশেষ। তিনি ছিলেন একাধারে আমাদের পিতা, বন্ধু, পরিচালক এবং উপদেষ্টা। আগের যুগের যাঁরা আজ বেঁচে আছেন, তাঁরা হেয়ারকে যতটা শ্রদ্ধার আসনে বসান, এখনকার লোকে ততটা উঁচু আসন তাঁকে না-ও দিতে পারেন; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের

পথিকৃৎ ছিলেন ডেভিড হেয়ার; তাঁদের জানা উচিত যে তাঁদের পিতৃপুরুষেরা হেয়ারের হাতেই মানুষ।

হেয়ারের সতর্কতা

ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে হেয়ারের সতর্কতা ছিল গোয়েন্দাদের মতোই নিপুণ। তাঁর জীবদ্দশায় মাহেশের স্নানযাত্রা ছিল এক লজ্জাজনক পরব। কুখ্যাত সব বিচিত্র-চরিত্র গণিকাদের নিয়ে নৌকা-বোঝাই সকল শ্রেণীর বাবুরা গিয়ে হাজির হতেন সেখানে। হেয়ার একথা জানতেন, তাই প্রত্যেক ঘাটে তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন যাতে কোন ছাত্র এই সব দলে যোগ দিতে না পারে। এইভাবে প্রায়ই তিনি পলাতকদের ধরে ফেলতেন এবং পরে তাদের শাস্তি দিতেন।

লিপিকুশলতা

তাঁর ছাত্রদের হাতের লেখা যাতে ভালো হয় সেদিকে হেয়ার গভীর উৎসাহ দেখাতেন। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তখন উন্মুক্ত ছিল না, তিনি ভালভাবেই জানতেন যে তাঁর অধিকাংশ ছাত্রকেই, বিশেষত গরীব ছাত্রদের জীবিকার্জনের জন্য হাঁসের পালক অর্থাৎ কলম-পেশার উপর নির্ভর করতে হবে। এইজন্য তিনি নিয়ম করেছিলেন যে প্রত্যেককে দৈনিক আধঘণ্টা করে লিখতে হবে।

সাদাসিধে আহার

পোশাকে-পরিচ্ছদে যেমন, তেমনি আহারের ব্যাপারেও নিতান্ত সাদাসিধে ছিলেন হেয়ার। তিনি মাগুরমাছ ভীষণ ভালোবাসতেন; আমি নিজে তাঁকে অনেকবার মাগুরমাছ দিয়ে এসেছি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি তাঁর বন্ধু রাজা রামমোহন রায়ের কাছ থেকে এই মাছ খেতে

শিখেছিলেন। আমাদের মিঠাইও ছিল তাঁর খুব প্রিয়, হতভাগ্য প্রতাপচন্দ্র প্রায়ই তাঁর কাছে মিঠাই পাঠাত। মদ খাওয়ার অভ্যাস হেয়ারের কখনো ছিল কিনা, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি জানি সমস্ত পানীয়ের মধ্যে নারিকেল-দুধই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি একেবারে বাঙালী ব'নে গিয়েছিলেন। আমাদের ঋষিরা প্রধানত ফলমূল আর দুধ খেয়ে থাকতেন ব'লে তিনি তাঁদের প্রশংসা করতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হেয়ার স্ট্রীটে অর্ধসমাপ্ত একটি বাড়ির মালিক ছিলেন হেয়ার। বাড়িটির সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। গেটের কাছে ছায়াঘন একটি গাছের নিচে ছিল একটি মুদির দোকান। এদেশীয় যেসব ব্যক্তি হেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন মুদি তাঁদের কলাপাতার টুকরো সরবরাহ করত, সেগুলি তাঁরা ব্যবহার করতেন ভিজিটিং কার্ড হিসাবে। হেয়ার সাধারণত উঠতেন সকাল আটটায়। রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে সব বয়সের এবং সকল শ্রেণীর দেশীয় সাক্ষাৎ-প্রার্থীতে ভর্তি হয়ে যেত তাঁর বাড়ি। সেই 'শিশির ভেজা' সকাল থেকে শুরু করে রাত্রি পর্যন্ত এ ভিড়ের বিরাম থাকত না। শিশু আর বালকেরা তাঁর কাছ থেকে পেত খেলনা আর ছবিওলা বই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ির এধার থেকে ওধার ছুটে বেড়াত, অন্যেরা আবার তাঁর চেয়ারের চারপাশে দাঁড়িয়ে যা মনে আসত এক নাগাড়ে প্রশ্ন করে যেত, বোধহয় সবরকমে পরীক্ষা করত তাঁর ধৈর্যের। তাঁর প্রাতরাশ ছিল বাহুল্যবর্জিত। বেলা দশটার সময় তাঁর পাল্কি ভর্তি হ'ত বই আর ওষুধে; তারপর তাঁর যা কাজ—তাঁর সঙ্গে জড়িত স্কুল আর কলেজগুলি পরিদর্শনের সেই কাজে তিনি বেরিয়ে পড়তেন। আরপুলি স্কুলগুলি যতদিন ছিল, ততদিন সেখানে বেশ কয়েক ঘণ্টা তিনি কাটাতেন, এবং প্রায়ই একটা তক্তাপোষের উপর বসে আশপাশের ছেলেদের উপর সজাগ

দৃষ্টি রাখতেন। পরবর্তীকালে তাঁর এই পরিদর্শনের কাজ সীমিত হয়ে গিয়েছিল হিন্দু কলেজ, পটলডাঙা স্কুল, আর মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে। মেডিক্যাল কলেজে* শুধুমাত্র ছাত্রদেরই নয়, রোগীদেরও তিনি বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখতেন। তিনি স্বভাবত এত দয়ার্দ্রহৃদয় ছিলেন যে রোগীদেব রোগমুক্তিব জন্য তাঁকে অধীর হয়ে উঠতে দেখা যেত ; তাদেব স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে সেইজন্য তিনি প্রতিদিন লক্ষ্য রাখতেন।

অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে তিনি তাঁব প্রাত্যহিক পরিদর্শনের কাজ করতেন। প্রথমেই তিনি ভালো করে দেখতেন হাজিরার খাতাটি, তার থেকে তৈবি হোত গরহাজির ছাত্রদের তালিকা। বিভিন্ন ক্লাশে গিয়ে তিনি সেখানকার অগ্রগতি লক্ষ্য

*আমাকে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হযেছিল সেগুলি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা কবতে চাই না, তবে আমার বক্তব্য বিশদ করতে গেলে সেগুলি এড়িযে যাওযা চলে না। প্রধানত যাঁর সহায়তায সেই বাধাগুলি উত্তীর্ণ হযেছিলাম তাঁর প্রতি সুবিচার করতে গেলে, এ বিষযটি একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা আমার কর্তব্য বলে মনে কবি। যে উদ্যোগী পুরুষ এই অমূল্য সাহায্য দান কবেছিলেন তাঁর নাম ডেভিড হেযার। কলেজস্থাপনেব সরকারী নির্দেশ যখনই এই ভদ্রলোকের গোচরে এল তখনই তিনি আপন উদার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশিত লক্ষ্যকে সফল করে তোলবাব জন্য আমাকে সাহায্য করতে এগিযে এসেছিলেন। তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন এই কলেজস্থাপনের উদ্দেশ্য কি এবং কলেজ স্থাপিত হলে কি ব্যাপক সুফল তার থেকে লাভ করা যাবে। তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্য আমার কাছে সব সমযই ছিল অমূল্য, বক্তৃতাগুলিতে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি প্রাযই উপস্থিত হতেন ;

করতেন, শিক্ষক এবং ছাত্রদের বক্তব্য শুনতেন, মেধাবী ছাত্রদের বই পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করতেন। যারা অলস, দীর্ঘসূত্রী বা অমনোযোগী তাদের তিনি তিরস্কার করে জাগিয়ে তুলতে চাইতেন।

হিন্দু কলেজ থেকে তিনি যেতেন পটলডাঙা স্কুলে। এখানেও একই রকমভাবে পরিদর্শনের কাজ চলত। তারপর তিনি যেতেন মেডিক্যাল কলেজে; তাঁর অনেক ছাত্র সেখানে ভর্তি হয়েছিল প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্র (foundation pupil) হিসাবে। তারা সকলেই ছিল তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত; তাই তাদের মধ্যে কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলতে তাঁর কোন অসুবিধা হত না। চিকিৎসা-বিদ্যার ক্ষেত্রে তাঁর ছাত্ররা ছিল পথিকৃৎ, পরবর্তীকালে এই পথে যারা বিচরণ করেছে তাদের পরিচালনা করেছে এই ছাত্ররাই। মেডিক্যাল কলেজ পরিদর্শনের কাজ সেরে আবার তিনি পটলডাঙা স্কুলে ফিরে আসতেন—সেখানে থাকতেন সন্ধ্যা পর্যন্ত। সেখানে তাঁর কাজ ছিল ছেলেদের হাতের লেখা পরীক্ষা করা এবং হাতের লেখা কিভাবে আরও উন্নত করা যায় তার নির্দেশ দেওয়া। তারপর যেসব ছেলে অনুপস্থিত হয়েছে বলে হাজিরা খাতা থেকে জানা যেত, তাদের খোঁজ নেবার জন্য তিনি পাঠাতেন তাঁর বিশ্বস্ত চাকরকে। অনেক সময় তিনি নিজেই যেতেন তাদের খোঁজে। প্রত্যেক ছেলেটি সম্পর্কেই তিনি অনবরত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজখবর নিতেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে এর ফলেই ছাত্রদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বে ভরা মনোভাব, সমস্ত শাসনব্যবস্থাটি সুশৃঙ্খলভাবে চালানোর জন্য তা ছিল একেবারে অপরিহার্য। এক এক সময় আমাদের এমন

বাড়িতে তাঁর কাজে, পরিবারবর্গের প্রতি ব্যবহারে, সঙ্গী সাথীদের সান্নিধ্যে এই অনুসন্ধিৎসা তাঁকে ঘিরে থাকত; বাড়িতে বা বাড়ির বাইরে তিনি যে আমোদ-প্রমোদে অংশ নিতেন, পড়াশুনার জন্য যে-সময় ব্যয় করতেন এবং বাস্তবপক্ষে মনের সুস্থ বিবর্তন সম্পর্কিত যত তথ্য সংগ্রহ করতেন, সব কিছুতেই এই চিন্তা তাঁকে চালিত করত। ছাত্রদের শুধু খোঁজ খবর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন না তিনি। টিফিনের সময় কিংবা স্কুলের ছুটি হয়ে যাবার পর স্কুল ঘরে, খেলার মাঠে কিংবা অন্য কোন নির্জন জায়গায়—সব সময়ই দেখা যেত তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। নীতিহীনতার দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন তিনি। অল্পবয়স্কদের নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ তিনি চট করে ধরে ফেলতে পারতেন, তা দূর করবারও অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। যারা ভুল করত তাদের ভুল তিনি শুধরে দিতেন, দোলায়মান যাদের চিত্তবৃত্তি তাদের দিতেন সাহস, নিরাশা-ক্লিষ্টদের অনুপ্রাণিত করে

কতকগুলি বিচিত্র অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। একথা উল্লেখ করা কর্তব্য যে সেই সঙ্কটের দিনে হেয়ারের ধৈর্য ও বিচক্ষণতাই আমাকে কার্যক্ষম রেখেছিল এবং উদ্দীপিত করে তুলেছিল। সত্যি কথা বলতে কি হেয়ারের সহায়তা ছাড়া হিন্দু চিকিৎসক সমাজ গঠনের যেকোন চেষ্টা ব্যর্থ হোত। এদেশবাসীরা চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তাঁর কাছে কতখানি ঋণী এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ সেকথা প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত করবার সুযোগ আজ আমি গ্রহণ করছি। এ সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সামান্যই বলতে পারছি, তবু আমার বিশ্বাস আমার এই অনুভূতি কমিটির অনুভূতিকেই প্রতিফলিত করবে।

—ডঃ ব্রামলি

তুলতেন আশা দিয়ে। যারা শান্তিহীন তাদের তিনি শান্ত করতেন, দুশ্চরিত্রকে করতেন সংশোধিত। যেকোন ধরনের মিথ্যাভাষণ বা অসদাচরণকে তিনি প্রাণপণে নিরুৎসাহিত করতেন। তাঁর সর্বপ্রকার চেষ্টা ছিল কি করে প্রত্যেকটি ছেলে সৎভাবে মানুষ হয়ে উঠতে পারে। ঈশ্বরের রাজত্ব বিস্তারের পরিকল্পনায় এইভাবে তিনি ছিলেন ক্লান্তিহীন। আত্মিক বিবর্তনই তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। জাতিভিত্তিক বা বিশেষ কোন মতবাদাশ্রিত বিষয়মুখিতা তাই তাঁর কাছে বাহ্যত গৌণ বিবেচিত হোত। তবে উপদেশের চাইতে দৃষ্টান্তই বেশি কার্যকর,—তাই, তাঁর দৈনন্দিন কর্মবিধিই ছিল ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে মহৎ নৈতিক শিক্ষা। যারা অসহায়, যারা জীবন ধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত, তাদের তিনি নিজের পয়সায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিতেন, তাদের খাওয়া-দাওয়া এবং পোশাক পরিচ্ছদের জন্য আর্থিক সাহায্য করতেন। মাঝেমাঝে যাদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হোত, তাঁর কাছে হাত পেতেই উপকৃত হত তারা। বই কেনবার সামর্থ্য যাদের থাকত না, তাঁর কাছে এসে তারা সাহায্য পেত। রোগগ্রস্তরা তাঁর কাছে পেত ওষুধ ও চিকিৎসা। রোগী যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠত ততদিন তিনি পিতৃসুলভ স্নেহ নিয়ে রোগীর শয্যার পাশে সারারাত জেগে বসে থাকতেন, তার শুশ্রূষা করতেন। যদি কোন ছাত্র অসুস্থ হয়ে তাঁকে তার অসুস্থতার খবর না জানাত তাহলে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হতেন। দরিদ্র বালকদের অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ছিল ক্লান্তিহীন, তিনি তাদের কর্মসংস্থান করে দিতেন, অসীম উৎসাহে তাদের জীবনের প্রতিটি পর্বের বিবর্তন লক্ষ্য করতেন। এই বিষয়ে ধনীর

সন্তানের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল সমান। সর্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে তিনি তরুণদের উপকার করতেন, শুধু তাই নয়, যে কোন বিষয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সর্বদাই সে সাহায্য দানের জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

এইগুলিই হল প্রকৃত প্রেমের নিদর্শন।

ওআর্ডস্‌ওআর্থ বলেছেন : 'যা মহত্তম তাকে আরো মহৎ করে তোলে প্রেম, শুধু এই মর্ত্যে নয়, আরো উপরে স্বর্গরাজ্যেও·······.

যে পবিত্র হৃদয়ে বহিরঙ্গ পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে না সেখানেই ফোটে মৃত্যুহীন পুষ্প, মাটির পৃথিবীতে সেই পুষ্পে নন্দনের সৌরভ আঘ্রাত হয়।'

রামতনু লাহিড়ী যথার্থই বলেছেন : 'হেয়ার আমার জন্য যা করেছেন, আরো সহস্র সহস্র লোকের জন্যও তাইই করেছেন।' ছোট বড় যে কোন কাজে হেয়ারের মহানুভবতা সমানভাবে প্রকাশ পেত; যারা যারা তাঁর কাছে উপকার পেত, তাদের প্রত্যেকেই ভাবত যে তিনি তারই ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

আর্যরা বলতেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি মন আছে যা ইন্দ্রিয়সচেতন ও বোধসম্পন্ন এবং সসীম একটি আত্মা আছে যা আধ্যাত্মিক, অসীম এবং চিরন্তন। মন যত বেশি আত্মায় লীন হয়ে যায়, আত্মা ততই উন্নত হয়ে ওঠে, ততই হয় বন্ধন থেকে মুক্ত। একেই পল বলেছেন 'আত্মিক দেহ' একেই লিউক বলেছেন, 'আমাদের অন্তরস্থ স্বর্গরাজ্য', বুনসেনের মতে এইই হল 'ভগবৎ-সচেতনতা', এই ভগবৎ-সচেতনতাই ঋগ্বেদের যুগে আর্যদের মন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছিল। এই স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া সব মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। আমাদের

কোন কোন মহান জ্ঞানগুরু ও উপকারক এবং কিছু কিছু 'পবিত্র হৃদয়' পুরুষ 'দেহের' চাইতে 'আত্মিক প্রেরণা'র কথাই বেশি করে চিন্তা করেছেন ; যাঁরা তাঁদের মতো (শুধু) তাঁরাই আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হতে পারেন। এঁরাই গ্রহণ করেন 'নন্দনের বাতাস', উদার সূর্যের মতো চারিদিকে সকলের প্রতি সমানভাবে এঁরাই বিতরণ করেন উত্তাপ ও প্রাণশক্তি। এই ভাবেই আমরা বুঝতে পারি, যে-সব লোকের জন্য হেয়ার পরিশ্রম করে গেছেন, তারা সবাই কেন তাঁর মহানুভবতাকে এতখানি সম্মান দেয়।

কোন কোন যুগের বিস্ময়কর পরিবর্তনের পরিচয় ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। যাঁদের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন আসে তাঁদের সৃষ্টি হয় অবস্থার বিবর্তনে। কুজিন বলেছেন যে তখনই ভগবান তাঁর বিশেষ প্রতিনিধিদের পাঠান যখন সমস্ত পরিবেশ তাঁদের আবির্ভাবের অনুকূল হয়ে ওঠে। ডেভিড হেয়ার এবং বাঙালী সমাজের মধ্যে আত্মীয়তা-বন্ধনের কোন স্বাভাবিক যোগসূত্র ছিল না, তাই এদেশীয় শিক্ষার পথিকৃৎ এবং জনক হিসাবে কলকাতায় তাঁর উপস্থিতি আমাদের কাছে দৈব-নির্দেশিত বলেই মনে হয়। সমস্ত পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরেরই প্রতিরূপ দেখতেন আর্যরা ; পলও বলেছেন, 'ঈশ্বরের মধ্যেই আমাদের জীবন, আমাদের চলমানতা ; তাঁর মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব।' যাঁরা নিজেদের আধ্যাত্মিকতার উন্নত স্তরে নিয়ে যাবার প্রয়াসী তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়ে ওঠেন ; হেয়ার ছিলেন তাঁদেরই একজন। শুধু তাঁরই জন্য দেশীয় সমাজ সক্রিয় সহযোগিতার উদার হাত প্রসারিত করেছিল, তাঁরই জন্য সম্ভব হয়েছিল দ্বারে দ্বারে

ঘুরে হিন্দু কলেজের চাঁদা সংগ্রহ করা। হিন্দু যুবকদের শিক্ষার জন্য এদেশবাসীর মনে উৎসাহের আলোকশিখা তিনিই জাগিয়ে রেখেছিলেন।

হেয়ারের কোন সাংসারিক ঝামেলা ছিল না। তাই তাঁর একমাত্র প্রচেষ্টা ছিল কিভাবে হিন্দুদের ভালো করা যায়। কিন্তু মহত্তম লোকেদেরও অনেক সময় বিচলিত হতে হয়, ঝড় ঝঞ্ঝার আবর্তে পড়ে বিক্ষুব্ধ হতে হয়। হেয়ার যখন মিঃ গ্রে-র কাছে ব্যবসা হস্তান্তরিত করেছিলেন, তখন লক্ষ্মীলাভের চাইতে লোকের কল্যাণসাধনে নিজেকে ব্রতী করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু যেসমস্ত ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন সেগুলির ফল ভালো হল না, যেসমস্ত জায়গায় তিনি টাকাকড়ি গচ্ছিত রেখেছিলেন সেগুলিও ফেল পড়ল। এই সব কারণে দুস্তর বাধার সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। একদিন সকালে তাঁর মুখ থেকে শুনলাম হয়তো তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হবে। (কিন্তু) যাঁরা মহান বা দেবপ্রতিম দুঃখ যন্ত্রণা তাঁদের কাছে শুদ্ধির পরীক্ষা, আধ্যাত্মিক প্রগতির সোপান। (তাই) শত বাধাবিপত্তির সম্মুখে পড়েও তিনি তার বাড়িটি নির্মাণের কাজ আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ করলেন, তারপর সেটিকে হস্তান্তরিত করলেন পাওনাদারের কাছে। প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে পড়েও যে-কাজ তিনি নিজের কাঁধে নিজেই তুলে নিয়েছিলেন, নিয়মিতভাবে সেই প্রাত্যহিক কৃত্যসম্পাদনে এতটুকু শৈথিল্য দেখাননি। এই প্রতিকূল অবস্থাতেও তিনি রইলেন একই রকম আত্মত্যাগী, আত্মসমর্পিত, একইভাবে প্রতিবেশীর প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। দেশীয় শিক্ষার জনক এবং স্বার্থ-ত্যাগের মূর্ত দৃষ্টান্ত হেয়ারের জীবন এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

অপরের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টায় হেয়ার কখনও ক্লান্ত বোধ করতেন না। তিনি সর্বপ্রকারে চেষ্টা করতেন কিভাবে লোকের ভালো হয়। তাঁর এই কল্যাণকর প্রচেষ্টার কেউ উল্লেখ মাত্র করলেও তিনি বিরক্ত হতেন। প্রায়ই তাঁকে বলতে শোনা যেত, তিনি যা করছেন তা নিজের আনন্দের জন্যই করছেন। তাঁর উন্নত আত্মার আর এক পরিচয় হল—তিনি সকলেরই বিচার করতেন উদার মন নিয়ে। তাঁর প্রতিবেশীর সম্পর্কে কেউ নিন্দা করুক তা তিনি কখনও চাইতেন না।

হেয়ার ছিলেন স্বার্থশূন্য। আর্যরা যাকে বলেন 'নিষ্কাম', অর্থাৎ কর্মফলের প্রত্যাশাহীন, তিনি ছিলেন তাই। জীবনের সব সুখ থেকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত রেখেছিলেন, তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব এবং ঐশ্বর্যকে তিনি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁর মতো মানুষদের কল্যাণের জন্য, যদিও সে মানুষেরা ছিল স্বতন্ত্র জাতির বা গোষ্ঠীর। একথা স্থির যে তাঁর এই কাজের দ্বারা তিনি প্রকৃত পক্ষে 'স্বর্গলোকে আপন সম্পদের সঞ্চয় বাড়িয়ে চলেছিলেন—দৃশ্যমান বা জাগতিক যা কিছু তাকে গ্রাহ্য না করে তিনি সেই দিকেই দৃষ্টি রেখেছিলেন যা অদৃশ্য অথচ চিরন্তন।'

হেয়ার পরবর্তী আঘাত পেয়েছিলেন তাঁর দুই ভাইয়ের মৃত্যুতে। তাঁর শোককালীন অবস্থায় হিন্দু কলেজে আমি তাঁকে দেখেছিলাম। তাঁর মুখে এক আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছিল, তিনি আমায় শান্তভাবে জানালেন যে তাঁর ভ্রাতৃ-বিয়োগ হয়েছে। তিনি যখন মিঃ গ্রে-র বাড়িতে বাস করছিলেন সেই সময় তাঁর আর এক ভাই মারা যান। যে

চিঠিতে এই মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলেন সেই চিঠিটি যখন তিনি আমায় পড়ে শোনালেন তখন তাঁর উচ্ছ্বসিত অশ্রু বাধা মানল না। শোকাবেগ সংবরণ করা কিছুক্ষণের জন্য তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল। হেয়ার ভাইদের খুব ভালবাসতেন, ভ্রাতৃবন্ধন কি তা তিনি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন।'

যে-ব্যক্তি প্রতিকূল অবস্থায়, কঠিন পরিশ্রম, দুঃখদুর্দশা এবং গভীর যন্ত্রণার ভিতরেও অন্তরের মধ্যে শান্তির সন্ধান পান তাঁর সুখ বহির্জগতের মধ্য দিয়ে আসে না, আসে অন্তরের জগৎ থেকে। আত্মার অতল গভীরে নিহিত তাঁর সুখ, সুখ তাঁর আপন নিঃস্বার্থতায়, পবিত্র মহানুভবতায়, অপরের জন্য দুঃখবরণে। তাঁর প্রতিবেশীর আনন্দ ও অন্তরের দুঃখকে তিনি আপনার মধ্যে অনুভব করেন, তার সৌভাগ্যের সঙ্গে—আবার প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গেও নিজেকে একাত্ম করে ফেলেন। যদিও ইংলণ্ডে হেয়ারের আরো একজন ভাই ছিলেন, তবু দেশে ফেরার সব ইচ্ছা তিনি ত্যাগ করলেন। এখানে তাঁর কাজ তিনি এমন অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন যে মনে হল যেন একজন তীর্থযাত্রী 'বিপুল ভার' বহন করতে করতে এসে যাত্রাশেষে বিশ্রামের ক্ষেত্র খুঁজছেন। তিনি জীবিত অবস্থায় দেখে যেতে পেরেছিলেন যে তাঁর মধ্য দিয়ে সহস্র সহস্র লোক যে-শিক্ষা পেয়েছে তার উদার ফল বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ছে, তিনি দেখেছিলেন সে শিক্ষায় লোকের নৈতিক বোধ সমৃদ্ধ হচ্ছে, তাদের পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নত হয়ে উঠছে এবং ধর্মসম্পর্কে লোকের আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা তাদের আত্মিক জীবনের বিবর্তন সূচিত করছে।

হেয়ার হিন্দুদের জন্য যে কল্যাণসাধন করেছিলেন, তা শুধু কথায় বা বাকচাতুর্যে নয়, আপন কর্মের দ্বারা তিনি তাঁকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিকৃতি, সমাধিসৌধ, স্মৃতিফলক বা প্রতিমূর্তি—এ সবই যে তাঁর প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার স্মারক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু তাহলেও এগুলি নশ্বর, 'একদিন না একদিন এগুলি ধ্বংস হয়ে যাবে।' জাতির হৃদয়ে আমাদের সেই মহানুভব কল্যাণসাধকের পবিত্র ও সকৃতজ্ঞ অনুস্মরণই হল তাঁব স্মৃতির যথার্থ অবিনশ্বর অভিজ্ঞান। আমরা প্রার্থনা করি সে স্মৃতি এক যুগের মানুষের হৃদয় থেকে আর এক যুগের মানুষেব হৃদয়ে সঞ্চারিত হোক। তার সঙ্গে যুক্ত হোক সেই ঈশ্বরের প্রতি আমাদের সভক্তি অধ্যাত্মানুভূতি যিনি হেয়ারের মধ্য দিয়ে এই দেশের তমসাকে দূর করেছেন। হেয়ারের জীবন থেকে আমরা যেন গ্রহণ করি অমূল্য উপদেশ—যা শিক্ষাপ্রদ, যা চিত্তকে মহান করে তোলে। যতদিন নিঃস্বার্থ পরোপচিকীর্ষা ও মানবহিতৈষণা আত্মার যথার্থ অভিব্যক্তি বলে আদৃত হবে এবং প্রেম, শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মার সাযুজ্যসাধনের পথ হিসাবে স্বীকৃত হবে ততদিন অম্লান থাকবে হেয়ারের সেই অমূল্য শিক্ষা।

পরিশিষ্ট

হিন্দু কলেজের নিয়মাবলী

অধ্যয়ন সংক্রান্ত

১। এই শিক্ষায়তনের মূল উদ্দেশ্য হল সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইওরোপ-এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া।

২। ছাত্র ভর্তির বিষয়ে শিক্ষায়তনের পরিচালকবৃন্দের মতামতই কার্যকরী হবে।

৩। একটি স্কুল (পাঠশালা) এবং একটি অ্যাকাডেমি (মহাপাঠশালা) কলেজটির অন্তর্ভুক্ত হবে। পাঠশালাটি অবিলম্বেই স্থাপিত হবে। দ্বিতীয়টি স্থাপনের পরিকল্পনা যথাশীঘ্র সম্ভব বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।

৪। পাঠশালাটিতে উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির সাহায্যে ইংরেজী, বাংলা, দ্রুত পঠন, লিখন, ব্যাকরণ, পাটীগণিত, প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হবে। যদি সুবিধা হয় তাহলে অ্যাকাডেমিটি স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত পাঠশালাটিতে ফার্সী শেখাবারও ব্যবস্থা থাকবে।

৫। স্কুলে (অর্থাৎ এই পাঠশালাটিতে) যে সমস্ত ভাষা শিক্ষার সুবিধা থাকবে না, সেইসব ভাষা ছাড়াও অ্যাকাডেমিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি শেখানোর ব্যবস্থা থাকবে: ইতিহাস, ভূগোল, কালনিরূপণ-বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন এবং অন্যান্য বিজ্ঞান।

৬। ছাত্রদের স্কুলে বা অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার বয়স পরিচালকেরা নির্ধারণ করবেন। কোন ক্ষেত্রেই পরিচালকদের অনুমতি ছাড়া আট বছরের কম বয়সের ছেলেদের ইংরেজী ভাষা-শিক্ষা দেওয়া হবে না।

৭। পরিচালকদের দ্বারা নির্ধারিত সময়ে সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হবে। পরীক্ষার ফলাফলে যেসব ছাত্র বিশিষ্টতা অর্জন করবে, তারা সাম্মানিক পুরস্কারের অধিকারী হবে।

৮। বিদ্যায় উৎকর্ষ এবং সচ্চরিত্রের জন্য যেসব ছাত্র স্কুলে সুনাম অর্জন করবে, পরিচালকেরা ইচ্ছা করলে অ্যাকাডেমিতে বিনা বেতনে তাদের উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। এইজন্য যে-অর্থ ব্যয় হবে শিক্ষায়তনের অর্থকোষ যদি তা বহন করতে না পারে তাহলে সহৃদয় ব্যক্তিদের কাছে আহ্বান জানানো হবে সে অর্থ দান করবার জন্য।

৯। স্কুল বা অ্যাকাডেমি ত্যাগের সময় তত্ত্বাবধায়কগণের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি অভিজ্ঞানপত্র (certificate) ছাত্রদের দেওয়া হবে। ছাত্রের পরিচয়জ্ঞাপক নিম্নোক্ত বিবরণ তাতে থাকবে : নাম, বয়স, পিতার নাম, বাসস্থানের ঠিকানা, অধ্যয়নের কাল এবং পঠিত ও অধিগত বিষয়সমূহের তালিকা।

অর্থ ভাণ্ডার ও সুযোগ সুবিধা

১০। 'কলেজ ফাণ্ড' এবং 'এডুকেশন ফাণ্ড' নামে দুটি স্বতন্ত্র তহবিল থাকবে। দুটি আলাদা চাঁদার বইয়ের মাধ্যমে অর্থ সংগৃহীত হবে। যেসব দাতা ইতিমধ্যেই শিক্ষায়তনটিতে দান করেছেন, কোন্ তহবিলের জন্য তাঁদের দান লিপিবদ্ধ হবে, তা স্থির করার স্বাধীনতা তাঁদেরই থাকবে। তাঁরা ইচ্ছা করলে উভয় তহবিলেই তাঁদের আংশিক দান লিপিবদ্ধ হবে।

১১। 'কলেজ ফাণ্ডে'র উদ্দেশ্য হবে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যা শিক্ষার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে এবং 'এডুকেশন

ফাণ্ড'কে সাহায্য দেবে। এর চরম লক্ষ্য হবে একখণ্ড জমি ক্রয় করে তার উপর কলেজের স্থায়ী ব্যবহারের জন্ত উপযুক্ত বাড়ি নির্মাণ করা। সমস্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বই, বিজ্ঞানচর্চার যন্ত্রপাতি এবং শিক্ষায়তনের সকল লক্ষ্য সম্পূর্ণ সফল করার উপযোগী আর যা যা জিনিসপত্রের প্রয়োজন সেগুলির ব্যবস্থা করাই হবে 'কলেজ ফাণ্ডে'র উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কলেজ ভবন নির্মাণ করার মতো যথেষ্ট অর্থ যদি সংগৃহীত না হয়, তাহলে কলেজের বাড়ি ভাড়া এবং অন্তান্ত খরচপত্রের জন্ম এই তহবিলে চাঁদা দেওয়ার আবেদন প্রচার করা হবে।

১২। 'এডুকেশন ফাণ্ডে' যে-অর্থ সংগৃহীত হবে তা ছাত্রদের শিক্ষার এবং অধ্যাপনার খরচ হিসাবে ব্যয় করা হবে।

১৩। আশা করা যায় চাঁদাদাতারা প্রতিশ্রুতিদানের সময়েই অথবা খুব বেশি হলে তার একমাসের মধ্যে কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রতিশ্রুত অর্থ জমা দেবেন। টাকা নগদ দিতে হবে, তবে কোষাধ্যক্ষের সম্মতি অনুসারে অন্ত কিছুতেও দেওয়া চলতে পারে।

১৪। কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা দিবসের প্রথম বৎসর পূর্ণ হবে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে। ঐ তারিখের পূর্বে 'কলেজ ফাণ্ডে' যাঁরা চাঁদা দেবেন তাঁরা 'কলেজের প্রতিষ্ঠাতা' হিসাবে গণ্য হবেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ উল্লিখিত হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নামও লিপিবদ্ধ থাকবে। নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে-র পূর্বে যে যে ব্যক্তির দানের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হবে তাঁদের নাম 'কলেজের মুখ্য প্রতিষ্ঠাতা' (Chief founders) হিসাবে লিখিত থাকবে। যাঁরা প্রত্যেকে ৫০০০ টাকা বা তার বেশি দান করবেন তাঁরা পরবর্তী শ্রেণীতে স্থান পাবেন এবং তাঁদের নাম 'প্রধান

প্রতিষ্ঠাতা' (Principal founders) হিসাবে উল্লিখিত হবে। কলেজ ফাণ্ডে আর যাঁরা চাঁদা দেবেন তাঁদের নাম প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ এবং অর্থদানের তারিখ অনুসারে সাজানো হবে।

১৫। যেসব দাতা সর্বসাকুল্যে দেড়লক্ষ সিক্কা টাকা সংগৃহীত হবার আগে পাঁচহাজার টাকা বা তার বেশি কলেজ ফাণ্ডে দান করবেন, কলেজের গভর্নর হিসাবে তাঁদের অধিকার হবে বংশগত। এই চাঁদা দেওয়ার পর তিনি স্বয়ং বা তাঁর নির্বাচিত কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে পরিচালক সমিতির সভ্য হিসাবে কাজ করার অধিকার পাবেন। এই সভ্য ইচ্ছা করলে লিখিত উইল বা অন্য কোন দলিলের সাহায্যে তাঁর কোন পুত্র বা পরিবারভুক্ত কাউকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতে পারেন। তাঁর মৃত্যুর পর কলেজ গভর্নরের সমস্ত সুযোগসুবিধা এই উত্তরাধিকারী বংশসূত্রে পাবেন। আর যদি কোন সভ্য উত্তরাধিকারী নির্বাচন না করেন, তাহলে তাঁর আইনানুমোদিত উত্তরাধিকারীর স্বাধীনতা থাকবে (এই কাজে) পরিবারভুক্ত কাউকে মনোনীত করার। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে পরিচালকবৃন্দই তার মীমাংসা করবেন।

১৬। কলেজ ফাণ্ডের যেসব চাঁদাদাতা গভর্নর নন, অথচ মোট দেড় লক্ষ সিক্কা টাকা সংগৃহীত হবার আগে যাঁরা এককভাবে বা একত্রে ৫০০০ টাকা দিয়েছেন, তাঁরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে কলেজের ডিরেক্টর হিসাবে মনোনীত করতে পারেন। উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসাবে জমা দেবার পর পরিচালক সমিতির সম্পাদকের কাছে তাঁরা একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি দাখিল করবেন। তাতে তাঁদের প্রত্যেকের সীলমোহর কিংবা স্বাক্ষর থাকবে এবং তাতে তাঁরা চলতি বৎসরের জন্য যাঁকে ডিরেক্টর নির্বাচিত করছেন তাঁর নাম এবং পরিচয় দেওয়া থাকবে। এই নির্বাচনের অধিকার তাঁদের আছে কিনা তা প্রমাণ করার জন্য

কলেজ ফাণ্ডে তাঁদের দানের বিবরণ এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে পাঠাতে হবে অথবা এই বিজ্ঞপ্তির মধ্যেই উল্লেখ করতে হবে।

১৭। পরিচালক সমিতি (Committee of Managers) পরীক্ষা করে দেখবেন নির্বাচন ঠিকভাবে হয়েছে কিনা। যাঁরা যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁরা পরবর্তী বৎসরের ২১শে মে পর্যন্ত ডিরেক্টর বলে গণ্য হবেন। ঐ তারিখে বা তার পূর্বে আগামী বৎসরের জন্য অনুরূপ আর একটি নির্বাচন হবে এবং সম্পাদকের কাছে একই ধরনের বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে। বছরের পর বছর এইভাবে নির্বাচন চলবে, তবে এর একটি শর্ত আছে। যদি এমন কোন সদস্য মারা যান যিনি এককভাবে বা (অপরের সঙ্গে) যৌথভাবে চাঁদা দিয়েছিলেন, তাহলে তাঁর নির্বাচন কবার অধিকার তাঁর প্রদত্ত চাঁদার অনুপাতে লুপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর সঙ্গে যৌথভাবে চাঁদা দিয়ে যিনি বা যাঁরা মোট ৫,০০০ টাকা দিয়েছিলেন, বার্ষিক নির্বাচন করার অধিকার বজায় রাখবার জন্য তাঁকে বা তাঁদের ঐ টাকাটা (অর্থাৎ, মৃত ব্যক্তির প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণ) হয় চাঁদা হিসাবে দিতে হবে নয়তো একজন অতিরিক্ত চাঁদাদাতা জোগাড় করে তাঁর মাধ্যমে দিতে হবে।

১৮। 'কলেজ ফাণ্ডে' মোট দেড়লক্ষ সিক্কা টাকা সংগৃহীত হবার পর যিনি এককভাবে মোট ৫,০০০ বা তার বেশি পরিমাণ টাকা চাঁদা দেবেন কলেজের গভর্নর হিসাবে তাঁর পদ বংশগত হবে না, তবে তিনি সারা জীবন এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং চাঁদা দেবার পর স্বয়ং অথবা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে যাবজ্জীবন কলেজের পরিচালক সমিতির সভ্য হিসাবে কাজ করতে পারবেন।

১৯। 'বাৎসরিক ডিরেক্টর' নির্বাচনে 'কলেজ ফাণ্ডের' চাঁদাদাতারা কি সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন তা স্থির করবেন পরিচালকেরা। তহবিলে দেড়লক্ষ সিক্কা টাকা জমা হবার পর যে বাড়তি টাকা

চাঁদা হিসাবে সংগৃহীত হবে তার সম্পর্কে ব্যবস্থাও তাঁরাই গ্রহণ করবেন।

২০। শিক্ষায়তনের অন্তর্ভুক্ত স্কুলটিতে যাতে বর্তমানের জন্য একশ'জন বৃত্তিভোগীর পড়বার ব্যবস্থা করা যায়, আপাতত 'এডুকেশন ফাণ্ডে' শুধু সেইটুকু দানই গ্রহণ করা হবে। বিদ্যালয়ের প্রকৃত কল্যাণ যাতে ব্যাহত না হয় এবং ছাত্রদের অগ্রগতি যাতে সন্তোষজনক হয় সেদিকে লক্ষ রেখে প্রথম বৎসরে অনধিক একশজন ছাত্র ভর্তি করা স্থির হয়েছে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অধিক পরিমাণে অর্থসাহায্য গৃহীত হবে।

২১। 'এডুকেশন ফাণ্ডে' যিনি চারশ সিক্কা টাকা চাঁদা দেবেন, তিনি স্কুলে একজন ছাত্রকে পাঠাতে পারবেন, সে চারবছর বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করবে। বাৎসরিক ১২০ টাকা চাঁদা দিলে চার বৎসরের কম তবে অন্যূন এক বৎসরের জন্য অনুরূপ সুবিধা পাওয়া যাবে।

২২। যে-ছাত্রের বেতন বাবদ উক্ত চাঁদা দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষা নেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বিদ্যালয় ত্যাগের উপযুক্ত, তাহলে তার পৃষ্ঠপোষক যে-চাঁদা দিয়েছিলেন, শর্তানুযায়ী বাকি সময়ের জন্য সে (নির্দিষ্ট) অনুপাতে তা গ্রহণ করার অধিকারী হবে।

২৩। যে-সময়ের জন্য চাঁদা দেওয়া হয়েছে, তা অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই যদি কোন ছাত্র মারা যায়, তাহলে চাঁদাদাতা ইচ্ছা করলে বাকি সময়ের জন্য একটি ছাত্র পাঠাতে পারেন অথবা তাঁর চাঁদার সামান্য অংশ ফিরে পেতে পারেন। কিংবা তিনি যদি নূতন চাঁদা দিতে চান তাহলে তাঁর (পূর্বপ্রদত্ত উদ্‌বৃত্ত) চাঁদার জন্য নির্দিষ্ট অনুপাতে সুবিধা ভোগ করবেন।

২৪। এডুকেশন ফাণ্ড সম্পর্কিত সকল সময়-গণনার ক্ষেত্রে ইংরেজী ক্যালেণ্ডার মেনে চলা হবে, প্রতিষ্ঠানটির (কার্য পরিচালনার)

ক্ষেত্রে কোন মাসের ভগ্নাংশ হিসাবের মধ্যে ধার্য হবে না।

২৫। বিংশতিতম ধারায় উল্লিখিত একশ'টি বৃত্তির উপযোগী অর্থ সংগৃহীত হবার আগে গভর্নর নন এমন কোন চাঁদাদাতা যদি মোট পাঁচ হাজার টাকা এডুকেশন ফাণ্ডে দান করেন, তাহলে কলেজ ফাণ্ডে অনুরূপ পরিমাণ চাঁদাদাতাদের মতো তিনিও বাৎসরিক ডিরেক্টর নির্বাচনের ব্যাপারে ষোড়শ এবং সপ্তদশ ধারায় উল্লিখিত সুযোগসুবিধা ভোগ করবেন। তবে কলেজ ফাণ্ডে চাঁদাদাতাদের মতো তাঁরা সারাজীবন এই সুবিধা ভোগ করতে পারবেন না, যে নির্ধারিত সময়ের জন্য তাঁরা চাঁদা দেবেন সেই সময়ের মধ্যেই তাঁদের অধিকার সীমিত থাকবে। এই নিয়ন্ত্রিত সুবিধা নিয়ে কলেজ ফাণ্ডের চাঁদাদাতাদের সঙ্গে মিলিতভাবে তাঁরাও 'ডিরেক্টর' নির্বাচন করতে পারবেন।

পরিচালনা ব্যবস্থা

২৬। কলেজ পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে একটি পরিচালক সমিতির উপর। এই সমিতিতে থাকবেন বংশানুক্রমিকভাবে অধিকারভোগী গভর্নরেরা (Heriditable Governors), সারাজীবনের জন্য নির্বাচিত গভর্নরেরা (Governors for life) এবং এক বৎসরের জন্য নির্বাচিত ডিরেক্টরেরা অথবা এঁদের প্রত্যেকের প্রতিনিধিরা।

২৭ বর্তমানে যে-আইনগুলি বিধিবদ্ধ হল সেগুলি কার্যকর করার পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালকদের হাতে থাকবে। অতিরিক্ত কোন আইনও তাঁরা বিধিবদ্ধ করতে পারেন।

২৮ তহবিলের অছি হবেন পরিচালকেরা; কোষাধ্যক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা তাঁদের থাকবে। তাঁরা আয়-ব্যয়ের সকল হিসাব অনুমোদন করবেন এবং যখন সে হিসাব অসঙ্গত বলে মনে হবে তখন তা প্রায়ই পরীক্ষা (audit) করাবেন।

২৯। পরিচালকদের কমিটি একজন ইওরোপীয় সম্পাদক এবং একজন দেশীয় সহকারী সম্পাদক নিয়োগ করবেন। কমিটির নির্দেশে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে তাঁরা কলেজের তত্ত্বাবধান করবেন। কলেজের যেকোন বিভাগে শিক্ষক এবং অন্যান্য কর্মসচিব নিয়োগের প্রয়োজন হলে পরিচালক সমিতি তা করবেন এবং তাঁদের অপসারণের ভারও তাঁদেরই উপর ন্যস্ত থাকবে।

৩০। পরিচালকদের সাধারণ সভাগুলি নির্ধারিত দিনে এবং প্রয়োজন হলে যথাসম্ভব ঘনঘন অনুষ্ঠিত হবে, যখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভার প্রয়োজন হবে, তখন সম্পাদকদ্বয় তা আহ্বান করবেন। সাধারণ ক্ষেত্রে সভায় অন্তত তিনজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজনীয়। যখন কোন সভায় নূতন আইন প্রবর্তনের অথবা প্রচলিত আইন নাকচ করার বিষয় আলোচিত হবে, তখন কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকল সদস্যের কাছে (সভার) বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হবে, যাতে সমিতির সকল সদস্যই উপস্থিত হতে পারেন।

৩১। (সভায়) উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের মতামতেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হবে।

৩২। যদি কোন সদস্য কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বাস না করার দরুন কিংবা অন্য কোন কারণে সশরীরে সভায় উপস্থিত না হতে পারেন তাহলে সম্পাদকের কাছে লিখিত পত্রে তিনি কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী কোন যোগ্য ব্যক্তিকে আপন প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারেন, কমিটি যদি তাঁকে অনুমোদন করেন তাহলে তিনি যে-সদস্যের প্রতিনিধিত্ব করছেন, তাঁরই মতো সভায় উপস্থিত হবার এবং সকল প্রশ্নে ভোট দেবার অধিকার লাভ করবেন।

৩৩। চাঁদাদাতাদের একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে; তাতে

তাঁদের কাছে শিক্ষায়তনের আর্থিক অবস্থা ও অগ্রগতি সম্পর্কিত একটি বিবরণ দাখিল করা হবে।

টীকা : বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত চাঁদার মোট পরিমাণ হল ৭০,০০০ টাকা। এর মধ্যে বর্ধমানের রাজা এবং বাবু গোপীমোহন ঠাকুর প্রত্যেকে দশহাজার টাকা করে দিয়েছিলেন। বাকি অংশ প্রধানত বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ, বাবু গঙ্গানারায়ণ দাস, বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু গোপীমোহন দেব, বাবু রামতুলাল সরকার এবং অপর কয়েকজন এদেশীয় ও ইওরোপীয় ভদ্রমহোদয়দের দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে এঁদের নামের সঠিক তালিকা কলেজের নথিপত্রে সংরক্ষিত হয়নি। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুনে অনুষ্ঠিত একটি সভায় ইওরোপীয় সদস্যেরা কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়িত্ব ত্যাগ করলেন, তাঁরা চাইলেন পরিকল্পনাটির সাধারণ সুহৃৎ হিসাবে কাজ করতে এবং প্রয়োজন হলে উপদেশ ও সাহায্যদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে। যারা বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী চাঁদাদাতাদের মধ্যে সদস্যপদের যোগ্য হয়েছিলেন, ১৮১৬-এর ডিসেম্বরে তাঁরা সার ই. এইচ. ঈস্টের বাসভবনে পরিচালক সমিতির (Managing Committee) সভ্য হিসাবে সমবেত হলেন, তাঁদের নাম—

বাবু গোপীমোহন ঠাকুর—গভর্নর
" গোপীমোহন দেব— ডিরেক্টর
" জয়কৃষ্ণ সিংহ "
" রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় "
" গঙ্গানারায়ণ দাস "

হিন্দু কলেজ এবং তার প্রতিষ্ঠাতা

বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত

বাবু রামগোপাল ঘোষ এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ,

হেয়ারের স্মৃতিবার্ষিকী এবং হেয়ার প্রাইজফাণ্ড বর্তমানে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে যার জন্য আমরা সঙ্গত কারণেই গর্ব অনুভব করতে পারি। আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান বক্তার বিনীত প্রচেষ্টা এই প্রতিষ্ঠানটির উৎপত্তির ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। তাঁর বাসগৃহেই এর আদি অধিবেশন বসেছিল। তাই হেয়ারের এই বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকীতে কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে তিনি স্বভাবতই গর্বিত এবং সুখী।

ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে আমি নির্ব্বাচন করেছি হিন্দুকলেজকে। কারণ, যাঁর স্মৃতি উদ্‌যাপন করতে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি, তাঁর মানব-হিতৈষণার অক্ষয় নিদর্শন এই কলেজ, শুধু তাই নয়, হিন্দুকলেজের ইতিহাস সত্যসত্যই প্রগতির ইতিহাস। হিন্দুমানসের অগ্রগতির অব্যাহত ধারার সঙ্গে এই কলেজের ইতিহাস জড়িত ; আমাদের সমাজের শ্রদ্ধালালিত বিধিব্যবস্থা এবং

স্মরণাতীত কাল থেকে প্রচলিত আচার আচরণের নিরন্তর পরিবর্তনের ইতিবৃত্তই এই কলেজের ইতিহাস। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু সমাজব্যবস্থার কাঠামো ছিল অত্যন্ত জীর্ণ দশাগ্রস্ত। অত্যন্ত হীন এবং নিষ্ঠুর সংস্কারের ভিত্তিভূমিতে, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণের ক্ষমতামত্ততার আশ্রয়ে স্থাপিত ছিল এই সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো। শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিচ্ছেদের কঠিন প্রাচীর তুলেছিল জাতিভেদ প্রথা; সব বিধিব্যবস্থার উর্ধ্বে সক্রিয় ছিল এই প্রথার অমোঘ প্রভাব। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক পরাধীনতার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছিল জনসাধারণ। তারপর গত অর্ধ-শতাব্দীতে যে কুসংস্কার উন্নতমনা হিন্দুপুরুষদেরও উপর অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার দৃঢ় দুর্গ, ধূলিসাৎ হয়েছে, তার আশ্রয় গেছে নষ্ট হয়ে। প্রমাণিত হয়েছে যে হিন্দু কলেজ এবং তার উত্তরসূরী অন্যান্য বিদ্যায়তন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে 'শাস্ত্রের' তুলনায় ঢের বেশি শক্তিশালী; মনুর আনুকূল্যপুষ্ট ব্রাহ্মণাধিপত্য (আজ) বিপর্যস্ত হয়েছে এই শিক্ষায়তনগুলিতে আলোচিত ভৌগোলিক, জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক এবং ঐতিহাসিক সত্যের ঋজু প্রতিরোধে। বৃহৎ কূর্মের উপর এই পৃথিবী স্থাপিত, হিন্দুদের মহাজাগতিক এই যে ধারণা ছিল তা আজ অসত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তবে কারণ পর্যালোচনা করার আগে ফল নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনা। জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির উদ্ভব এবং তার সম্প্রসারণ হবার পর, বহু বছর ধরে শিক্ষার ক্ষেত্রে নানান ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা চলার পর, অবশেষে আজ এমন সময় এসেছে যখন তার উৎপত্তি এবং অগ্রগতি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি, যখন

স্থির করতেপারি এদেশের প্রগতির আদি পথিকৃৎদের সাফল্যে আমাদের সব সঙ্গত আশা পূর্ণ হয়ে উঠেছে কিনা, সূচনা যতটা শুভ ছিল, ফলাফলও ততটা শুভ হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা।

হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই এদেশে কিছু শিক্ষায়তন ছিল' হিন্দু কলেজের ইতিহাস এই পূর্বসূরী প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাসের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে হিন্দুকলেজ সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে এদের সম্বন্ধে আলোচনাও অপরিহার্য। ইওরোপায় আদর্শে যে-শিক্ষায়তনটি প্রথম বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটি হল মাদ্রাসা। প্রথম গভর্নর জেনারেল ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে এটি স্থাপন করেন। মুসলমান যুবকদের আরবী শিক্ষা দেওয়াই ছিল এটি স্থাপনের উদ্দেশ্য। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজের খরচায় এর জন্য একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দেন, এর খরচা চালানোর জন্য বার্ষিক ২৯০০০ টাকা আয়ের একটি জায়গীরও তিনি নির্দিষ্ট করেন। চার বছর পরে সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার জন্য সরকার বেনারসে আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভারও গ্রহণ করলেন। রেসিডেন্ট মিঃ জোনাথান ডানকানের পরামর্শেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। তিনি আশা করেছিলেন যে এই কলেজ শিক্ষা দেবে হিন্দু আইনের ভাবী উচ্চ পণ্ডিত ও ব্যাখ্যাতাদের। হিন্দুআইনকে 'যথাযথভাবে সকল জনসাধারণের ক্ষেত্রে যাতে উপযুক্তভাবে, সুষমভাবে বা সুসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা যায়' তার জন্য এঁরা ইওরোপীয় বিচারকদের সাহায্য করবেন। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সরকার নদীয়া এবং তিরহুতে দুটি নূতন কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করলেন। প্রাচ্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করার জন্যই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, তবে সিদ্ধান্তটি কার্যে পরিণত হয়নি। নানান ধরনের অসুবিধার মধ্যে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হল। পরবর্তীকালে গৃহীত হল ভিন্ন একটি পরিকল্পনা। গভর্নর জেনারেল এবং তাঁর কাউন্সিলরদের মনে এক নতুন ধারণার উদয় হল যে প্রেসিডেন্সীতে একটি কলেজ খুললে উদ্দেশ্য যতটা সিদ্ধ হবে, পরিকল্পিত প্রাদেশিক কলেজ স্থাপন করলে তা হবে না। সরকারী কার্য পরিচালনার কেন্দ্রস্থলে কলেজটি স্থাপিত হলে তত্ত্বাবধানের খুব সুবিধা হবে; মফঃস্বলে স্থাপিত হলে সেদিক দিয়ে অসুবিধার সম্ভাবনা। তবে এ ইচ্ছা বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল কয়েক বছর পরে যখন বার্ষিক ৩০,০০০ টাকা ব্যয়ে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হল। এই সময় সরকারের দৃষ্টি পড়ল সত্যমনা ও সরলহৃদয় কয়েকজন ব্যক্তির প্রচেষ্টার উপর। দেশীয় জনগণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষার আশিস্‌ধারা বর্ষণ করতে তারা ছিলেন প্রয়াসী।

চুঁচুড়া তখন জ্ঞান-প্রবাহের অন্যতম উৎস বলে খ্যাতিলাভ করেছিল। সেই অঞ্চলে মিঃ মে নামে একজন ভিন্ন-মতাবলম্বী পাদরী স্বল্প আয় সত্ত্বেও শিক্ষাজগতে নতুন প্রেরণা আনলেন। পরবর্তীকালেও এই প্রেরণা ছিল সক্রিয়। বিনা বেতনে পঠন, লিখন এবং পাটীগণিত শিক্ষা দেবার জন্য তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই নিজ বাসগৃহে একটি বিদ্যালয় খুললেন। প্রথমদিন বিদ্যালয়ে হাজির হ'ল মাত্র ১৬ জন ছাত্র, কিন্তু দ্বিতীয়মাসে ছাত্রসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেল যে আরও প্রশস্ত স্থান আবশ্যক হয়ে দাঁড়াল। জেলা কমিশনার মিঃ

ফোর্বেস পুরনো ওলন্দাজ দুর্গে তাঁর জন্য একটি বৃহৎ পরিসর-যুক্ত ঘরের ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে মিঃ মে শহর থেকে কিছু দূরে এই বিদ্যালয়ের একটি শাখা বা একটি বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। একবছরের মধ্যেই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে অনেকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল; ৯৫১ জন বালক এই বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করতে লাগল। ডাঃ বেল ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে মিলিটারী অরফ্যান অ্যাসাইলামে যে শিক্ষা-পদ্ধতির সূচনা করেছিলেন এই বিদ্যা-লয়গুলিও সেই আদর্শের অনুসরণে পরিচালিত হতে লাগল।

ডাঃ বেল অ্যাসাইলামের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যখন নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় একদিন তিনি দেখেছিলেন যে মালাবার বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র আদিম হিন্দু-পদ্ধতি অনুসারে বালির ওপর লিখছে। খরচ এবং উপযোগিতার দিক থেকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা খুব সুবিধাজনক হবে ভেবে তিনি আশ্রমের বিদ্যালয়ে এইটি প্রবর্তন করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সহকারী এটি কার্যকরী করতে গররাজী হয়েছিল। তখন উচ্চমানের ছাত্রদের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুতিবান একজনকে বেছে নিয়ে তার উপর অপরিণত ছাত্রদের এই পদ্ধতি শেখাবার ভার দিয়েছিলেম তিনি। এই পদ্ধতি অভূতপূর্ব সাফল্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল এবং শিক্ষার অন্যান্য উন্নততর বিভাগেও ডাঃ বেল এইটি চালু করেছিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্যালয়টিকে তাঁর কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত কয়েকজন বালক শিক্ষকের পরিচালনাধীন করে তুলেছিলেন তিনি।

মিঃ মের সাফল্যেরও অনেকখানিই পরিণত ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষাদানের এই পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল ছিল বলে ধারণা

করা হয়। কমিশনার মিঃ ফোর্বেস শীঘ্রই ব্যাপারটা সরকারের নজরে আনলেন। মি: মে যাতে তাঁর কাজ আরো চালিয়ে যেতে পারেন সেইজন্য মাসিক ৬০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হল। দেশীয়দের মধ্যে যাঁরা উচ্চশ্রেণীভুক্ত ছিলেন চুঁচুড়ায় প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ রূপটিকে তাঁরা সোৎসাহে সমর্থন জানাতে লাগলেন। বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর নিজের পাঠশালাটিকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করলেন। অপর একজন জমিদার তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলেন। ইংরেজী বিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে যে সংস্কারের বোঝা জমা হয়েছিল তা দ্রুত অপসারিত হয়ে গেল। প্রথম প্রথম কোন ব্রাহ্মণ বিদ্যার্থী হয়তো কৈবর্ত বা সদ্‌গোপের সঙ্গে একই শ্রেণীতে বসতে চাইত না, কিন্তু পরে এই আপত্তিও দূর হয়ে গেল। মিঃ মের পরীক্ষামূলক শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবর্ধমান উপযোগিতা এবং পূর্ণ সাফল্যের কথা বুঝতে পেরে সরকার মাসিক অর্থসাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করলেন। আমাদের জাতির কল্যাণকৃৎ আরো কয়েকজনের মতো এই সদাশয় মিশনারীর নামও বিস্মৃতিতে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মহৎ কীর্তির কথা আজও অবিস্মৃত।

কলকাতায় মিঃ শেরবার্ন একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। আমাদের মধ্যে খ্যাতনামা কিছু ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের মধ্যে স্বর্গত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, তাঁর সদাশয় ভ্রাতা ও আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু রমানাথ ঠাকুরের নাম উল্লেখ করতে পারি। এই সময় নিশ্চিতভাবে ধরা পড়েছিল যে আমাদের দেশবাসীরা ইংরেজী শিক্ষার বিরুদ্ধে তাদের তথাকথিত ধর্মীয় সংস্কারগুলি বর্জন করতে শুরু

করেছেন। সরকারের ঐকান্তিক প্রয়াস ছিল যুক্তি, বিবেচনা এবং সৎ বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার করা; আমাদের স্বদেশবাসীরা সেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন। (আমাদের স্বদেশবাসীর) মানসিক জগতে এই পরিবর্তনের সুযোগ আনলেন জনৈক অবসরভোগী ঘড়ি নির্ম্মাতা; ডেভিড হেয়ার। রাজধানীতে একটি মহান শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করার উপযোগিতা এবং গুরুত্ব বিবেচনা করে দেখবার জন্য তিনি দেশীয় সমাজের মুখ্য ব্যক্তিদের উপর চাপ দিতে লাগলেন। অকৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা এই প্রস্তাবটি শুনলেন এবং তাঁকে তাঁদের আন্তরিক সমর্থন জানালেন। প্রস্তাবটি কার্যকরী করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের অভিপ্রায়ে সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি সার হাইড ঈস্ট নিজের বাসগৃহে তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন; তাঁরা সাগ্রহে সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। প্রাথমিক সভা অনুষ্ঠিত হল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে পুরনো পোস্ট অফিস স্ট্রীটের একটি বাড়িতে। এই বাড়িটাতে আগে বাস করতেন প্রধান বিচারপতি কোলভিল—বর্তমানে মেসার্স অ্যালেন জাজ এবং ব্যানার্জ্জি ও আইনজীবীদের একটি গোষ্ঠী। এই প্রাথমিক সভাতে যাঁরা উপস্থিত থাকেননি তাঁদের মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ্য, যদিও হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পক হিসাবে হেয়ারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নামও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। নীতি ও ধর্মের সংস্কারক রামমোহন একেবারে গোড়ার থেকেই নিশ্চিতভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর লক্ষ্য-সাধনের উপযোগী সর্বোত্তম পথ হিসাবে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে উন্নততর ইংরেজী শিক্ষার

প্রসার হল অপরিহার্য। নিজের খরচে তিনি একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ডেভিড হেয়ারের পরিকল্পনাগুলি তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেইগুলি কার্যে রূপায়ণের জন্য সোৎসাহ সাহায্যও করেছিলেন তিনি। কিন্তু হিন্দু পৌত্তলিকতার আপোষহীন শত্রু ছিলেন বলে, তাঁর গোঁড়া স্বদেশবাসীরা তাঁকে বিদ্বেষের চোখে দেখত; তিনি অনুমান করেছিলেন তাঁর সেই সভায় উপস্থিতি হয়তো সভার কাজ ব্যাহত করবে, এবং সভা আহ্বানের মূল উদ্দেশ্য হয়তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাঁর এ অনুমান ছিল অভ্রান্ত। হিন্দুমতের প্রতিনিধি কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোক তো সার হাইড ঈস্টকে সত্যি সত্যি বলেছিলেন যে পরিকল্পিত কলেজটিকে তাঁরা পূর্ণ সমর্থন জানাবেন, যদি রামমোহন রায় এর সঙ্গে জড়িত না থাকেন, ঐ স্বধর্মত্যাগীর সঙ্গে কোনরূপ সংস্রব তাদের থাকবে না। পাছে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা পরিকল্পনাটিকে ব্যর্থ করে দেয় সেই ভয়ে রামমোহন স্বেচ্ছায় নিজেকে সরিয়ে আনলেন। তিনি বললেন, "যদি পরিকল্পিত কলেজটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক থাকায় কলেজের স্বার্থহানির আশঙ্কা ঘটে, তাহলে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করছি।" এই মহান শিক্ষাকেন্দ্র, হিন্দু কলেজ, বা মহাবিদ্যালয় (আদিতে হিন্দু কলেজের নাম তাই ছিল) স্থাপনের সমস্ত ব্যবস্থা সমাপ্ত হলে, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি উদ্বোধন করা হল, আপার চিৎপুর রোডে যে বাড়িটি গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ি বলে পরিচিত এবং বর্তমানে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী যেখানে অবস্থিত, সেইখানেই কলেজটি প্রথমে স্থাপিত হল। পরে এটিকে জোড়াসাঁকোয় ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মুদ্রিত

নিয়মাবলীতে বলা হয়েছে কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য হল "হিন্দু সন্তানদের এশিয়া ও ইওরোপের ভাষা এবং বিজ্ঞানসমূহে শিক্ষিত করা।" যদিও ইংরেজী, ফার্সী, ও সংস্কৃত এবং বাংলা এই কয়টি ভাষা শেখাবার প্রস্তাব হয়েছিল, তবুও সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ইংরেজীর উপর। সত্যি কথা বলতে কি, ইংরেজী শিক্ষা লাভের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যই কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। সংস্কৃত শেখান বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছিল একেবারে গোড়ার দিকেই, ফার্সী শেখানও বন্ধ হ'ল ১৮৪১-এ। তারপর থেকে ইংরেজী এবং বাংলাই শেখান হয়ে আসছে।

প্রতিষ্ঠানটির অতি শৈশবেই তার দক্ষ তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। কার্যনির্বাহক একটি পরিকল্পনা স্থির করার জন্য প্রথমে দশজন ইওরোপীয় এবং কুড়িজন দেশীয় ভদ্রলোককে নিয়ে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠিত হল। পরে ইওরোপীয়রা সরে দাঁড়ালেন এবং শুধুমাত্র দেশীয়দের মধ্য থেকে কয়েকজন পরিচালক নিযুক্ত হলেন। তাঁদের মধ্যে দুজন হলেন গভর্নর এবং দুজন হলেন সেক্রেটারী। শিক্ষায়তনটির সমৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উদারভাবে সাহায্য করেছেন—এই বিবেচনায় রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর এবং বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে প্রথম দুই গভর্নর নিযুক্ত করা হল; দেশীয় ডিরেক্টরদের মধ্যে বাবু গোপী মোহন দেব, বাবু জয়কৃষ্ণ সিংহ এবং বাবু গঙ্গানারায়ণ দাসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম দেশীয় সেক্রেটারী নিযুক্ত হলেন বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইওরোপীয় সম্পাদক ছিলেন মেজর আরভিন। কলেজের ইংরেজী বিভাগের তত্ত্বাবধান করবার জন্য বিশেষভাবে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

কয়েক বছর ধরে পরিচালক সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল চার। প্রতিবছর এঁদের নির্বাচিত করতেন ডিরেক্টরেরা। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন ঠিকভাবে মানা হচ্ছে কিনা তাই দেখাই ছিল তাঁদের কর্তব্য। তাঁরা নিয়ম পরিবর্তন করতে পারতেন আবার নতুন নিয়ম তৈবিও করতে পারতেন ; কলেজের দরকারী বিষয় বা প্রয়োজনীয় ব্যাপাব নিয়ে তাঁরা আলাপ আলোচনা করতে পারতেন। শিক্ষক নিযোগ বা বরখাস্ত করার এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁদের ছিল। যখন কোন বিষয়ে পরস্পরবিরোধী মতাবলম্বীদের সংখ্যা সমান হোত তখন প্রশ্নটি যেকোন একজন গভর্নর-এর সম্মুখে উপস্থাপিত কবা হতো, তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত।

সূচনায় প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধিব জন্য ১,১৩,১৭৯ টাকা অর্থ-সাহায্য হিসাবে পাওযা গিয়েছিল। কলেজটি স্থাপিত হওয়া থেকে শুরু করে কয়েক বৎসর পব পর্যন্ত এটি একটি বিশুদ্ধ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, সরকার থেকে কোন প্রকার সাহায্যই পাওয়া যায়নি, কিন্তু ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় হওয়ায়, পরিচালকেরা সবকারের কাছে অর্থসাহায্যের এবং একখানি উপযুক্ত বাড়ির জন্য আবেদন জানালেন। তাঁরা সাহস করে প্রস্তাব দিলেন যে কলেজটি প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের কাছে সরিযে নিয়ে যাওয়া হোক এবং শিক্ষার অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ বিষয়গুলি, যেমন, বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ, বক্তৃতা প্রভৃতি, উভয়ের ক্ষেত্রে একই থাকুক। এর ফলে উভয় প্রতিষ্ঠানই পরস্পরের দ্বাবা উপকৃত হবে। পরের বছর পরিচালকমণ্ডলী জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্স্ট্রাক্শন্স্-এর কাছে অনুরূপ একটি আবেদন জানালেন। কলেজের

ব্যাপক উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে তার আয় যে কত সামান্য তা তাঁরা জানালেন এবং অনুরোধ করলেন যেন সংস্কৃত কলেজের জন্য পরিকল্পিত গৃহের একটি অংশ তাঁদের অধিকার করতে দেওয়া হয়। তাঁরা প্রার্থনা করলেন কলেজকে যেন এমন অর্থসাহায্য দেওয়া হয় যাতে উচ্চতর মানের ছাত্রদের পড়াবার উপযুক্ত একজন শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। তাঁদের আর একটি অভিপ্রায় ছিল যে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্ তাঁদের সেক্রেটারী এবং প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীকে যেন হিন্দু কলেজ পরিচালনার কাজে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেন।

এই আবেদনগুলিতে ঈপ্সিত ফল লাভ হল। সরকার হিন্দু কলেজকে সহায়তা করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। পরীক্ষা-মূলক দর্শনের একজন অধ্যাপকের খরচ তাঁরা দিতে রাজি হলেন এবং সংস্কৃত কলেজের কাছাকাছি বিদ্যালয়টিকে স্থাপন করতে গেলে যে ব্যয় পড়বে তা দেবেন স্থির করলেন। "পরিকল্পিত আর্থিক সাহায্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষায়তনটির পরিচালনার এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কিছুটা কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত হবে" সে সম্পর্কে মন্তব্য দাখিল করবার ভার পড়ল জেনারেল কমিটির উপর।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অংশ গ্রহণের প্রশ্ন নিয়ে জেনারেল কমিটি কলেজের পরিচালকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলেন।

জেনারেল কমিটির একটি পত্র থেকে নিচের অংশটুকু উদ্ধৃত করা হচ্ছে:

"হিন্দু কলেজকে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য প্রদত্ত

হয়েছে, তাছাড়া কলেজের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অন্যান্য বন্দোবস্ত করা হয়েছে—একটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে, বৃত্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সুফলপ্রদ তত্ত্বাবধানের সবচেয়ে উদার পথ গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজ তহবিলে প্রাপ্ত অর্থের প্রায় তিনগুণ খরচ এই ব্যবস্থার ফলে পড়ছে। তাই সরকার মনে করেন প্রতিষ্ঠানটির উপব সমান অনুপাতে কর্তৃত্বের অধিকার জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্‌স্‌কে দেওয়া উচিত।"

কলেজ পরিচালনার কতখানি অধিকার তাঁরা হস্তচ্যুত করতে রাজি আছেন সেই প্রশ্নের উত্তরে কলেজের পরিচালকেরা এই চিঠির উত্তর দেন। তাঁরা লিখলেন যে জেনারেল কমিটি কি ধরনের ব্যবস্থায় আগ্রহী তা তাঁরা জানতে ইচ্ছুক। এর সঙ্গে তাঁবা নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি জুড়ে দিলেন :

"জেনারেল কমিটিব সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের সমর্থনে আমাদের বিনীত প্রস্তাব হচ্ছে পবিচালনার বোধহয় সর্বোত্তম পথ হবে একটি যুক্ত কমিটি নিযোগ করা। সমান সংখ্যক বর্তমান দেশীয পরিচালক এবং জেনারেল কমিটির সদস্যদের নিযে এই যুক্ত কমিটি গঠিত হবে। এই ধরনের ব্যবস্থা হলে আমরা খুব সানন্দে সম্মত হব।

"আমরা মনে করি না যে সব প্রশ্নেই এদেশীয এবং ইওরোপীয় পরিচালকদের মতামত অভিন্ন হবে। যদি কোন ক্ষেত্রে মতদ্বৈধতা দেখা দেয, তাহলে আমাদেব ধারণা, কোন প্রস্তাব নাকচ করার দায়িত্ব দেশীয পরিচালকদের দেওয়া অযৌক্তিক হবে না, অর্থাৎ, যদি কোন প্রশ্নে দেশীয পরিচালকদেব সার্বিক বিরোধিতা থাকে, তাহলে সে প্রস্তাব কার্যে রূপাযিত করা হবে না।"

জেনারেল কমিটি এর উত্তরে যে-পত্র লেখেন তাই এই পর্যায়ের শেষপত্র :

"জেনারেল কমিটি যখন হিন্দু কলেজে কোন প্রকার কর্তৃত্বের দাবি

করছেন তখন তাঁদের শুধু লক্ষ্য হচ্ছে কলেজের উন্নতির জন্য মাঝে মাঝে প্রদত্ত সরকারী অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে কি না তা দেখা। তাঁরা আরো চান যাতে এই শিক্ষায়তনটি ইংরেজী ভাষা চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। এ ছাড়া আর কোনভাবে হস্তক্ষেপ করা তাঁদের অভিপ্রেত নয়। যতদিন তাঁরা জানছেন যে প্রতিষ্ঠানটির অভাব অভিযোগ প্রভৃতির প্রতি দেশীয় পরিচালকেরা সযত্ন ও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন, ততদিন প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধির জন্য তাঁদের আগ্রহ সজীব থাকবে এবং সরকারী আনুকূল্য লাভের জন্য তাঁরা সুপারিশ করবেন। বর্তমানে দেশীয় পরিচালকদের যোগ্যতা বা সৎসঙ্কল্পে সন্দেহ করার মতো কোন কারণ তাঁরা খুঁজে পাননি। তাই কলেজের খুঁটিনাটি পরিচালনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা তাঁদের কাছে সঙ্গত বলে মনে হয় না। তবে দেশীয় পরিচালকেরা তাঁদের সাহায্য এবং পরামর্শ লাভের জন্য যেরকম আগ্রহ দেখিয়েছেন তাতে জেনারেল কমিটি নিয়মিতভাবে কলেজ পরিদর্শনের দায়িত্বভার গ্রহণে প্রস্তুত আছেন। কলেজ পরিদর্শকদের মাধ্যমে তাঁরা অবেক্ষণ-কার্য সম্পাদন করবেন।

"সাধারণভাবে কলেজ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব যথাসম্ভব কার্যকর করার উদ্দেশ্যে তাঁদের অভিপ্রায় হল মাঝে মাঝে সভ্য নিয়োগ করে তাঁদের মাধ্যমে এই কার্য চালানো। বর্তমানে তাঁরা জেনারেল কমিটির সেক্রেটারী মিঃ উইলসনকে দায়িত্বভার অর্পণ করছেন। কমিটির অনুরোধ কলেজের পরিচালকেরা যেন তাঁকে জেনারেল কমিটিরই অংশ বা প্রতিনিধি বলে মনে করেন।

"জেনারেল কমিটি মনে করেন যে কলেজের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন প্রস্তাব তাঁরা পরিদর্শকের মাধ্যমে প্রকাশ করলে কলেজের পরিচালকেরা তাতে সম্মতি প্রদান করবেন। কোন প্রস্তাব গৃহীত না হলে, তার জন্য লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ দেখাতে হবে।"

কলেজ পরিচালনার সুবন্দোবস্তের জন্য এই সকল প্রস্তাবে কলেজ পরিচালকেরা সম্মতি জানালেন। পরবর্তীকালে ডঃ

উইলসন পরিচালক-সমিতির সহ-সভাপতির পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কলেজ পরিদর্শকের যথার্থ প্রেরণা নিয়ে কর্তব্য-ভার গ্রহণ করেছিলেন ডঃ উইলসন। সেই কর্তব্য সম্পাদনে তিনি দেখালেন দক্ষতা, বিচারশক্তি এবং উদ্যমের অপূর্ব সমন্বয়; তার ফলে প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে লক্ষনীয় উন্নতি দেখা দিল। প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে তিনি কলেজ তহবিলের শোচনীয় অবস্থার কথা এবং তা কিরকমভাবে কলেজকে পঙ্গু করে তুলছে সে বিষয়ে উল্লেখ করলেন। তিনি সরকারের কাছে এই দুর্যোগ রোধের পথ নির্ধারণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন যে কলেজটি উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণাধীনে নেই এবং "গত দুবছর ধরে অনাদৃত অবস্থায় আছে," তবে তিনি আন্তরিকভাবে এ আশাও জানালেন যে যেহেতু এখন কলেজ পরিচালকদের কর্মধারার প্রতি সরকারের নজর পড়েছে এবং যেহেতু "সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা-লাভ এখন যোগ্যতানির্ভর হয়ে এসেছে" তাই পরিচালকেরা কলেজের পক্ষে সুবিধাজনক সকল ব্যবস্থাবলম্বনেই প্রয়াসী হয়ে উঠবেন। তাই তাঁর মতে জেনারেল কমিটিব নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারী আনুকূল্য লাভ করলে এই কলেজই "ইওরোপীয় উৎসনির্ঝর থেকে হিন্দুস্থানের চিত্তভূমিতে জ্ঞানস্রোত প্রবাহের প্রধান গতিপথ হবে।" আপনারা সকলেই সানন্দে স্বীকার করবেন এই সম্ভাবনা উত্তরকালে সার্থক হয়ে দেখা দিয়েছে।

ডঃ উইলসনের বিবরণকে ভিত্তি করে সকলশ্রেণীর দেশ-বাসীর কাছে উন্মুক্ত থাকবে এরকম একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপন করার কথা উঠল। মিঃ হোল্ট ম্যাকেঞ্জি একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সপক্ষে বললেন। জেনারেল কমিটির

সভাপতি মিঃ হ্যারিংটন বললেন যে হিন্দু কলেজের কর্মদক্ষতা যাতে যথাসম্ভব বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য তার সঙ্গে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতা করা খুবই অভিপ্রেত। ডঃ উইলসন একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁর মত ছিল যে হিন্দু কলেজের সাংগঠনিক উন্নতি ঘটিয়ে তার অবস্থার সংস্কার-সাধন করাই হবে আরো বেশি যুক্তিযুক্ত। তিনি মনে করতেন যে এর জন্য প্রয়োজন কলেজে উন্নততর শিক্ষকশ্রেণীর নিয়োগ করা এবং কলেজটিকে জেনারেল কমিটির তত্ত্বাবধানে আনা।

কমিটির বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের সপক্ষে। এই কলেজ স্থাপনের সুপারিশসহ একটি বিবরণও সরকারের কাছে প্রেরিত হল। যদিও সরকার এঁদের মতামত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, তবুও পরিকল্পনাটি কার্যকর হয়নি।

একথা এখন বলা দরকার যে সংগৃহীত অর্থ থেকে সঞ্চিত মূলধন,—যা আগেই কিছু পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল. এই সময় আরো কুড়িহাজার টাকার বেশি কমে গেল জে. ব্যারেত্তোর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির পতনের ফলে; কলেজের মূলধন এই প্রতিষ্ঠানটিতেই গচ্ছিত রাখা হয়েছিল। দুবছর দেরীর পর কলেজ পরিচালকেরা সম্পত্তির ধ্বংসাবশেষ থেকে একুশ হাজার টাকা পেলেন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের মাসিক আয়ের পরিমাণ ছিল ৮৪০ টাকা; নিম্নলিখিত বিভিন্ন খাত থেকে এ টাকা আদায় হোত :—

কলেজের মূলধন থেকে প্রাপ্ত সুদ······৩০০ টাকা
বেতন বাবদ প্রাপ্ত······· ············৩৫০ ,,
স্কুল সোসাইটির বৃত্তি বাবদ প্রাপ্ত······১৫০ ,,
গুদামের ভাড়া বাবদ··············· ··· ৪০ ,,

মিঃ লাইং (Mr. Laing) আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে দেবার আগে আমাদের সরকারের যেরকম অবস্থা ছিল, এই সময় এই কলেজটির অবস্থাও ছিল সেইরকম। পরিচালকেরা সরকারের কাছে সাহায্যলাভের জন্য দরবার করলেন; প্রথম দফায় তাঁরা মাসিক ৩০০ টাকা করে সাহায্য পেলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সাহায্য বৃদ্ধি পেয়ে মাসিক ৯০০ টাকায় দাঁড়াল; ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আবার এই সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হল ১২৫০ টাকা। এই নিয়মিত মাসিক সাহায্য ছাড়াও সরকার ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের জন্য বৃহৎ পরিমাণ অর্থ দান করলেন এবং গ্রন্থাগারের বই কেনবার জন্য আরও পাঁচ হাজার টাকা দিলেন।

বহুসংখ্যক ছাত্র অত্যন্ত আগ্রহভরে পড়বার উদ্দেশ্যে যেত গ্রন্থাগারে। যেসব বই ছাত্ররা পড়বার জন্য ধার করত সেগুলো দেখে মনে হয় যে এলোমেলোভাবে পড়াই তাদের ভাল লাগত। অবশ্য ডঃ জনসন বলেছেন যে সাধারণভাবে যতটা মনে করা হয়, অসংলগ্নভাবে পড়াশোনা করা ততটা লাভবর্জিত নয়।

ইতিমধ্যে বেতন বাবদ প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে মাসিক আয় দাঁড়িয়েছিল ২,২৪০ টাকা; এর মধ্যে ১০০০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল মাইনে থেকে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজের মোট মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩২৭২ টাকা; তার মধ্যে প্রায় ১৫,০০০* টাকা পাওয়া গিয়েছিল

*মূল গ্রন্থে দেওয়া এই পরিমাণটি ছাপার ভুল; বোধ হয় ১৫০০ হবে।

মাইনে থেকে। এর পরে কয়েক বছর ধরে এই খাতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ কমে যেতে শুরু করল; কিন্তু সরকার এই ঘাটতি মিটিয়ে দিলেন।

কলেজ শুরু হয়েছিল মাত্র কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে। যদিও প্রতিষ্ঠানটির মূল নিয়মাবলী অনুযায়ী শিক্ষা বাবদ বেতন ছাত্রদেরই দেবার কথা ছিল, তবু যে-পদ্ধতিতে ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন চাওয়া হতো, তা প্রথমে ফলপ্রসূ হয়নি। তাই পরিচালক সমিতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুআরি থেকে কলেজটি একটি অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হবে। কেবলমাত্র ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকেই পঁচিশজন বেতন প্রদানকারী ছাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছিল, তাদের প্রদত্ত মোট মাসিক বেতনের পরিমাণ ছিল ১২৫ টাকা। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে বেতন প্রদানকারী ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল সত্তরজনে, এই খাতে কলেজের মাসিক আয়ের পরিমাণ তখন হল ৩৫০ টাকা।

এই বছরের শেষে ছাত্রসংখ্যা হল ১১০ জন, পরবর্তী বছরের শেষে তা গিয়ে দাঁড়ালো ২২৩ জনে। পরের দুবছর ধরে বেতনদায়ী ছাত্রের সংখ্যা বাড়তে লাগল। ১৮২৭-এর শেষে তাদের সংখ্যা হল ৩০০ এবং ১৮২৮-এর ডিসেম্বরে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো ৩৩৬ জনে। অধ্যয়নের জন্য বেতন দানে পূর্বকালীন অনিচ্ছার সঙ্গে এখনকার আগ্রহের বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে অনেকে মন্তব্য প্রকাশ করে-ছিলেন এবং এর ফলে বেতন প্রদানকারী ছাত্রদের ভর্তিসংক্রান্ত যে মূল নিয়ম ছিল তা বাতিল করে দিতে হয়েছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ছাত্রদের বেতন বাবদ মাসিক আয়ের

পরিমাণ ছিল ১১২৫ টাকা ; দুবছর পরে এই পরিমাণ হল ১৭০০ টাকা। এর পর অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটল। এই ক্রমাবনতির মূলে ছিল দুটি কারণ ; প্রথমটি হল সাময়িক ত্রাস এবং দ্বিতীয়টি হল তৎকালীন ব্যবসায়িক মন্দা। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে মাহিনা বাবদ প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণ কমে গিয়ে মাসিক ৮০০ টাকায় দাঁড়িয়েছিল। এর পর থেকে অবশ্য পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র ছাত্রদের মাহিনা বাবদ প্রাপ্ত বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দাঁড়াল ৩০,০০০ টাকায়।

অনেক বছর ধরে উচ্চ বা নিম্ন মানের সকল শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত বেতনের হার ছিল সমান। সকলের কাছ থেকেই নির্দিষ্ট মাসিক পাঁচ টাকা আদায় করা হতো। কয়েক বছর আগে উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে মাহিনা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তখন থেকে কলেজ বিভাগে মাসিক মাহিনা নির্ধারিত হয় ৮ টাকা, বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে ৬ টাকা এবং নিম্নতর শ্রেণীগুলিতে ৫ টাকা। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, কলেজ বিভাগের ছাত্রদের একটি বৃহৎ অংশ ছিল বৃত্তিভোগী, মাহিনা হিসাবে তাদের কিছুই দিতে হোত না।*

*এই সমস্ত খুঁটিনাটির জন্য আমি শুধুমাত্র আমার স্মৃতির উপরই নির্ভর করিনি। কলেজের মূল নথিপত্র আমি ঘেঁটেছি এবং সেগুলির সঙ্গে মিঃ কার-এর 'রিভিউ অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকশন্‌স্'-এ বিধৃত বিবৃতিগুলি মিলিয়েছি। কলেজের শেষ গভর্নর বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এবং কলেজের সহ-সম্পাদক বাবু হরমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমার সকৃতজ্ঞ ঋণ স্বীকার করি। এঁরা কলেজের আদি ইতিহাস সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য আমায় সরবরাহ করেছেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজকে প্রদত্ত সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল ত্রিশ হাজার টাকা। এই সময় থেকে 'কমিটি অফ্ পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্'-এর মাধ্যমে সরকার কলেজের ব্যাপারে আরো সক্রিয় আগ্রহ দেখাতে শুরু করলেন। মেকলে, সার এডওয়ার্ড রায়ন এবং মিঃ চার্লস হে ক্যামেরন পর পর এই কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন; কলেজের পরিচালনার ব্যাপারে তাঁরা সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। তাঁরা কলেজ পরিদর্শন করতেন, কলেজের কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে দিতেন এবং কলেজের বার্ষিক পরীক্ষাগুলি পরিচালনা করতেন। এছাড়া কলেজের সাংগঠনিক কতকগুলি পরিবর্তনও তাঁরা সাধন করেছিলেন।

কলেজের উন্নতির জন্য তাঁদের উদ্যোগ-উদ্যম সকল প্রশংসার ঊর্ধ্বে। পরবর্তীকালে 'কাউন্সিল অফ এডুকেশন'-এ রূপান্তরিত এই কমিটি অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন্‌স্ তাঁদের সংবিধানদত্ত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করেও কলেজের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। দেশীয় পরিচালকেরা যেসমস্ত বিষয়ে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সে সমস্ত ব্যাপারেও তাঁরা কর্তৃত্ব করতে শুরু করলেন। অধিকার নিয়ে এই বিরোধিতাকে কেন্দ্র করে কলেজের পরিচালন-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার সাধারণ প্রশ্ন উঠল। এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দল দুইটির মুখ্য সদস্যদের একটি সম্মেলন বসল। কলেজের সম্প্রসারণে এবং সংস্কার সাধনে সরকারী উদ্যোগ দেখে দেশীয় সভ্যরা কলেজের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিন্ন করতে রাজি হলেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে হিন্দু কলেজ প্রকৃতপক্ষে উঠে গেল, কেবল এর নামটি বজায় রইল। এর নিম্নতর

বিভাগটি হিন্দু স্কুলরূপে এখন বর্তমান; উচ্চতর বিভাগটির বর্তমান রূপ হল প্রেসিডেন্সী কলেজ। এই বিভাগটিকে কেন্দ্র করেই কলেজটি গড়ে উঠেছে।

হিন্দু কলেজ সম্পর্কিত যেকোন বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি এই প্রসঙ্গে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি এবং তার স্কুলগুলির কথা উল্লিখিত না হয়। দুইটি প্রতিষ্ঠানই ছিল পরস্পর-নির্ভর এবং এই নির্ভরশীলতা উভয়ের পক্ষেই সুফল-প্রসূ ছিল। স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। এই সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল "চালু প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা করা এবং তাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা। তাছাড়া বিশিষ্ট মেধাযুক্ত বাছাই ছাত্রদের উন্নততর শিক্ষণপদ্ধতিতে দীক্ষিত করে তাদের শিক্ষক বা শিক্ষানির্দেশক হিসাবে গড়ে তোলাও ছিল" এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি একটি পরিচালক সমিতির নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। এই সমিতির সদস্য ছিলেন চব্বিশ জন; তাঁদের মধ্যে ষোল জন ছিলেন ইওরোপীয় এবং আটজন এদেশীয়। উল্লিখিত ভদ্রলোকেরা এর বিভিন্ন বিভাগের ভার পেয়েছিলেন:

সার আন্টনি বুলার ... ... সভাপতি
জে. এইচ. হ্যারিংটন এবং
জে. পি. লার্কিন্স ... ... সহ-সভাপতি
জে. ব্যারেন্তো ... . কোষাধ্যক্ষ
এস. ল্যাগ্রান্ডি . ... সংগ্রাহক
ডেভিড হেয়ার ... ... ইওরোপীয় সম্পাদক

বাবু (বর্ত্তমানে রাজা) রাধাকান্ত দেব

... ... এদেশীয় সম্পাদক

সোসাইটির লক্ষ্যকে নিশ্চিতভাবে সফল করে তোলবার জন্য কমিটি তিনটি সাব-কমিটিতে বিভক্ত হয়েছিল; তিনটি মুখ্য পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা ছিল এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এর প্রথমটি হল সীমিত সংখ্যার কতকগুলি নিয়মিত বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং সেগুলিকে সাহায্য করা; দ্বিতীয়টি হল দেশীয় বিদ্যালয় বা পাঠশালাগুলিকে সাহায্য করা এবং তাদের উন্নতির চেষ্টা করা; তৃতীয় পরিকল্পনাটি হল কতকগুলি বাছাই ছাত্রকে ইংরেজী ও অন্য কয়েকটি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দেওয়া।

প্রথম বছরের শেষে প্রদত্ত দানের পরিমাণ ছিল প্রায় দশ হাজার টাকা। এইরকম উদার সাহায্য পাওয়ার ফলে সোসাইটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজগুলি শুরু করতে পেরেছিল। দুটি নিয়মিত বা (যে নামে তাদের ডাকা হোত সেই)'নমিন্যাল' স্কুল স্কুল সোসাইটি কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। দেশের চালু প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে অন্তরায় সাধন না করে সেগুলির আদর্শ-স্থানীয় হয়ে তাদের উন্নতি বিধান করাই ছিল এই বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের উদ্দেশ্য। যেসব সন্তানদের অভিভাবক তাদের পড়াশোনার জন্য মাইনে দিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক ছিলেন, তাদের শিক্ষা দেবার জন্যই বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল। এখনকার মতো শিক্ষার আদর তখন ছিল না, সুতরাং সোসাইটি কর্ত্তৃক এই অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। আমি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত যে সাধারণভাবে শিক্ষার বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করা উচিত, তা নাহলে এর উপযুক্ত মূল্য পাওয়া যায় না। তবু যেখানে শিক্ষার চাহিদা

নেই সেখানে সে চাহিদা সৃষ্টি করা অপরিহার্য। স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে এই প্রকল্প চরিতার্থতা লাভ করেছিল। ঠনঠনিয় এবং চাঁপাতলা, এই উভয় স্থানের দুটি বিদ্যালয়েরই সাফল্য ছিল লক্ষনীয়। পূর্বোক্ত বিদ্যালয়টি কর্নওআলিশ স্ট্রীটে কালীমন্দিরের প্রায় বিপরীত দিকে অবস্থিত ছিল। বিদ্যালয়টিতে ছিল ইংরেজী এবং বাংলা এই দুইটি বিভাগ। এখন যেখানে বাবু ভুবনমোহন মিত্রের বিদ্যালয়, সেইখানেই চাঁপাতলার বিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল। এটি ছিল পুরোপুরি ইংরেজী বিদ্যালয়। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বিদ্যালয় দুটি মিলিত হয়ে গেল এবং এর নাম হল ডেভিড হেয়ারেব বিদ্যালয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিব নাম কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল। (একদিকে) হিন্দুকলেজ এবং (অন্যদিকে) ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি দ্বাবা চালিত স্বাধীন বিদ্যালয়গুলির মধ্যে এই বিদ্যালয়টি বরাবর সংযোগ বক্ষা করে এসেছে। এই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন ছাত্রদেব সোসাইটির খরচে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ কবার জন্য পাঠান হোত। এই ছাত্রদের সংখ্যা বরাবর ছিল ত্রিশ। সব সময়েই কলেজের সবচাইতে বিশিষ্ট ছাত্র বলে পরিচিত হোত এইসব ছেলেরাই; সমস্ত সহপাঠীদের মধ্যে তারাই কৃতিত্বে ভাস্বর হয়ে উঠত। সমস্ত সম্মানের স্থান তাবাই অধিকার করত; বেতনদায়ী ছাত্রদের চাইতে তাদের কৃতিত্বের দীপ্তিচ্ছটাতেই বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠত কলেজটি। তাদেব এই সাফল্যের সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তারা ছিল অপেক্ষাকৃত দরিদ্র; প্রস্তুতিমূলক বিদ্যালয়গুলিতে তাদের পরিশ্রম করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেত; তাছাড়া পুরস্কার আর বৃত্তি তাদের জোগাত প্রেরণা। সুপরিচালিত একটি

উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তারা সংগৃহীত হোত। স্কুলেই তারা পড়াশুনায় তাদের সঙ্গী-সাথীদের ছাড়িয়ে যেত, সেখানেই তাদের অধ্যয়নস্পৃহা জেগে উঠত। অন্যদিকে কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন বৃত্তিভোগী বা বেতন প্রদানকারী ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল ধনীসন্তান, বিলাসিতার অঙ্কে তারা লালিত হোত। সুতরাং এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে ভোগ-বিলাসীর দল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাল্লায় হেরে যাবে কঠিন কঠোর 'বোরিয়া'দের কাছে (হেয়ারের ছাত্রদের উপহাস করে এই নামে ডাকা হোত); কেননা এরা জেনেছিল যে তাদের পক্ষে ঐশ্বর্য ও সম্মানের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের একমাত্র ছাড়পত্র হল কলেজী শিক্ষায় পারদর্শিতা।

এইরকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুকলেজ হিন্দুজাতির উন্নতির এবং অগ্রগতির একটি মহৎ মাধ্যমে পরিণত হল। আগেই বলা হয়েছে, আপার চিৎপুর রোডের একটি ছোট বাড়িতে গুটিকয়েক ছাত্রকে নিয়ে কলেজটি প্রথমে খোলা হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দুটি বিভাগে কলেজটি বিভক্ত ছিল : সিনিঅর এবং জুনিঅর। বিভাগ দুটি আলাদা আলাদা কক্ষে অবস্থিত ছিল, কিন্তু একজন প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্বাধীনেই ছিল বিভাগ দুটি। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন মিঃ ডি' আনসেলেম ; এই পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থেকে তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ছাত্রদের পরিচালনা করার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট দক্ষতা এবং সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে সিনিঅর বিভাগে সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হলেন মিঃ হেনরী ভিভিআন ডিরোজিও। তাঁর নিয়োগের উপর আমি

অনেকখানি গুরুত্ব দিচ্ছি, কেননা এর ফলে হিন্দু কলেজের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।

অত্যুজ্জ্বল সাফল্যে দীপ্ত ডিরোজিওর শিক্ষক-জীবন। অন্যান্য অসংখ্য অধ্যাপক বা স্কুল শিক্ষকের তুলনায় শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ ছিল অনেক বেশি মহৎ, অনেক বেশি খাঁটি। তাই তিনি মনে করতেন তাঁর কর্তব্য হল শুধু কথা নয়, কাজ শিক্ষা দেওয়া ; শুধু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়কেও স্পর্শ করা।

তিনি তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ককে বোঝাই না করে, উদার এবং প্রগতিশীল ভাবধারায় ছাত্রদেব সঞ্জীবিত করতে চাইতেন। এই ছিল তাঁর নীতি, এরই সাহায্যে তিনি তাঁর ছাত্রদের চেতনার আলোয় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাদের চিন্তা করতে শেখাতেন এবং তাদেব স্বদেশবাসীরা যে প্রাচীন ধর্মান্ধতায় বন্দী হয়েছিল তার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার প্রেরণা জোগাতেন। মানসিক এবং নৈতিক দর্শনে প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন তিনি, ছাত্রদেব মধ্যে সে জ্ঞান তিনি সঞ্চারিত করতেন। তিনি ছিলেন গভীর অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী ; তাই লক, রিড, স্টুয়ার্ট এবং ব্রাউনের রচনার সঙ্গে তিনি ছাত্রদের পরিচয় ঘটিয়ে দিতেন। মহান এবং মৌলিক যুক্তিতে চিহ্নিত হোত তাঁর বক্তৃতাগুলি ; স্বনামধন্য স্বর্গত সার উইলিঅম হ্যামিলটনের পক্ষেও সে বক্তৃতা অগৌরবের হোত না। ছাত্রদের উন্নতির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা শুধুমাত্র ক্লাসরুমেই সীমিত থাকত না ; নিজের বাড়িতে, বিতর্ক-সভায় এবং অন্যান্য স্থানে তিনি ছাত্রদের সঙ্গে সানন্দে মিলিত হতেন, তাঁব পরিশীলিত মনের সমস্ত রত্নসম্পদ

তিনি উজাড় করে দিতেন তাদের কাছে। তিনি দ্রুতগতিতে বক্তৃতা করতে পারতেন না কিন্তু শ্রোতাদের মনে তাঁর বক্তব্য দাগ কেটে যেত। তাঁর বক্তৃতা হোত গভীর অর্থবহ, তথ্য এবং তত্ত্ব তাতে দুইই থাকত। কলেজের দেশীয় পরিচালকেরা কুসংস্কারের আবহাওয়ায় লালিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর ছাত্রদের প্রগতিশীলতা দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই ছাত্রদের অগ্রগতি সম্পর্কে তখনকার একটি খবরের কাগজ প্রায় খাঁটি কথাই বলেছিল : "শূকর ও গরুর মাংস দিয়ে তারা নিজেদের পথ তৈরি করে নিচ্ছে ; বিয়ার মদের পাত্রগুলি হল উদারনৈতিকতার সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া বাঁধার মাধ্যম।" ইতিহাসের অনেক আলোকিত অধ্যায়ের অনেক আলোকপ্রাপ্তদের মতো এই কলেজ পরিচালকেরাও তাঁদের অভ্যস্ত গণ্ডীর সংস্কারের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তাই কলেজ ছাত্রদের এই নবীনত্বের প্রেরণার মধ্যে তাঁরা দেশের পক্ষে বিপজ্জনক ইঙ্গিত ছাড়া আর কিছুই দেখতে পানান। ছাত্রদের এই ধর্মবিরোধী আচরণে তাঁরা তাই স্বাভাবিকভাবেই শিউরে উঠেছিলেন ; ডিরোজিওকে পদচ্যুত করে তাঁরা এই গতিকে রোধ করতে চাইলেন। কিন্তু যে বীজ পোঁতা হয়েছিল, তা অঙ্কুরিত হল এবং বিশাল মহীরূহে পরিণত হল, ভবিষ্যতে তাতে স্বাদুফল ফলল।

প্যাস্কাল তাঁর অতুলনীয় পত্রগুচ্ছের একটিতে বলেছেন : "পৃথিবীর গতি সম্পর্কে গ্যালিলিওর মতবাদকে নিন্দিত করে জেসুইটরা পোপের একটি ডিক্রী পেয়েছে। কিন্তু এ হল নিরর্থক। পৃথিবী যদি সত্যিই ঘোরে, তাহলে সমস্ত মানবজাতিও তাকে থামাতে পারবে না, কিংবা সেইসঙ্গে নিজেদের

ঘোরা রোধ করতে পারবে না।" বিশ্বের গতি রোধ করতে ভ্যাটিকান প্রাসাদের ডিক্রী যতটা ব্যর্থ হয়েছিল, এ দেশের মহান নৈতিক বিপ্লব বন্ধ করতে ঠিক ততটাই ব্যর্থ হল ডিরোজিওর পদচ্যুতির জন্য কলেজ পরিচালকদের নির্দেশনামা। গঙ্গার জোয়ারে অগ্রগামী তরঙ্গের মতো এই বিপ্লবের ধারা সমস্ত দেশকে প্লাবিত করবে, এর অব্যাহত গতিপথ হবে সত্য আর ধর্মের মন্ত্রে উজ্জীবিত। অগ্রগতি ভগবানের নির্দিষ্ট নিয়ম, মানুষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় তাকে থামানো যায় না। জ্ঞানের পরিধি যতই বিস্তৃত হয়, আহরিত তথ্যের পুঁজি যতই সমৃদ্ধ হয় এবং মন যতই সিদ্ধান্তগ্রহণের উপযোগী হয়ে ওঠে, অবিশ্বাস ততই বেড়ে যায়, অনুসন্ধিৎসার প্রেরণা হৃদয়ে ততই সঞ্চারিত হয়।

যে তরুণ সংস্কারকের দল হিন্দু কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, নবীন প্রত্যূষের উদয় কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষের মতো তাঁদের মধ্যেই হয়েছিল, তারপর তা প্রতিফলিত হয়েছিল চারিদিকে। যে রশ্মি প্রথমে পর্ব্বতশিখরকে আলোকিত করেছিল, তা আস্তে আস্তে সমতল ভূমিতে ছড়িয়ে পড়েছে; আমার বিশ্বাস শীঘ্রই গভীরতম উপত্যকায়, নিম্নতম ধান্যক্ষেত্রে সে আলো উজ্জ্বল হয়ে ফুটবে। বাবু রামগোপাল, হিন্দু কলেজের যে আদি ও বিশিষ্ট ছাত্রদের মধ্যে আপনি অন্যতম, তাঁরাই ছিলেন আমাদের পথিকৃৎ; অধ্যাত্মপথের নির্দেশকদের বিরুদ্ধে তাঁরাই প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, হিন্দুধর্মকে তাঁরাই প্রথমে যুক্তির কাঠগড়ায় টেনে এনেছিলেন।

তাঁরা একথা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনে একথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন যে নৈতিকতার

দিক দিয়ে যা মিথ্যা, ধর্মের ক্ষেত্রেও তা কখনও খাঁটি হতে পারে না। (ধর্মের) সমস্ত কাঠামোটির ভিত্তি এইভাবে অনাবৃত এবং নির্মম বিচারের সম্মুখীন হয়েছিল। মনে হল সমস্ত কাঠামোটি এইভাবে ভেঙে পড়বে। যে ভারতবর্ষ এতদিন সংস্কারের ভস্মস্তূপে চাপা পড়েছিল মনে হল সেখানে নবীন অভ্যুদয়ের সূচনা দেখা যাচ্ছে, মনে হল ভারতবর্ষ আবার নিজের পায়ে দাঁড়াবার জোর পাচ্ছে।

এইরূপ উত্তেজনা ও পরিবর্তনের মুহূর্তে আমাদের কয়েকজন সংস্কারক হিন্দুধর্মত্যাগের সুস্পষ্ট পরিচয় দিলেন। এর ফলে তাঁদের রক্ষণশীল স্বজাতিরা তাঁদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য বিদ্বেষ দেখাতে লাগলেন। কিন্তু কোথায়ই বা দেশের সংস্কারকেরা এবং উন্নতি-বিধায়কেরা ভ্রান্তির পৃষ্ঠপোষকদের হাত থেকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অর্ঘ্য পেয়েছে? যা জনসাধারণের মত ও বিশ্বাসের বিরোধী, তা কবেই বা সফল হয়েছে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে? কিন্তু সুখের কথা এই, সংস্কারের পথে এই সব বাধাবিপত্তিকে আমাদের সংস্কারকেরা দুস্তর বা অনতিক্রমণীয় বলে মনে করেননি। এঁদের অনেককেই সমাজচ্যুত করা হয়েছিল এবং তার সমস্ত অসুবিধাগুলি তাঁরা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন তাঁরা, তাঁদের দৃষ্টান্ত তরুণ দেশবাসীর অনুকরণীয় হওয়া উচিত।

তাই আমি আমার শিক্ষিত স্বদেশবাসীদের একথা স্মরণ করার জন্য আহ্বান জানাই যে সকল ধর্মের সংস্কারই হওয়া উচিত আভ্যন্তরীণ; আমাদের দেশবাসীর ধর্মমতে মাঝে মাঝে যে মহান পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, সে পরিবর্তন জন্ম নিয়েছে জনসাধারণের মধ্য থেকেই। আমি দেশের মানুষকে আহ্বান

জানাই সংস্কারক এবং নূতনত্বের স্রষ্টাদের উচ্চতায় নিজেদের উন্নীত করতে, ভ্রান্ত ধারণা ও দূষিত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে।

এই নৈতিক বিপ্লব যে-প্রগতির সূচনা করেছে তার জন্য আমরা মুখ্যত ঋণী ডেভিড হেয়ারের বিচক্ষণতা ও বিচারবোধ, বিজ্ঞতা ও বিবেচনাশক্তির কাছে।

তাঁর উপযোগিতার কথা বলতে গিয়ে আমি একথা বোঝাচ্ছি না যে, তিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিতেন বা ক্লাশে ক্লাশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। তবু প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন শিক্ষাপ্রসারক এবং সংস্কারক। তিনি শিক্ষকদের কাজ খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের নির্দেশও দিতেন। ছাত্রদের অগ্রগতির চিন্তা তাঁর সমস্ত মন অধিকার করে থাকত। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি প্রতিদিন স্বচ্ছন্দভাবে মেলামেশা করতেন। তাদের সুখদুঃখের অংশভাগী ছিলেন তিনি। তাদের আমোদ-প্রমোদে তিনি যোগ দিতেন, তাদের অভিযোগ শুনতেন এবং পরামর্শ দিতেন। তাদের চাকরি-বাকরি পাওয়ার ব্যাপারে সহায়তা করতেন তিনি, আবার অনেককে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার যুক্তিও দিতেন। তাদের উদ্যম এবং বিচারবুদ্ধি যাতে ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল; তারা যদি হঠাৎ কোন দুঃসাহসিক পরিকল্পনা কার্যকর করে তুলতে চাইত তিনি তাদের নিবৃত্ত করতেন। তিনি তাদের শিখিয়েছিলেন সংস্কারের কাজে কি রকম বিচারবোধ এবং দূরদর্শিতা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যদিও অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর ছিল না, তবুও সাধারণভাবে বলতে গেলে অনেক কিছুই জানতেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে উল্লেখ্য হল তাঁর সারল্য ও

আন্তরিকতা। এই গুণের ফলেই তিনি কলেজের ছাত্রদের ওপর অমিত প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এই অনন্যসাধারণ পুরুষটির চরিত্র চিত্রণ করার আগে আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই একটি প্রশ্নের প্রতি। সেই প্রশ্নটি এতক্ষণে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে : হিন্দু কলেজ থেকে যে শিক্ষার আলো বিকীর্ণ হয়, তা কি তার অভীপ্সিত সার্থকতা লাভ করেছে? অনেকে এই শিক্ষাকে ধর্মবিরোধী বলে নিন্দা করেছেন এবং চেয়েছেন যাতে শ্রেণীপাঠ্য হিসাবে বাইবেল নির্ধারিত হয়। মহাশয়, ধর্মমূলক শিক্ষার সেই বিরক্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করার অভিপ্রায় আমার নেই; যদিও নৈতিক এবং ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতির গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে অবহিত, তবু অবিজ্ঞোচিত এবং অবাস্তব বিবেচনা করে এই প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে আমি বাধ্য। আমার ধারণা, যুক্তি দিয়ে এবং প্রজাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে অনুসৃত নীতির দ্বারাই পরিচালিত হতে বাধ্য। কোন কোন দল থেকে অভিযোগ উঠেছে যে হিন্দু কলেজে অনুসৃত নীতিতে মানুষের আধ্যাত্মিক দিকটির প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি, কিন্তু এই অভিযোগ আমি সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। (ছাত্রদের) শুধু ধর্মনিরপেক্ষ করে গড়ে তোলবার জন্য এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, একথা আমি জোরের সঙ্গে অস্বীকার করি। যাঁরাই এই নীতির প্রভাব-ছায়ায় লালিত হয়েছেন তাঁরাই নৈতিকভাবে এবং ধর্মানুভূতির দিক দিয়ে অশেষ উপকার লাভ করেছেন। মানুষ, তার ইতিহাস, তার রাজনীতি, তার সৃষ্টি ও আবিষ্কার সম্পর্কিত মহান সত্যে দীক্ষিত হয়েছেন;

আবার ঈশ্বর, তাঁর গুণাদি এবং নৈতিক শাসন সম্পর্কেও তাঁরা প্রজ্ঞা লাভ করেছেন। সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা কি নিয়মের সূত্রে বস্তুবিশ্ব ও মনোজগৎকে গ্রথিত করে রেখেছেন, সেই সত্যও তাঁদের কাছে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাই একথা কেউ যেন না বলেন যে আমাদের চারপাশে মানসিক এবং চিন্তার জগতের যে পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে তার সঙ্গে হৃদয়ের উদারতার কোন যোগ নেই বা নৈতিক সচেতনতা এবং ধর্মানুভূতির ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে তা সম্পর্করহিত। সরকারী শিক্ষাব্যবস্থাকে অনেক গোষ্ঠী ধর্মবিরোধী অথবা ধর্মনিরপেক্ষ বলে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু এর চাইতে অশোভন আর কিছুই হতে পারে না। প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির অন্তরাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের কাছে উপনীত ক'রে যে শিক্ষাপদ্ধতি, তার সম্পর্কে কখনই একথা বলা চলে না।

ঈশ্বরতাত্ত্বিক মতবাদে কোন পদ্ধতিতে দীক্ষিত না করেও নৈতিকতা এবং ধর্মের প্রেরণা মনের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। শেক্সপীআর, মিল্টন, বেকন, নিউটন, জনসন এবং অ্যাডিসনের রচনার মধ্যে যে পবিত্রতম নৈতিক বিধিবিধান এবং উন্নততম ধ্যানধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, হৃদয়ের মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে না পারলে এই সব লেখকদের বোঝা অসম্ভব। মানুষের ধর্মসচেতন বৃত্তিকে স্পর্শ করে তার সুপ্ত ধর্মানুভূতিকে জাগিয়ে তোলে এগুলি। বাইবেলকে শ্রেণীপাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করার আমার প্রথম আপত্তির কারণ হল বাইবেল-ব্যাখ্যার যোগ্য ব্যক্তির অভাব ; তাছাড়া এভাবে বাইবেল পাঠ প্রবর্তন করলে তা শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের বহুঘোষিত নিরপেক্ষতা নীতির প্রত্যক্ষ বিরোধী বলে গণ্য হবে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে সরকার এবং প্রজাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রাদেশিক চার্চের

উপাদান অনুপ্রবেশ করবে; দেশের প্রকৃত ধর্মের কল্যাণাবহ উন্নতির পথে তা বাধা সৃষ্টি করবে। আমি মনে করি রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক থাকা উচিত নয়; যদি থাকে, তাহলে তার অবশ্যম্ভাবী এবং অপরিহার্য ফল হবে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি-গুলির সংমিশ্রণে আধ্যাত্মিক চেতনার বিশুদ্ধির বিনাশ। ইওরোপের ইতিহাসে এর অজস্র উদাহরণ বিধৃত হয়ে আছে। যদি প্রয়োজন হয় আমি আমার তত্ত্বের বাড়তি প্রমাণ হিসাবে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর উল্লেখ করতে পারি: সেখানে এদের মধ্যে ভয়াবহ পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে অধ্যাত্মচেতনার অভাব।

আবার ডেভিড হেয়ারের কথায় ফিরে আসি। হেয়ার ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই নিয়োগের আগে এবং পরে কলেজের জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করেছিলেন তিনি; এ সম্পর্কে কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন্ নিম্নরূপ মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করেছিলেন:

এই কল্যাণব্রতী পুরুষটির গুণাবলীর দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা জেনারেল কমিটি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন দেশীয়দের শিক্ষায় যাঁরা উৎসাহ দেখিয়েছেন, ডেভিড তাঁদের সকলের মধ্যে অগ্রণী। রাজধানীর দেশীয় অধিবাসীরা প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ইংরেজী ভাষা চর্চা করতে উৎসাহী হয়েছিল, এর আগে ইওরোপীয়দের সঙ্গে ব্যবসা করতে যতটুকু লাগে ততটুকু ইংরেজীই তারা শিখত। কিন্তু এখন তাদের কাছে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার সবচেয়ে প্রশস্ত পথ হ'য়ে উঠেছে ইংরেজী ভাষা। স্কুল সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ গঠনের কাজে তিনি সহায়তা করেছিলেন। বছরের পর বছর তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি সাধন করেছেন, এর জন্য তাঁর জীবনের শুধু অংশমাত্র নয়, সমগ্র জীবনই

দান করেছেন। ভীরুর উৎসাহদাতারূপে, জ্ঞানহীনের উপদেষ্টারূপে, অলস বা মন্দের সস্নেহ সংশোধকরূপে তিনি সর্বদাই সক্রিয়। ছাত্রদের মধ্যে বিবাদ সংক্রান্ত ব্যাপার তাঁর কাছে উপস্থিত করা হয়, পিতা এবং পুত্রের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য প্রায়ই তাঁব ডাক পড়ে। জেনারেল কমিটি মনে করেন বিনিময়ে জনসাধারণেব তরফ থেকে কিছু পাবার তিনি যথার্থ অধিকারী। জেনারেল কমিটির বিশ্বাস সপবিষদ লর্ড এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করবেন—শুধু হেযারের কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবশত নয়, জনগণেব বুদ্ধিগত ও নীতিগত উন্নতি সাধনে তাঁর মতো প্রযাসকে ভাবত সবকার কি দৃষ্টিতে দেখেন তা জানাবার জন্যও। এই সম্মান প্রদর্শন খুব অসুবিধাজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলে জেনারেল কমিটি মনে কবেন না। এমন লোক খুব কমই পাওযা যাবে যাঁরা হেযারের মতো বছরের পর বছর তাঁদের উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করবেন—কোন পুবস্কাবের আশায নয়, শুধু মহৎ কাজ করার আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য।

কুসংস্কার আর অজ্ঞানতাব শৃঙ্খল থেকে এদেশবাসীকে মুক্ত কবাই ছিল হেযাবের ব্রত। এ উদ্দেশ্য সার্থক করে তোলবার জন্য তিনি তাঁব সমস্ত উদ্যম, সময, তাঁর সম্পদ, তাঁর জীবন পর্যন্ত ব্যয কবেছিলেন। তাঁর মহান ধাবণা ছিল যে, দেশীয লোকেবাও চরম উন্নতি লাভ করতে সক্ষম, তাঁর এই ধারণা আমাদেব কাছে উজ্জ্বল রূপ নিয়েছে তাঁর বৃত্তি এবং কর্মেব ফলশ্রুতি হয়ে। তাঁব সুদূরপ্রসাবী লক্ষ্য ছিল নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষসাধন। আমাদের জাতির জন্য তাঁর স্বার্থহীন স্নেহানুভূতি আমি এবং সভাপতি মহাশয়, আপনি, উভয়েই প্রত্যক্ষ করেছি, সেই অনুভূতিতে কতটা শক্তি ছিল তা আমরা অনুভব করেছি, যারা তা দেখেনি তাদের একথা

বোঝান শক্ত। দরিদ্রতম থেকে চরম ধনী সবার ছেলেই তাঁর সমান স্নেহের পাত্র ছিল। তিনি প্রত্যেককেই ভালবাসতেন, কারণ মানুষমাত্রই ছিল তাঁর ভালবাসার পাত্র; এ ব্যাপারে তাঁর কাছে জাতি বা বর্ণের বিচার ছিল না। অত্যন্ত দুঃখের কথা এই যে আমাদের কলকাতার অনেক মানবহিতৈষীর কাছে আবার জাতি বা বর্ণই হল মানুষের মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রে একমাত্র মাপকাঠি। কোন ভৌগোলিক, জাতিগত, সামাজিক বা অন্য কোন বহিরঙ্গ পার্থক্যই তাঁর কল্যাণকামী প্রেরণাকে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করতে পারত না। জাতি এবং শ্রেণী সম্পর্কিত সংস্কারের সম্পূর্ণ উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন কোন মানুষের চাপকান, শাল কিংবা পাল্কি অথবা গাড়ির চেয়ে তার (নিজের) মূল্যই বেশি। কালো মানুষদের তিনি নিজের ভাইয়ের মতোই দেখতেন। এই ভ্রাতৃত্ববন্ধন সন্দেহাতীত প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে এ বন্ধন আদৌ স্বীকৃত বা অনুভূত হয় না। অ্যাংলো-স্যাক্সনদের এ মত গ্রহণ করাতে আমাদের চ্যান্সেলর অফ এক্সচেকারদের গলাবাজির প্রয়োজন হয়।

হেয়ারকে বলা যায় প্রথম ইওরোপীয় মানবহিতৈষী যিনি ভারতবর্ষে মানবহিতৈষণার যুগেও আবার এক নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন। তাঁর সময় থেকেই এই ভারতীয় সমাজের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের উপর এক নতুন প্রাণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এর মধ্য দিয়েই অন্ধকারের গভীর থেকে আলোর উদয় হবে—এর মধ্য দিয়েই হিন্দু ও ইওরোপীয়রা একই স্বার্থ, একই আশা আকাঙ্ক্ষার বাঁধনে বাঁধা পড়বে। এদেশবাসীর অগ্রগতিতে হেয়ারের যতখানি আগ্রহ

ছিল, সে অগ্রগতির স্বপ্নকে সফল করে তোলবার জন্য তাঁর প্রয়াসও ছিল তেমনি আন্তরিক। উন্নততর অবস্থায় উন্নীত হবার জন্য যা যা দরকার তার সবই তিনি প্রত্যেক দেশীয় লোকের কাছে সুলভ করে দিতে চেয়েছিলেন, তাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন এমন এক প্রজ্ঞালোকের দ্বারে যেখানে এর আগে সে কখনও পদক্ষেপ করেনি। অবৈধ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি আর হিংসাদ্বেষের চাপে পড়ে দেশীয়রা আজ 'কাঠুরে' অথবা জলবাহী 'ভারীতে' পরিণত হচ্ছে; তাদের ন্যায্য দাবিকে দুপায়ে মাড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর মাঝখানে যখন স্মরণ করি হেয়ার তাদের অধিকারকে কি মূল্য দিয়েছিলেন এবং তাদের উন্নতির জন্য তাঁর কতখানি আগ্রহ ছিল, তখনই আবার সজীব হয়ে উঠি। হিন্দুদের প্রতি অবিচল ও আন্তরিক ভালোবাসায় গঠিত ছিল তাঁর সমস্ত প্রকৃতি। উচ্ছ্বসিত অথচ বিচক্ষণ সদাশয়তায় পূর্ণ ছিল তাঁর অন্তর। তাঁর সমস্ত জীবন এবং কর্ম তাঁর এই মানস-বৈশিষ্ট্যের ঔজ্জ্বল্যে সমুদ্ভাসিত। তাঁর সহৃদয় মুখচ্ছবিতেই তাঁর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হোত। বাবুদের বৈঠকখানা এবং রাজাদের নাচঘর থেকে শুরু করে অনাথ বালকের জঘন্য আস্তানা ও জরাক্রান্ত দরিদ্রের শয্যাপার্শ্বে (সর্বত্রই) তিনি হাজির থাকতেন সমান প্রসন্ন মুখে। বিশেষত তিনি যখন দেশীয়দের শিক্ষার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতেন তখন তাঁর মুখ অপূর্ব আনন্দের ছোঁয়ায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। দেশীয় সমাজের সমস্ত প্রাণসম্পদ যে অজ্ঞতার ব্যাধি নিঃশেষে হরণ করে নিচ্ছে—একথা তাঁর আগে কেউ বুঝতে না পারলেও, তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কি কর্তব্য

তাও তাঁর আগে কেউ বুঝতে না পারলেও তিনি ঠিকই পেরেছিলেন। সভাপতি মহাশয়, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় একথা আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে যে কারো কারো চোখে দোষত্রুটি বা ভুলভ্রান্তি অন্য সকলের চেয়ে বেশি ধরা পড়ে। প্রকৃতির এই নিয়ম সমাজের পক্ষে খুব বেশি কল্যাণকর; কারণ এর ফলে কেউ কেউ দোষত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেন যা অন্যের পক্ষে করা সম্ভব হযে ওঠে না। এর ফলেই কেউ নিজেকে উৎসর্গ কবেন সতীদাহ প্রথা রদ করার কাজে, কেউ নিজেকে নিয়োজিত করেন দাসত্ব প্রথা উচ্ছেদের ব্রতে। মানুষ অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের অভিশাপ মাথায় নিয়ে চিবদীনতার বাজ্যে নির্বাসিত হযে থাকবে—এ চিন্তা, যে অনন্যসাধাবণ পুরুষটিব কথা আমি বলছি—তাঁর হৃদয়কে পীড়িত করেছিল। নৈতিক এবং মানসিক কালিমাই তাঁর কাছে ছিল সবচাইতে বড় অমঙ্গল, তাব চিন্তাই তাঁব হৃদয়মন অধিকার করেছিল। সেই অন্ধকাবের আববণ ছিন্ন করে সেখানে জ্ঞানালোকেব আশীর্বাদ ছড়িয়ে দেওযাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জীবনেব ব্রত। এই প্রেরণাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি হিন্দু কলেজ, স্কুল সোসাইটির বিদ্যালয়গুলি এবং অন্যান্য কয়েকটি শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নবজীবনের আবেগ সঞ্চারিত করেছিলেন সেগুলিতে। শিক্ষা আন্দোলনের পুরোধা হিসাবে সবার উপবে তাঁর স্থান। আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী দিনের মানুষ ক্রমবর্ধমান শ্রদ্ধায় তাঁব নাম উচ্চারণ করবে 'দেশীয় শিক্ষার জনক,' 'দেশীয় প্রগতির অগ্রদূত' বলে।

A

BIOGRAPHICAL SKETCH

OF

DAVID HARE

BY

PEARY CHAND MITTRA.

CALCUTTA.

W. NEWMAN & CO., 3, DALHOUSIE SQUARE.

1877.

মূল গ্রন্থের আখ্যা পত্রের প্রতিলিপি

প্রসঙ্গকথা

'প্রসঙ্গকথায়' বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং আকর্ষণীয় প্রসঙ্গগুলিই একমাত্র আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গাবলীর পার্শ্বস্থ অঙ্ক বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা নির্দেশক। এবং আলোচনায় প্রাসঙ্গিক পৃষ্ঠাঙ্কগুলিই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যান্য পৃষ্ঠাঙ্ক নির্ঘণ্টে দ্রষ্টব্য। তারকাচিহ্নিত প্রসঙ্গগুলি 'গ্রন্থমালা'র সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক লিখিত।

হেয়ারের ঘড়ির ব্যবসা হস্তান্তরিতকরণ। ১

প্যারীচাঁদ মিত্রের হেয়ারজীবনীতে (পৃ ১) লিখিত আছে যে হেয়ার তাঁর ঘড়ির ব্যবসা গ্রে-র কাছে হস্তান্তরিত করেন ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই। কিন্তু সরকারী গেজেটে প্রদত্ত একটি বিবৃতি থেকে এ তথ্য ভুল বলে মনে হয়:

"DAVID HARE
Watch Maker

Begs to inform his friends and the public in general that he has this day retired from Business, and requests they will accept his most sincere thanks for the very liberal support with which they have favoured him for the last eighteen years.

He also takes this opportunity of respectfully and earnestly soliciting a continuance of their Patronage to his Successor, Mr. Gray, who came from England on purpose, and has been his Assistant for five years, which has afforded D. H. such a knowledge of his character and abilities, that he feels the greatest confidence in recommending him on their notice." January 1, 1820: *The Government Gazette* (supplement) for January 6, 1820.

তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ২, ৩৬-৩৭

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ এক বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সের সময় তাঁর পিতা পরলোক গমন করলে পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্যে তাঁকে বিশেষ বিব্রত হতে হয়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই তারাচাঁদ অবৈতনিক ছাত্র হিসাবে এখানে প্রবেশ করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে অধ্যয়ন করে তিনি কলেজ ছেড়ে দিয়ে রামমোহন রায়ের চেষ্টায় সিল্ক বাকিংহাম সম্পাদিত 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর জন্যে 'চন্দ্রিকা' ও 'কৌমুদী' নামক

বাঙলা পত্রিকা দুটির ইংরেজী অনুবাদকের কাজ পান। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ঘটেছিল। এক বৎসর পরে তিনি ডক্টর এইচ. এইচ. উইলসনের তত্ত্বাবধানে এবং রামকমল সেন ও হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র শিবচন্দ্র ঠাকুরের সঙ্গে পুরাণসমূহের ইংরাজী অনুবাদের কাজে নিযুক্ত হন। এর পর তিনি রামমোহনের যত্নে ভূতপূর্ব ম্যাকিন্টশ কোম্পানির অফিসে একটি কেরানীর চাকরি পান। এখানের বড় সাহেব তাঁর কাছে যে রকম আনুগত্য দাবি করতেন তা দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর না হওয়ায় তিনি এই চাকরি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই হেয়ারের আনুকূল্যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকের পদলাভ করেন। এই সময় তিনি যে ইংরেজী-বাঙলা অভিধান সংকলন করেন তা উইলিঅম অ্যাডামের নামে উৎসৃষ্ট হয়। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এই অভিধান প্রকাশের ভার নেন এবং তারাচাঁদকে ১০০৲ টাকা প্রদান করেন।

এরপর তারাচাঁদ সুপ্রিম কোর্টের ব্যারিস্টর ক্লেল্যাণ্ডের সহকারী হিসাবে চার বৎসর কাজ করেন। এই সময় সার্ উইলিঅম জোন্সের ইংরেজী অনুবাদ ও মূল সংস্কৃত পাশাপাশি রেখে টীকা সমেত মনু-সংহিতার পাঁচ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ তাঁর এক বিশেষ কীর্তি। ক্লেল্যাণ্ডের বিশেষ চেষ্টায় তিনি হুগলীর জাহানাবাদে মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এক বৎসরের কিছু অধিককালের মধ্যেই এক মিথ্যা সাক্ষীর ব্যাপারে অন্যায়ভাবে কর্তৃপক্ষ তাঁর জরিমানা করলে তিনি মর্মাহত হয়ে চাকরি ছেড়ে দেন। এরপর তিনি প্রথমে মিঃ পলিন ও পরে মিঃ লঙ্গভিলের সহকারীরূপে এবং ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সদর দেওয়ানী আদালতে কেরানীর কাজ করেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে আমদানি ও রপ্তানি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তারাচাঁদ বর্ধমানরাজের দেওয়ানরূপে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। ঠিক কবে তিনি এই কর্ম গ্রহণ করেন তা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি বর্ধমানরাজের

কাজ ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন এবং এই ব্যবসায় নিযুক্ত থাকাকালে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহান্ত ঘটে।

তারাচাঁদ রামমোহনের বন্ধুমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক হন (১৮২৮)। অনেক ক্ষেত্রে তিনি দেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র তিনি ছিলেন স্থায়ী সভাপতি। মেকানিকস ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তিনি এর কার্যনির্বাহক সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' (প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৮৪২) পত্রিকার সঙ্গে লেখক হিসাবে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। 'বেঙ্গল স্পেক্টেটরে'র লেখা-গুলি তিনি দেখে দিতেন। নব্যবঙ্গের তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়। জর্জ টমসনকে সভাপতি করে যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় (২০শে এপ্রিল ১৮৪৩) তারাচাঁদ তার উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় তারাচাঁদ ও তাঁর দলের উগ্র রাজনীতি চর্চা নিয়ে তদানীন্তন 'ইংলিশম্যান', 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পত্রিকাগুলি বিদ্রূপ করত এবং তারাচাঁদের দলকে বলত 'চক্রবর্তী ফ্যাকশন'। অর্থাভাবে নব্যবঙ্গের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেক্টেটর' উঠে গেলে তারাচাদ 'দি কুইল' নামে একটি সংবাদপত্র বের করেন (সম্ভবত ১৮৪২ ৪৩)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে তারাচাঁদ অন্যতম পথিকৃৎ।

তারাচাঁদের বিস্তারিত জীবন ও কর্মের জন্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'তারাচাঁদ চক্রবর্তী' ইংরেজী প্রবন্ধ ('ইণ্ডিয়া রিভিউ'— মার্চ ১৮৪০) এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (পৃ ১৪০-১৬১) দ্রষ্টব্য।

স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট। ৩

আর্নট 'ক্যালকাটা জার্নাল'-এর সম্পাদক সিল্ক বাকিংহামের সহকারী ছিলেন। রাজরোষের কবলে পড়ে বাকিংহাম এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য

হলে তিনি কিছুকাল এই পত্রিকার সম্পাদকের কার্য চালান। কিন্তু তিনিও সরকারের বিরাগভাজন হয়ে পড়েন এবং শেষে তাঁকে বিলাতে চলে যেতে বলা হয়। রামমোহনের সঙ্গে আর্নটের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল এবং তিনি রামমোহনের সিমলা অঞ্চলস্থিত অবৈতনিক স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছিলেন। আর্নটকে বিলাতে পাঠিয়ে দেওয়া স্থির হলে উক্ত বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুগণ তাঁকে এদেশে থাকতে দেবার জন্যে আবেদন জানিয়ে সরকারের কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করেন (১৩ই অক্টোবর, ১৮২৪)। এই দরখাস্তে আটজন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। কিন্তু এই আবেদন গ্রাহ্য না হওয়ায় আর্নট বিলাতে চলে যান।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিলাতে পৌছলে আর্নট তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। রামমোহনের মৃত্যু হলে 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ (নভেম্বর, ১৮৩৩) প্রকাশিত তাঁর জীবনীতে বলা হয় যে, তিনি তাঁর রচনাদিতে একজন পুরানো সাহেববন্ধুর যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'এশিয়াটিক জার্নাল'-এ (পৃ ২৮৮-৯০) মুদ্রিত আর্নটের একটি দীর্ঘ পত্র থেকে জানা যায় যে, বিলাতে থাকাকালীন রামমোহনের ইংরেজী রচনাদি ও চিঠিপত্রই শুধু আর্নটের লেখা নয়, ভারতবর্ষে অবস্থানকালেও রামমোহনের রচনায় তাঁর উল্লেখনীয় সাহায্য আছে। ডক্টর কার্পেণ্টার রামমোহনের রচনার বিষয়ে আর্নটের দাবি স্বীকার করেননি। ডক্টর হোরেস হেম্যান উইলসনও রামকমল সেনকে লেখা তাঁর একটি পত্রে (২১শে ডিসেম্বর, ১৮৩৩) আর্নটের ঘোষণাকে হীন উদ্দেশ্যমূলক বলে মন্তব্য করেছেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের 'রামকমল সেন' (সম্বোধি সংস্করণ ১৯৬৪) : পৃ ১৬

কিন্তু আর্নটের দাবিকে একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রামমোহন বেশী বয়সে ইংরেজী শিখেছিলেন এবং তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাময়িক বিষয়কে কেন্দ্র করে তর্কবিতর্কের রীতিতে লেখা। এইসব রচনার বিষয়বস্তু মোটামুটি তাঁর নিজস্ব হলেও

এগুলির প্রকাশভঙ্গির ব্যাপারে তাঁর কোন কোন ইংরেজ বন্ধু, বিশেষ করে প্রাইভেট সেক্রেটারির সাহায্য থাকা অসম্ভব নয়। সুশীলকুমার গুপ্তের 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ : ১৫২-১৫৩) দ্রষ্টব্য।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ৭

দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। বৈদ্যনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ও অনুকূলচন্দ্রের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হিন্দু কলেজের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। সুশীলকুমার গুপ্তের 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ : ১৭০-১৭১) দ্রষ্টব্য।

এডওআর্ড হাইড ঈস্ট। ৭-৯

হিন্দু কলেজ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম ঈস্ট সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির পরিচালনার ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত ছিল তাঁদের মধ্যে ঈস্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কলিকাতা স্কুল সোসাইটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর লোকহিতকর কার্যাবলীর জন্য তাঁর ইংলণ্ড যাত্রার প্রাক্কালে কলকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এক সভায় মিলিত হয়ে তাঁকে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। তাঁর প্রতিমূর্তি স্থাপনের ইচ্ছাও এই সভায় ঘোষণা করা হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরাও তাঁকে প্রশংসাপত্র দেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ জানুআরি তারিখের 'সমাচার দর্পণে' লিখিত হয় :

"কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোকেরা শ্রীযুক্ত সর এদ্বর্দ হৈড ইষ্ট সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত মঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং দুই প্রহর এক ঘণ্টা বেলার কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি-পত্র দিলেন সে পত্র চর্মে লিখিত চতুর্দিকে স্বর্ণমণ্ডিত। পারসী, বাংলা ও

ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে পত্র পাঠ করিয়া শুনান কর্তব্য। তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে তিন ভাষাতে পাঠ করিয়া পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান।

আমরা শুনিলাম যে আপনি আট বৎসর পর্যন্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ম করিয়া অতি শীঘ্র এদেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় খিন্নমান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব করিতে আমরা সকলে একত্র আসিয়াছি। আপনার আমলে আমরা অনেক উপকার পাইয়াছি এবং আপনার যথার্থ বিচার দ্বারা অতিশয় সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কলেজ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমারদিগের বালকদের অনেক উপকার হইয়াছে। এখন আমারদিগের এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এদেশের কারণ আপনি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কারণ এইখানে আপনকার প্রতিমূর্তি স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃশ্য হইবেন তখন এই প্রতিমূর্তি দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব।

ইহার পরে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা এক প্রশংসাপত্র আনিয়া দিল সে পত্র এক ছাত্র শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল যে আপনার অনুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ...

পুনর্বার সমাচার আইল যে শ্রীযুত সর এদ্বর্দ হৈদ ইষ্ট সাহেব ১৭ জানুআরী বৃহস্পতিবার চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গঙ্গাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া ইংগ্লণ্ডে যাইবেন।”

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্টের এক প্রস্তরমূর্তি কলকাতায় স্থাপিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৯৪৯ (পৃ : ২২৫-২২৯) দ্রষ্টব্য।

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ১৯-২৩, ৩৫-৩৯, ৪১-৪৩

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও কলকাতা ইটালী পদ্মপুকুরের নিকটে মামলালীর দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে

পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ফিরিঙ্গী। তাঁর পিতার অবস্থা সচ্ছল ছিল। তিনি জে স্কট কোম্পানির সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন। ডিরোজিওর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগিনী ছিল। সর্বকনিষ্ঠা এমেলিয়া ডিরোজিওর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ও তাঁকে সমস্ত কাজে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। ধর্মতলায় অবস্থিত ড্রামণ্ডের বিখ্যাত ইংরেজী স্কুলে তাঁর শিক্ষারম্ভ হয় এবং তিনি মেধাবী ছাত্র হিসাবে পড়াশুনায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিওর স্কুল জীবনের অবসান ঘটে। এরপর তিনি একবার ভাগলপুরে তাঁর এক মাসীর বাড়িতে গমন করেন এবং সেখানে অনেকগুলি কবিতা লেখেন। এইসব কবিতার মধ্যে Fakir of Jhungeera সমধিক প্রসিদ্ধ। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হিন্দু কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে হিন্দু কলেজে ডিরোজিও ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত পদ পান। আবার ডিরোজিওর জীবনীকার টমাস এডওআর্ড তাঁর 'Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist' (Calcutta 1884) গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় ডিরোজিওর হিন্দু কলেজে যোগদানের তারিখ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস বলে জানিয়েছেন। কিন্তু ডিরোজিওর নিয়োগের তারিখটি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের সম্ভবত মে মাসে হবে। ১২৩৩ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৩ই মে, ১৮২৬) তারিখের সাপ্তাহিক 'সমাচার দর্পণ'-এ 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে উদ্ধৃত একটি সংবাদে আছে .

"হিন্দু কলেজ।—আমরা পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি যে পটলডাঙ্গায় পাঠশালা ঘর প্রস্তুত হইলে হিন্দু কালেজ ঐ ঘরে আসিবেক এক্ষণে আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে ২০ বৈশাখ সোমবার সংস্কৃত পাঠশালা ও হিন্দু কালেজ বিদ্যালয় ঐ বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে।..

ইংরাজী পাঠশালায় ডিয়রম্যান নামক একজন গোরা আর ডি রোজী সাহেব এই দুই জন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন . ।"

এই সময়েই তিনি বিখ্যাত 'ইণ্ডিয়া গেজেট' সংবাদপত্রে একজন

সহকারীরূপে যোগদান করেন। শিক্ষক ও কবি হিসাবে শীঘ্রই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্রধানতঃ তাঁরই শিক্ষার প্রভাবে ইয়ং বেঙ্গল বা নব্য বঙ্গের সৃষ্টি হয়। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি আলোচনা সভা গঠন করে নিজেই এর সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। প্রথমদিকে ডিরোজিওর লোয়ার সারকুলার রোডের বাড়িতে এই অ্যাসোসিয়েশনের সভা হত। পরে হিন্দু কলেজের অন্যতম পরিচালক শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিকতলার বাগান-বাড়িতে এই সভা বসতে থাকে। ডিরোজিও স্কুল সোসাইটির পটল-ডাঙ্গা স্কুলে (হেয়ার সাহেবের স্কুল নামে খ্যাত) প্রতি সপ্তাহে নীতি ও সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নাস্তিক্যবুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হওয়ায় তারা হিন্দু ধর্মের প্রচলিত রীতিনীতির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাতে শুরু করে এবং গোঁড়া হিন্দু সমাজ এক ভয়ানক সংকটের মধ্যে পড়ে। ডিরোজিওর ভবনে হিন্দু কলেজের অগ্রসর ছাত্রেরা হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পানভোজন করতেন। হিন্দু কলেজের হিন্দু পরিচালকদের মধ্যে প্রধানত রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের চেষ্টায় সব বিপর্যয়ের মূল ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় (২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ)।

হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকাকালে ডিরোজিও 'হেসপেরাস' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। হিন্দু কলেজের কর্ম থেকে অপসারিত হওয়ার পর ডিরোজিওর সম্পাদনায় 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একটি সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করে (১লা জুন, ১৮৩১)। এই বৎসরের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখেই তিনি কলেরায় পরলোক গমন করেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ', রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল' ও 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' এবং Thomas Edwards-এর

'Henry Derozio, the Eurasian Poet, Teacher and Journalist (Calcutta 1884) দ্রষ্টব্য। F B. Bradley-Birt-সম্পাদিত 'Poems of Henry Louis Vivian Derozio' (Oxford University Press, 1923) গ্রন্থে ডিরোজিওর কাব্যকৃতির পরিচয় পাওয়া যাবে। এছাড়া Rev Lal Behari Dey-র 'Recollections of Alexander Duff' গ্রন্থও ডিরোজিও সম্পর্কিত তথ্যের জন্য আকর্ষণীয়।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক। ১৯, ৩৬-৩৮, ৪২-৪৪

১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ কলকাতা সিন্দুরিয়াপটিতে বিখ্যাত মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক। শহরে নবকিশোরের সুতোর কারবার ছিল এবং তিনি তিলী জাতীয় বণিকদলভুক্ত ছিলেন। রসিককৃষ্ণ এগার বৎসরের কাছাকাছি সময়ে হিন্দুকলেজে ভর্তি হয়ে নয় বৎসর সেখানে পড়াশুনা করেন এবং ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পান। ডিরোজিও যখন হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়াতেন তখন রসিককৃষ্ণ সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। তাই ডিরোজিওর সাক্ষাৎ ছাত্র তাঁকে বলা যায় না। তবে কলেজের পড়াশুনোর বাইরে তিনি ডিরোজিওর নিকট সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁর উপর ডিরোজিওর প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। তিনি নব্যবঙ্গের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ডিরোজিও স্থাপিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর সকল বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। আবৃত্তি ও বক্তৃতার জন্যে ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। প্যারীচাঁদ প্রমুখ হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রের মতো রসিককৃষ্ণ শিমুলিয়াতে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

কলেজ ত্যাগের পর ডেভিড হেয়ার রসিককৃষ্ণকে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই সময়

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলের শিক্ষকের কর্মে যোগ দেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগস্ট কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতির সময় রসিককৃষ্ণ ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু আহারের জন্যে মিলিত হন। ভোজন শেষে তাঁদেরই একজন একখণ্ড নিষিদ্ধ মাংস পাশের বাড়িতে নিক্ষেপ করেন। এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কৃষ্ণমোহন গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। শুধু তাই নয়। স্কুল সোসাইটির হিন্দু সদস্যদের চাপে ডেভিড হেয়ারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণকে পটলডাঙ্গা স্কুলের কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

দক্ষিণানন্দ (পরে রাজা দক্ষিণারঞ্জন) ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে যে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাস থেকে রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক তার পরিচালনার ভার নেন। এই সময় থেকেই 'জ্ঞানান্বেষণ' ইংরেজী-বাঙলা দ্বিভাষী পত্ররূপে প্রকাশিত হতে থাকে। রসিককৃষ্ণ কর্তৃক 'জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ' নামে একটি দর্শন আলোচনার পত্র প্রকাশিত হয়।

বাগ্মী হিসাবে রসিককৃষ্ণের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় রসিককৃষ্ণের বক্তৃতা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের জুরি নিযুক্ত করা হতে থাকলে রসিককৃষ্ণ জুরি নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরের ১৯শে ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে এক হত্যার মামলায় জুরি নিযুক্ত হলে তিনি প্রথাগতভাবে গঙ্গাজল ও তুলসী স্পর্শ করে শপথ নিতে অস্বীকৃত হন এবং আদালতের অনুমতিক্রমে স্বরচিত শপথ পাঠ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জানুআরি চার্টার অ্যাক্টের (১৮৩৩) প্রতিবাদে টাউন হলে যে সভা হয় তার উদ্যোক্তাদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ ছিলেন অন্যতম। তিনি এই সভায় বক্তৃতাও করেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন। স্যার্ চার্লস মেটকাফ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করলে (৩রা অগস্ট, ১৮৩৫) তাঁকে যাঁরা অভিনন্দনপত্র দেন তাঁদের মধ্যে রসিককৃষ্ণ অন্যতম।

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন তাঁ। বিশেষ যোগ্যতা ও সততার সঙ্গে কাজ করে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসুস্থ হয়ে কলকাতায় আসেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুআরি তাঁর মৃত্যু হয়। শিবনাথ শাস্ত্রী রসিককৃষ্ণ সম্পর্কে লিখেছেন: "কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই ডিরোজিও দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরং এরূপ শুনিয়াছি যে, একাডেমিকের বক্তৃতাদি যাঁহারা শুনিতে আসিতেন, তাঁহারা রামগোপালের উন্মাদিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রসিকের গভীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা ভালবাসিতেন। রামতনুবাবুর মুখে সর্বদা তাঁহার নাম শুনিতাম।.. আমাদের ন্যায়, নব্যদলের কোনও মত যদি রসিকের মতের বিরুদ্ধে হইত, তাহা হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহা কানে তুলিতেন না, বলিতেন, 'তোমরা কি রসিকের চেয়ে ভাল বোঝ'?" (শিবনাথ শাস্ত্রী: 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ,' নিউ এজ সংস্করণ: পৃ. ১২০)। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুআরি তারিখের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রসিককৃষ্ণের বিদ্যাবত্তার বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন

With a rich and fertile mind, replenished with the sentiments of the best English authors, and disciplined to an admirable training, he was a pride to the old Hindu College.

রসিককৃষ্ণের বিশদ জীবনীর জন্যে যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (পৃ ১৬২-১৮৭) ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' দ্রষ্টব্য।

রাধানাথ শিক্‌দার। ১৯

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাধানাথ শিকদার কলকাতা জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম

তিতুরাম শিকদার। রাধানাথ ৪৮ নং চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে পড়ার পর ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং শীঘ্রই চতুর্থ শ্রেণীতে তাঁকে উন্নীত করা হয় (১৮২৭)। এই সময় তিনি ডিরোজিওর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের শেষ তিন বৎসর রস ও টাইটলারের কাছে তাঁর পড়ার সৌভাগ্য হয়। হিন্দু কলেজে সাত বৎসর দশ মাস অধ্যয়নের পর প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালেই তিনি কলেজ ত্যাগ করেন। কলেজ ছাড়ার সময় তিনি তাঁর কৃতিত্বের জন্য প্রশংসাপত্র পান। ভারতবাসীদের মধ্যে তিনি ও রাজনারায়ণ বসাকই সর্বপ্রথম নিউটনের প্রিন্সিপিয়া অধ্যয়ন করেন। কলেজে অধ্যয়নের সময় রাধানাথ ইংরেজীতে আবৃত্তি ও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দেন। তিনি 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ডেভিড হেয়ারকে মানপত্র দান ও তাঁর প্রতিমূর্তি প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী হন। প্যারীচাঁদ নিজের বাড়িতে যে অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন সেখানে রাধানাথ কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ মাসিক ৩০ টাকা বেতনে গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সার্ভেয়ার নিযুক্ত হয়ে সেরাং বেস লাইনে কাজ করার জন্যে কলকাতা ত্যাগ করেন। এই সময় সার্ভেয়ার জেনারেল ছিলেন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ জর্জ এভারেস্ট (১৭৯০-১৮৬৬)। ভারতীয়দের মধ্যে রাধানাথই প্রথম জরিপ বিভাগের কর্মে যোগদান করেন। অনেকের ধারণা যে রাধানাথ সার্ভেয়ার জেনারেলের অফিসে (দেরাদুনে অবস্থিত) কম্পিউটর ছিলেন। কিন্তু রাধানাথ যে নিজে জরিপের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তার সপক্ষে অনেক প্রমাণ আছে। এভারেস্ট ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করলে কর্নেল অ্যান্ড্রু ওয়্ (Andrew Waugh) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় কলিকাতার কেন্দ্রীয় অফিসে ৬০০ টাকা বেতনে চীফ কম্পিউটর থাকাকালে রাধানাথ হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গের

জরিপের ফলাফল গণনার সময় একটি শৃঙ্গের উচ্চতা পৃথিবীর যে কোন শৃঙ্গের উচ্চতার চেয়ে বেশি বলে আবিষ্কার করেন। এভারেস্টের নামে এই শৃঙ্গের নামকরণ করা হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম 'ম্যানুয়াল অফ সার্ভেয়িং' নামে জরিপ সংক্রান্ত যে পুস্তক বের হয় তার বিজ্ঞান বিষয়ক উৎকৃষ্ট অংশগুলি রাধানাথের লেখা। পূর্বে জরিপ ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের কোন স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল না। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে রাধানাথকে চীফ কম্পিউটরের পদের সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পদেও নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাধানাথ ত্রিশ বৎসর কাজ করার পর অবসর গ্রহণ করেন।

রাধানাথ বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বেথুন সোসাইটির (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) প্রথমে সভ্য ও পরে সহকারী সভাপতি হন। প্যারীচাঁদের সঙ্গে তিনি স্ত্রীলোকদের পাঠোপযোগী 'মাসিক পত্রিকা' (প্রথম প্রকাশ—১লা ভাদ্র, ১২৬১ বা ১৬ই অগস্ট, ১৮৫৪) প্রকাশ করেন। গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি প্লুটার্ক, জেনোফোন প্রমুখের রচনা থেকে বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে 'মাসিক পত্রিকা'য় অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে তাঁর মৃত্যু হয়।

রাধানাথের বিস্তৃত জীবনীর জন্যে ১২৯১ সালের আশ্বিন ও কার্তিকের 'আর্যদর্শন' এবং যোগেশচন্দ্র বাগলের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (কলিকাতা ১৯৪১ : পৃ ১৮৮-২২৫) পাঠ করা যেতে পারে।

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ১৯

'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম নেতা দক্ষিণারঞ্জন সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে লিখেছেন, "ইহাকে অযোধ্যার সৌভাগ্যের পুনর্জন্মদাতা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অযোধ্যার বর্তমান শ্রীসৌভাগ্যের মূল তিনি। একজন বাঙ্গালী অযোধ্যার পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তথাকার শূরত্ব-মদ-মত্ত বীরপুরুষ ক্ষত্রিয়দিগকে যদৃচ্ছারূপে চালাইয়া অযোধ্যার উন্নতিসাধন করিয়াছেন, ইহা আমাদিগের দেশের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে।"

দ্রষ্টব্য: মন্মথনাথ ঘোষ: রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা ১৩২৪ (১৯১৭), শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, রাজনারায়ণ বসু: আত্মচরিত ও সুশীলকুমার গুপ্ত: 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় নবজাগরণ' (কলিকাতা ১৯৫৯)।

রামগোপাল ঘোষ। ১৯, ৩৬-৩৮

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে রামগোপাল কলকাতার বর্তমান বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে তাঁর পিতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের কলকাতার চীনাবাজারে একটি দোকান ছিল এবং সেখানে তিনি সামান্য ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। তাঁর পিতামহ কলকাতার কিং হ্যামিল্টন কোম্পানির অফিসের কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের নিকটবর্তী বাগাটী গ্রামে।

রামগোপালের শৈশবশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায় তিনি শেরবার্ন সাহেবের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন। পরে মিঃ রোজার্স নামে কিং হ্যামিল্টন কোম্পানির অফিসের একজন কর্মচারী তাঁর বেতন দিতে স্বীকৃত হলে তাঁকে হিন্দু কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। কেউ কেউ বলেন যে, প্রথম থেকেই রোজার্স এর সাহায্যে তিনি হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পান। যাহোক শীঘ্রই রামগোপাল পড়াশুনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে হেয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর অবৈতনিক ছাত্রদলভুক্ত হন। ক্রমে ডিরোজিওর কাছে তাঁর অধ্যয়নের সৌভাগ্য ঘটে। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে ডিরোজিও তাঁকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন। ডিরোজিওর অ্যাকাডেমিক অ্যাসো-

সিয়েশন-এর তিনি একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন এবং এইখানেই তার বক্তৃতাশক্তির বিশেষ বিকাশ ঘটে।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হবার আগেই হেয়ারের সুপারিশে রামগোপাল মিঃ জোসেফ নামে একজন ইহুদী বণিকের ইংরেজী-ভাষাভিজ্ঞ দেশীয় সহকারীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। কিছুদিন পরে কেলসল নামে এক ধনীব্যক্তি জোসেফের কারবারের সঙ্গে যুক্ত হলে রামগোপাল সম্মিলিত কারবারের মুৎসদ্দীর পদ লাভ করেন। জোসেফ ও কেলসলের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটলে রামগোপাল কেলসলের সঙ্গে কেলসল, ঘোষ অ্যাণ্ড কোং নামে বাণিজ্য করতে প্রবৃত্ত হন। কয়েক বৎসর পরে কেলসলের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি আর. জি. ঘোষ অ্যাণ্ড কোং নাম নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কারবার চালাতে আরম্ভ করেন (সম্ভবত ১৮৪৮) এবং এই কারবারে তাঁর প্রচুর অর্থাগম হয়।

বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রামগোপাল আত্মোন্নতি ও স্বদেশের কল্যাণসাধনে মনোযোগী হন। রামগোপালের বন্ধুবৎসলতা, সহৃদয়তা, সত্যবাদিতা ও সততার কথা সুবিদিত। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হেয়ার স্কুলে উঠে আসে এবং রামগোপাল প্রমুখ ডিরোজিওর শিষ্যগণ একে বাঁচিয়ে রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ যে লিপিলিখন সভা (Epistolary Association) ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮) স্থাপন করেন রামগোপাল উভয়েরই উৎসাহী সদস্য ছিলেন। তিনি সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার প্রথমে কোষাধ্যক্ষ ও পরে সহ-সভাপতি হন। ইয়ং বেঙ্গল-এর বিশিষ্ট মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ'-এর অগ্রগণ্য লেখকদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

রাজনীতিক্ষেত্রে সুবক্তা হিসাবেই রামগোপালের সর্বাধিক খ্যাতি। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর বিখ্যাত বক্তা জর্জ টমসনকে এদেশে নিয়ে এলে ডিরোজিওর যে শিষ্যদল তাঁকে কেন্দ্র করে রাজনীতি চর্চায় মেতে ওঠেন তাঁদের মধ্যে রামগোপাল বোধহয় অগ্রগণ্য। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্বোধনী সভায় (১৮৪৩), গভর্নর-জেনারেল লর্ড

হার্ডিঞ্জের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে টাউন হলে অনুষ্ঠিত সভায় (২৪শে ডিসেম্বর, ১৮৪৭), ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনদ পুনর্গ্রহণের সময়কার মহাসভায়, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যভারগ্রহণে আনন্দসূচক সভায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ সভায় (১৮৬১) এবং লর্ড ক্যানিং-এর সম্বর্ধনায় আয়োজিত সভায় রামগোপালের ওজস্বিনী বক্তৃতাবলী বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর বক্তৃতার জন্যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান ডিমস্থিনিস' আখ্যা পান। 'কালা কানুন' (Black Acts)-এর সমর্থনের ব্যাপারে তাঁর 'A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts' নামক পুস্তিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া গভর্নমেণ্টের আইন সদস্য বেথুন ৪টি আইনের প্রস্তাব করেন। এদেশীয় ইংরেজদের সঙ্গে এদেশবাসীদের বিরোধস্থলে প্রথমোক্তদের কোম্পানির ফৌজদারি আদালত ও দণ্ডবিধির অধীন করাই ঐ পূর্বোল্লিখিত আইনের খসড়ার উদ্দেশ্য ছিল। কলিকাতাবাসী ইংরেজগণ তাঁর ওপর এত রাগান্বিত হন যে তাঁরা তাঁকে এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটির (উইলিঅম কেরীর উদ্যোগে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত) পদ থেকে অধঃকৃত করেন। তিনি বেথুন সোসাইটির (১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত) সদস্য ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাঙ্গণে হেয়ারের প্রতিমূর্তিটি প্রধানত রামগোপালের চেষ্টাতেই নির্মিত হয়। শেষজীবনে বিষয়কর্ম ছেড়ে তিনি একান্তে বাস করতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে বন্ধুদের কাছে তাঁর হাজার চল্লিশ টাকা পাওনা ছিল, কিন্তু তিনি ঋণ সংক্রান্ত কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলে তাঁদের ঋণমুক্ত করে যান। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুআরি মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎ-কালীন বঙ্গসমাজ', সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ' (১৩১২), রামগোপাল সান্যালের Bengal Celebrities (1889),

অমৃতলাল বসুর Speeches of Babu Ram Gopal Ghose with a Biographical Sketch (Calcutta, 1885) ও সুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ ২২৩-২২৬) দেখা দরকার।

পার্থেনন । ২০

ডিরোজিওর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁর ছাত্রেরা ১৮৩০ সালের ১৫ই ফেব্রুআরি 'পার্থেনন' নামক একটি ইংরেজী সমাচারপত্র প্রকাশ করে। 'পার্থেনন'ই বাঙালীদের দ্বারা প্রকাশিত প্রথম ইংরেজী সমাচারপত্র। উক্ত পত্রের প্রথম সংখ্যায় স্ত্রীশিক্ষা এবং ইংরেজদের স্বদেশ পরিত্যাগপূর্বক ভারতে বাস এই দুই বিষয়ের প্রস্তাব স্থান পায়। তা ছাড়া হিন্দুধর্ম ও গভর্নমেণ্টের বিচারস্থানে খরচের বাহুল্য এই দুইয়ের উপর দোষারোপ করা হয়। এর ফলে 'পার্থেনন' কর্তৃপক্ষের রোষদৃষ্টিতে পড়ে। এর দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হলেও গ্রাহকদিগের কাছে প্রেরিত হয়নি। সুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ ১৬-১৭) দ্রষ্টব্য।

এনকোয়ারার । ৩৫

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে 'এনকোয়ারার' নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এটি ইয়ং বেঙ্গল-এর মুখপত্র ছিল। এতে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামির তীব্র নিন্দা ও খ্রীষ্টধর্মের গুণকীর্তন করা হত। সতীদাহ নিবারণ, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় এই পত্রের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অগস্ট তারিখের 'এনকোয়ারার' পত্রে কৃষ্ণমোহন মন্তব্য করেন, "We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country."

'এনকোয়ারার'-এর রচনাকারদের বয়স চোদ্দ বা পনেরো বৎসরের বেশি না হলেও এর ইংরেজী লেখার মান ও কার্যকরতা 'সম্বাদ কৌমুদী', 'সমাচার দর্পণ' প্রভৃতি পত্রে উচ্চ প্রশংসিত হত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখের 'সমাচার দর্পণ' কৃষ্ণমোহনের ইংরেজী রচনারীতির প্রশংসা করে লেখেন, "সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েরর নামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। . ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্বক লেখেন তদ্রূপ ঐ বাবু যে তদ্ভাষাবিন্যাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক সে কিঞ্চিৎমাত্র। এবং তাঁহার লিখিত সদ্ভাববিশিষ্ট অতএব তদ্দ্বারা যে তাঁহার অধিক কৃতকার্যতা ও লোকেরদের উপকার ও গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের এতদ্রূপ বাঞ্ছা।"

'এনকোয়ারার' ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন পর্যন্ত জীবিত ছিল।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩৫-৩৯, ১১৩-১৬, ১২৮-৩০

'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন ডাফের কাছে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে। তিনি দেশের প্রায় প্রত্যেকটি প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তৎসম্পাদিত 'এনকোয়ারার' (১৭ই মে, ১৮৩১—১৮ই জুন, ১৮৩৫) নব্যবঙ্গের অন্যতম মুখপত্র ছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলী হচ্ছে 'The Persecuted or Dramatic Scenes, Illustrative of the Present State of Hindoo Society, in Calcutta' (১৮৩১), 'A Prize Essay on Native Female Education' (১৮৪১), 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' ১৩ খণ্ড (১৮৪৬-১৮৫১), 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭) প্রভৃতি।

দ্রষ্টব্য: Ramgopal Sanyal: Bengal Celebrities (১৮৮৯): Ramchandra Ghosha: A biographical sketch of Rev. K. M. Banerji (১৮৯৩); সুশীলকুমার দে: কৃষ্ণমোহন

বন্দ্যোপাধ্যায় (আনন্দবাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৩৬২) ; দুর্গাদাস লাহিড়ী : কৃষ্ণমোহন (১২৯২) ; সুশীলকুমার গুপ্ত : উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ (১৯৫৯) ও Harihar Das : Rev. Krishna Mohan Banerjee, *Bengal Past and Present* vols 36 (Part II), 37 (Parts I & II).

জ্ঞানান্বেষণ । ৩৬

'জ্ঞানান্বেষণ' ইয়ং বেঙ্গল-এর মুখপত্র ছিল। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন এই সাপ্তাহিকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে সম্পাদক হলেও গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশই এর সম্পাদকীয় কার্য সম্পন্ন করতেন। দক্ষিণারঞ্জনের পর রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও মাধবচন্দ্র মল্লিক পত্রিকাটির পরিচালনার ভার নেন এবং এটিকে ইংরেজী ও বাঙলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়। রামগোপাল ঘোষ এই পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাময়িকপত্র (১৮১৮-১৮৬৮), নূতন সং, কলিকাতা ১৯৪৮ (পৃ ৩৯-৪২) দেখা যেতে পারে।

শিবচন্দ্র দেব । ৩৬

১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর দেব। তিনি কমিসরিয়েটে সরকারের যে কাজ করতেন তাতে তাঁর যথেষ্ট অর্থাগম হত। শিবচন্দ্র পিতার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। একাদশ বৎসর বয়সের সময় তাঁর মাতার মৃত্যু ঘটে।

প্রথমে পাঠশালা এবং পরে একজন আত্মীয়ের সাহায্যে তিনি বাড়িতে

বসেই পড়াশুনা করেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগস্ট তারিখে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে ছয় বৎসর পাঁচ মাসকাল অধ্যয়ন করেন। প্রথম শ্রেণীতে উঠে তিনি ১৬ টাকা বৃত্তি পান এবং সেই সময় ডিরোজিওর শিষ্যদলভুক্ত হন। কলেজে অধ্যয়ন কালে কেশবচন্দ্র সেনের পিতৃব্য হরিমোহন সেনের সঙ্গে আরব্য উপন্যাসের বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার গোপালনগরের বৈদ্যনাথ ঘোষের কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

কলেজ পরিত্যাগ করে প্রথমে কয়েক বৎসর জি. টি. সারভে অফিসে ৩০ টাকা বেতনে কম্পিউটরের কাজ করেন এবং পরে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নীত হয়ে বালেশ্বর চলে যান। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বালেশ্বর থেকে মেদিনীপুরে বদলী হন এবং ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আলিপুরে ২৪ পরগনার ডেপুটি কালেক্টর হয়ে আসেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শিবচন্দ্র আজীবন স্বদেশের হিতসাধনে যত্নবান ছিলেন। তাঁকে বর্তমান কোন্নগরের জন্মদাতা বলা যেতে পারে। এখানে কোন্নগর হিতৈষিণী সভা (১৮৫২), ইংরেজী স্কুল (১৮৫৪), বাঙলা স্কুল (১৮৫৮), সাধারণ পুস্তকালয় (১৮৫৮), বালিকা বিদ্যালয় (১৮৬০), রেলস্টেশন (১৮৫৬), ডাকঘর (১৮৫৮), চ্যারিটেবল ডিস্‌পেন্সারি, হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় (১৮৮৩), ব্রাহ্মসমাজ (১৮৬৩) স্থাপন ইত্যাদি তাঁরই শুভচেষ্টার উৎকৃষ্ট ফল।

শিবচন্দ্র একজন উৎসাহী ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক ছিলেন। কোন্নগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের পূর্বে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনাপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলে তিনি এর নেতৃবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বুধবার তিনি পরলোক গমন করেন।

অধিকতর তথ্যের জন্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' অবশ্য দ্রষ্টব্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যেসব স্বদেশচেতন মনীষী ভারতীয় অতীতের লুপ্তরত্ন উদ্ধারের কাজে হৃদয় ও মনন সমগ্রভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁদের অন্যতম। গবেষণাকর্মের ব্যাপ্তিতে এবং সে কর্মের চারিত্রিক উৎকর্ষে তিনি ভারতবর্ষীয় গবেষণার ক্ষেত্রে শুধু অন্যতম পথিকৃৎ নন, অন্যতম বিশিষ্ট পুরুষও।

পূর্ব কলকাতার শুঁড়ায় এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। প্রথম যৌবনে মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্ররূপে গণ্য হলেও, ১৮৪৬-এ এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব এবং গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর জীবনে এক নূতন পর্বের সূচনা হয়। ১৮৪৮-এ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৮৯১-এ তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁর অকৃত্রিম গবেষণাধারায় কোন ছেদ পড়েনি। তাঁর এই দীর্ঘ, অক্লান্ত অনুসন্ধিৎসার সমৃদ্ধ ফসল হল: 'Bibliotheca Indica' গ্রন্থমালায় সম্পাদিত কামন্দকীয় নীতিসার, ললিতবিস্তর (১৮৭৭), অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা (১৮৮৮), The Antiquities of Orissa, দুই খণ্ড (১৮৭৫, ১৮৮০), Indo-Aryans (১৮৮১), The Sanskrit Buddhist literature of Nepal (৮৮২), ইত্যাদি। তাঁর মনীষা স্বীকৃতি পেয়েছিল তাঁর জীবদ্দশাতেই; এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সভাপতি রাজেন্দ্রলাল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি, অ্যামেরিকান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি প্রভৃতি দ্বারাও সম্মানিত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক গবেষণার বাইরেও রাজেন্দ্রলালের সজীব দৃষ্টি ছিল, গণজীবনের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগই একথার প্রমাণ।

রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত বিস্তৃত তথ্যের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র ('সাহিত্যসাধক চরিতমালা', তৃতীয় খণ্ড), কল্যাণকুমার দাশগুপ্তের 'ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র', (চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭০) দ্রষ্টব্য।

হরচন্দ্র ঘোষ। ৩৯

হরচন্দ্র ঘোষ সম্ভবত ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পারসী শেখার পর নিজের ব্যগ্রতা ও চেষ্টার গুণে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং ডিরোজিওর শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন। অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায় তাঁর আগ্রহ উল্লেখযোগ্য। তিনি অ্যাসোসিয়েশনের সভায় বক্তৃতাদি করতেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে যখন এদেশীয়দের জন্যে মুন্সেফ পদের সৃষ্টি হয়, তখন গভর্নর জেনারেল হরচন্দ্রকে বাঁকুড়ার মুন্সেফের পদ দেন। তিনি বিশেষ যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে নিজের কাজ করতেন। নিজ ব্যয়ে তিনি বালকদের জন্যে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করে শিক্ষা-বিস্তারের প্রয়াস পান। বাঁকুড়ায় ছয় বৎসর সুখ্যাতির সঙ্গে কাজ করে তিনি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে বদলী হন ও ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান সদর-আমিন হয়ে ২৪ পরগণাতে গমন করেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পুলিস কোর্টে জুনিঅর ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পান এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন।

হরচন্দ্র বিভিন্ন জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বেথুন কর্তৃক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি তার কমিটিভুক্ত ছিলেন। হেয়ারের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত কমিটির তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন।

দ্রষ্টব্য: শিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

রসময় দত্ত। ৫২

রসময় দত্ত ছোট আদালতের বিচারপতি ছিলেন। তিনি মাসিক ১০০ টাকা বেতনে দীর্ঘকাল (১১ই এপ্রিল, ১৮৪১—৬ জানুআরি, ১৮৫১) সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটরির পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তাঁর মৃত্যু হলে 'সম্বাদ ভাস্করে' (১৮ই মে, ১৮৫৪) তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়।

ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি। ৫৯, ৬১

ইংরেজী ও দেশীয় ভাষায় স্কুলপাঠ্য পুস্তকের রচনা, প্রকাশ এবং অল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই, ক্যালকাটা বা কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ধর্মপুস্তক প্রকাশ এর নিয়মের মধ্যে ছিল না। এই সোসাইটি যাঁরা পরিচালনা করতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সার্ এডওআর্ড হাইড ঈস্ট, জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডবলিউ বি বেলী, উইলিঅম কেরী, তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ। তারিণীচরণ মিত্র সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক ছিলেন।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির সংক্ষিপ্ত বিবরণের জন্য Charles Lushington এর 'The History, Design, and Present State of Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity' (Calcutta, 1924) পুস্তক (পৃষ্ঠা ১৫৬-৬৭) ও *Bengal, Past and Present*-এ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি সম্পর্কে লিখিত প্রবন্ধ (January-June, 1959) দেখা যেতে পারে।

ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি। ৬০-৬২

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার কিছুদিনের মধ্যেই ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউনহলে সদর দেওয়ানী

আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটনের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত একটি সভায় কলিকাতা স্কুল সোসাইটির নামে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। কলকাতায় তদানীন্তন বিদ্যালয়সমূহকে সাহায্যদান ও তাদের উন্নতিবিধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনানুসারে নূতন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল।

রাধাকান্ত দেব স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক এবং ডেভিড হেয়ার এর অধ্যক্ষসভার সদস্য ছিলেন। সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদকপদে ই. এস. মণ্টেগু বৃত হন। ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্স'কে দেশীয় পাঠশালা বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ই. এস. মণ্টেগুর স্থলে পিয়ার্স ইওরোপীয় সম্পাদক হন ও দেশীয় পাঠশালা বিভাগের দায়িত্ব হেয়ারের উপর পড়ে। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পিয়ার্স পদত্যাগ করলে হেয়ার প্রথমে অস্থায়ী ও পরে স্থায়ীভাবে ইওরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন।

Charles Lushington-এর 'The History, Design, and Present State of the Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity' পুস্তকের ' পৃ: ১৬৮-৮৪ দ্রষ্টব্য। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির প্রথম রিপোর্টের পরিশিষ্টও দেখা যেতে পারে।

টাউন হল। ৬০

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গ্রীক স্থাপত্যের অনুসরণে টাউন হল নির্মিত হয়। এই টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা লর্ড ওয়েলেসলির সময় লটারি করে তোলা হয়। এটি নির্মিত হবার আগে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওল্ড কোর্ট হাউসে টাউন হল অবস্থিত ছিল।

এই সূত্রে হরিহর শেঠের 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়'-এর পৃ : ২৩৮ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক বজরাপুরনিবাসী জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটির পণ্ডিত গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক রচিত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ কলিকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির পক্ষে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস কর্তৃক মুদ্রিত হয়। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।* এই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক বিদুষী হিন্দু মহিলার উদাহরণ সহযোগে, স্ত্রীশিক্ষা যে সামাজিক রীতিনীতির পরিপন্থী নয়, এই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' (নিউ এজ সং, পৃ· ৬৭) গ্রন্থে রাধাকান্ত দেব সম্পর্কে যা লিখেছেন তার এক জায়গায় আছে, "স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য নিজে 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।" কিন্তু এই তথ্যটি ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে রাধাকান্তের আনুকূল্যে তাঁর দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে গৌরমোহন কর্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হয়। কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির পঞ্চম (১৮২২-২৩) ও ষষ্ঠ রিপোর্টে এবং পাদরি লঙের 'Bengal Missions' (১৮৪৮) ও বাঙলা পুস্তকের তালিকায় 'স্ত্রীশিক্ষবিধায়ক'-এর প্রণেতা হিসাবে গৌরমোহনের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থরচনায় কতটুকু কৃতিত্ব রাধাকান্তের প্রাপ্য সে বিষয়ে তিনি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে একটি পত্রে (২০শে মার্চ, ১৮৫১) জানিয়েছিলেন :

"... most of the materials were supplied by me especially the instance of some Sanskrit texts on behalf of female education and the examples of educated women both ancient and modern. To this extent I have a share

in the execution of the work and no further. I cannot therefore conscientiously take upon myself the credit of an author. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা', নং ১৭ ও সুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ ৯৯-১০০) দ্রষ্টব্য।

রাজা বৈদ্যনাথ রায়। ১৯, ৭১

এদেশে ইংরেজদের প্রভুত্বস্থাপনে যেসব বাঙালী সাহায্য করেছিলেন, কলকাতা পোস্তার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত ধনী লক্ষ্মীকান্ত ওরফে নকু ধর তাঁদের অন্যতম। বৈদ্যনাথ রায় নকু ধরের দৌহিত্র ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের প্রথম বাঙালী ডিরেক্টর মহারাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র। নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠান ও বদান্যতার জন্যে সুখময় রায়ের পরিবার প্রসিদ্ধ। সুখময়ের পুত্র বৈদ্যনাথ সদ্বক্তা, সচ্চরিত্র ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজদত্ত সম্মান কিরিচ কোমরে বেঁধে সব জায়গায় যাওয়া আসা করতেন। বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা সুবিদিত। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি 'লেডিস সোসাইটি ফর নেটিব ফিমেল এডুকেশন'কে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তাঁর দেহান্ত ঘটে।

এই প্রসঙ্গে বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়ের 'A Short Sketch of Mahaıaja Sukhmoy Roy Bahadur and His Family', Calcutta, 1929 (Revised by Tamonash Chandra Das Gupta) ও সুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ ৯৯) দেখা যেতে পারে।

বেঙ্গাল স্পেকটেটর। ৮৩, ৯২

'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম মুখপত্র 'বেঙ্গাল স্পেকটেটর' ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখের সহায়তায়

রামগোপাল ঘোষ এই ইংরেজী-বাঙলা দ্বিভাষিক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এটি পাক্ষিকপত্রে পরিণত হয় এবং পর বৎসর মার্চ মাস থেকে সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

দ্রষ্টব্য: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১৮১৮-১৮৬৮): পৃ ৭৭-৮০।

দিগম্বর মিত্র। ৯৯

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর অন্তর্গত কোন্নগরে দিগম্বরের জন্ম। তিনি প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন ও পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। তিনি ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজের পাঠ সমাপ্ত করে মুর্শিদাবাদে নিজামত স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশিমবাজার রাজস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। রাজা তাঁর কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে ১ লক্ষ টাকা দিলে তিনি তাই নিয়ে নীল ও রেশমের ব্যবসায় শুরু করেন এবং ক্রমে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় জমিদারি কিনে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরই তাঁর রাজনীতিক শিক্ষাগুরু। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে এপ্রিল তারিখের 'দি হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় কৃষ্ণদাস পালের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য। তিনি লিখেছেন. "While yet in his teens, he was thrown into the coterie of the illustrious Dwarkanath Tagore, which afterwards proved a nursery of the leading minds of Bengal .He learnt politics at the feet of Dwarkanath Tagore, he was a personal friend and coadjutor of both Prasannakoomar and Ramanath Tagore."

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দিগম্বর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদক হন। ক্রমে তিনি এই অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদকের পদ লাভ করেন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য (১৮৬৪, ১৮৭০ ও ১৮৭৭), ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটির সম্পাদক ও কলকাতার প্রথম শেরিফ নিযুক্ত হন। তিনি সরকারের কাছ থেকে রাজা ও সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। তাঁর বদান্যতার কথা সুবিদিত। তাঁর একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্যে বিলাতে গমন করেন এবং সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

রামমোহন রায়ের মত দিগম্বর ব্রিটিশ শাসনের সুফলের বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং জনসাধারণ, বিশেষ করে জমিদারদের অভাব অভিযোগ নিবারণের জন্যে সংযত বিক্ষোভ প্রকাশকেই সংগত বলে মনে করতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টে যে প্রার্থনাপত্র (memorial) দেওয়া হয় তা তাঁরই লেখা। তিনি স্বেচ্ছাতন্ত্রকে নিন্দা করলেও গণতন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি স্বায়ত্তশাসনের জন্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। গভর্নমেন্টের কর্মপরিচালনার ব্যাপারে 'যথাস্থিতং তথাস্তু' (laissez-faire) নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। গভর্নমেন্ট অন্তর্জলি ও গঙ্গাযাত্রা প্রথার বিলোপ সাধন করতে গেলে তিনি তার প্রতিকূলতা করেন। তিনি 'ব্ল্যাক অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে ছিলেন।

মধুসূদন দত্ত দিগম্বরকে 'মেঘনাদবধকাব্য' উৎসর্গ করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে তাঁর ব্যবহারে মধুসূদনকে ক্ষুব্ধ হতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' গ্রন্থে (১৯২০) সংকলিত ফ্রান্স থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লেখা পত্রাবলী দ্রষ্টব্য।

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে Bholanauth Chunder-লিখিত 'Raja Digambar Mitra C. S. I. His Life and Career' (Calcutta 1893) গ্রন্থটি অবশ্যদ্রষ্টব্য।

রিচার্ডসন (১৮০০-১৮৬৫) বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগের কর্নেল ডি. টি. রিচার্ডসনের পুত্র। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গদেশীয় সৈন্যবিভাগে ভর্তি হন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ক্যাপ্টেন হন। কিন্তু পরের বৎসরেই বিকলাঙ্গ হওযার দরুন তাঁকে সৈন্যবিভাগের চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের ইংরেজী সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১২৪২ সালের ২৪শে শ্রাবণ (৮ই অগস্ট, ১৮৩৫) তারিখের 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' আছে .

"হিন্দু কালেজ।—...শ্রীযুত কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেব যিনি লিটেরেরি গেজেটির সম্পাদক তিনি ৫০০ মুদ্রা মাসিক বেতনে শাস্ত্র-বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' তৃতীয় খণ্ড : কলিকাতা ১৯৩৫ : পৃ ৪২২)।

তিনি এদেশীয় যুবকদের পাঠোপযোগী কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। ইংরেজী সাহিত্যের পঠনপাঠনের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রভাব ইয়ং বেঙ্গলের উপর বিস্তৃত হয়। পরে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল পদ লাভ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলাত চলে যান। বিলাত থেকে প্রত্যাগমন করে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঐ বৎসরের শেষের দিকে হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর থেকে পুনরায় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে এক বৎসর এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

ডি. ই. ডি. বেথুনের সঙ্গে মতানৈক্যের ফলে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দু কলেজ ছেড়ে দিয়ে প্রথমে বটতলায় প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটান অ্যাকাডেমিতে কয়েকমাস এবং পরে গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি নামক বেসরকারী কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর তিনি বিলাতে চলে

যান এবং সেখানে 'মেজর' উপাধি লাভ করেন। কলকাতায় ফিরে এসে তিনি ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে (হিন্দু কলেজের পরিবর্তিত নাম) ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। অল্প কিছুকাল উক্ত পদে কাজ করার পর তিনি বিলাত যান এবং সেইখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কাপ্তেন সাহেবের পাণ্ডিত্য ও শিক্ষকতাশক্তি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন :

"কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপিয়র তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্সপিয়র আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতবর্ষের সবকিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু আপনার সেক্সপিয়র আবৃত্তি ভুলিতে পারি না।" .. তিনি 'লিটারারি লীভস্', 'লিটারারি রিক্রিয়েশনজ' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা এবং 'সিলেকশনজ ফ্রম দি ব্রিটিশ পোয়েটস্' নামক সংগ্রহের সংগ্রহ-কর্তা। ঐ সংগ্রহের প্রথমে ইংরাজী কবিদিগের জীবনী আছে। তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ অতি সুন্দররূপে লিখিত। এই সকল গ্রন্থ এক সময়ে ভারতবর্ষের কৃতবিদ্য সমাজে সর্বজনাদৃত ছিল। তিনি আমাদিগেকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্থল নাট্যালয়। তিনি নিজে তথায় গিয়া অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগকে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দিতেন, তাহারা সম্মানের সহিত তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিত।"

রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে রিচার্ডসন টোরী দলভুক্ত (রক্ষণশীল) ছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত', তৃতীয় সং ১৯৫২ (পৃ ২৯-৩০)। রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'; নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' (১৯২০) এবং সুশীলকুমার গুপ্তের 'ঊনবিংশ

শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ ১০৬-১০৭) গ্রন্থে রিচার্ডসন সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যাবে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ। ১০০

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুআরি হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জানুআরি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির শেষ বৈঠক বসে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর কোম্পানির ডিরেক্টরেরা তাঁদের নির্দেশপত্রে কলেজের নীতি ও নাম পরিবর্তনের বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল হিন্দু কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঐ বৎসরের ১৫ই জুন হিন্দু কলেজের কলেজ বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয় এবং এর স্কুল বিভাগ হিন্দু স্কুল নাম পরিগ্রহ করে।

হিন্দু কলেজে কেবল হিন্দু ছাত্রেরাই পড়তে পারত। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজকে সর্বজাতির অসাম্প্রদায়িক কলেজে পরিণত করার জন্যে শিক্ষাসংসদ (Council of Education) ও হিন্দু কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে বিশেষ আলোচনা চলতে থাকে। কমিটির সম্পাদক রসময় দত্ত এই পরিবর্তনের সপক্ষে ছিলেন। আশুতোষ দেব ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিষয়টির ঘোর বিরোধিতা করেন। দেবেন্দ্রনাথ কোন মতামত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও বর্ধমানের মহারাজা সম্প্রদায়গত শিক্ষার পক্ষপাতী না হলেও বিষয়টিকে খোলাখুলি-ভাবে সমর্থন জানাতে সাহস পাননি। গভর্নমেন্ট কোন বিরোধিতাকেই আমল না দিয়ে হিন্দু কলেজকে অসাম্প্রদায়িক কলেজে রূপান্তরিত করেন।

বিস্তৃত বিবরণের জন্যে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' (কলিকাতা ১৮৭৬), Presidency College Centenary volume 1955 (West Bengal 1956) ও ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলার নবজাগরণ' (কলিকাতা ১৯৫৯): পৃঃ ১১০-১১১ ও ১৮৪ দ্রষ্টব্য।

জর্জ টমসন। ১১৮

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে লিভারপুলে জর্জ টমসন জন্মগ্রহণ করেন। আর্থিক দুরবস্থার জন্যে বাড়িতে থেকেই তাঁকে যা কিছু শিক্ষা লাভ করতে হয়। তিনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে দাসত্বপ্রথার বিলোপ সাধনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডে ফ্রি ট্রেড বা অবাধ বাণিজ্যের প্রবর্তনে বিক্ষোভের তরঙ্গ তোলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম কর্তৃক ইংলণ্ডে যে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হয় টমসন তার সভ্য হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল কলকাতায় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হ'লে টমসন তার সভাপতির পদে বৃত হন। তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে অত্যল্প কালের মধ্যেই তরুণ সমাজকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিলের 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র এক সংবাদে জানা যায় যে, ঐ বৎসরের ৬ই এপ্রিল ব্ল্যাক অ্যাক্টের ব্যাপারে টাউন হলে যে বিরাট সভা হয় তাতে টমসন বিচারবিষয়ে ইওরোপীয়দের পৃথক সুবিধার বিপক্ষে বক্তৃতা করেন। এই সময় তিনি দ্বিতীয়বার ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে টমসনের মৃত্যু হয়।

এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ও সুশীলকুমার গুপ্তের 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' (পৃ ২২০ ও ২২৫) দ্রষ্টব্য।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। ১২৬

গভর্নমেণ্ট যখন লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির ওপর কর ধার্য করতে অগ্রসর হন তখন তার প্রতিবাদে এক বিরাট জনসভা হয়। এই আন্দোলনের ফলে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সনাতনী ও সংস্কারপন্থী ভূমধ্য-

কারীরা সমবেতভাবে জমিদার সভা (Zamindary Association) গঠন করেন। রাধাকান্ত দেব এর সভাপতি হন। জমিদার সভার পরে নাম হয় ভূম্যধিকারী সভা (Landholdeıs' Society)। প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভার সভাপতি হন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রমুখের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজের একটি সভায় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (Society for Acquisition of General Knowledge) নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করা স্থির হয় এবং ঐ বৎসরের ১৬ই মে সভা তার কার্য আরম্ভ করে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য ও বিখ্যাত বাগ্মী জর্জ টমসনকে এদেশে নিয়ে আসেন। তিনি রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম প্রতিষ্ঠিত বিলাতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা হয় তাতে একটি রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠার কথা সকলে অনুমোদন করেন। ঐ দিনেই জ্ঞানোপার্জিকা সভার চিতাভস্মের ওপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে একটি রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। টমসন ও প্যারীচাঁদ মিত্র যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদকের পদ অলংকৃত করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর প্রধানত রামগোপাল ঘোষের চেষ্টায় ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি যুক্ত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করে।

এই সভার প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ও সহ-সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে রাধাকান্ত দেব ও কালীকৃষ্ণ দেব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দিগম্বর মিত্র এর সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক হন। এঁরা ব্যতীত প্রথমে অ্যাসোসিয়েশনের কমিটির সভ্য ছিলেন সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত। এই

অ্যাসোসিয়েশনে একজনও ইওরোপীয় সদস্য ছিল না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুআরি দেবেন্দ্রনাথ সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ—সভার সদস্যদের মধ্যে একদল মনে করতেন যে, দুই বৎসরের বেশি একই ব্যক্তিকে এই রকম দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না রেখে অন্যদের এই ভারবহনের সুযোগ দেওয়া উচিত।

এই অ্যাসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান গভর্নমেণ্টের যোগ্যতা বৃদ্ধি, গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতের সাধারণ স্বার্থসাধন এবং এই অধীনদেশের অধিবাসীদের দুঃখদুর্দশার দূরীকরণ।

এই প্রসঙ্গে ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ' : পৃ ২২০-২২৪ দ্রষ্টব্য।

হেয়ার স্ট্রীট। ১৩৬, ১৪২

ডেভিড হেয়ারের নামানুসারে তার বাসগৃহের নিকটবর্তী রাস্তাটির নাম রাখা হয় হেয়ার স্ট্রীট। কলকাতা লটারী কমিটির কাছ থেকে প্রাপ্ত চাঁদায় সে যুগে যে পথগুলি তৈরী হয়েছিল এটি তাদের অন্যতম। এই পথের কাছেই চার্চ লেনের কোণে ছিল হেয়ারের বাসগৃহ।

"কলকাতা ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার সময়ে হেয়ার স্ট্রীটের সীমানা ছিল দীর্ঘ ও প্রশান্ত। এই শূন্য সীমানা ব্যাঙ্কশাল ও সেণ্ট জন গীর্জার সংলগ্ন প্রাঙ্গণ থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৩টি ছোট গলিও ছিল এই সীমানায়, যাদের ধারে ধারে ছিল ইংরাজদের বাসগৃহ। উক্ত সীমানার উত্তর দিকে তখন ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটি গৃহ। এই গৃহের একটিতে ছিল ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নরের আবাসস্থল। এবং উক্ত সীমানার দক্ষিণ দিকে ছিল তৎকালীন জেনারেল হাসপাতালের প্রাঙ্গণ, যার দ্বারপথ ছিল কাউন্সিল হাউস স্ট্রীটে" (প্রাণতোষ ঘটক : 'কলকাতার পথঘাট', পৃ ৯৪)। পরবর্তীকালে পথটি কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে।

ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি। ১৪৫

ঠনঠনিয়ার কালীমূর্তির প্রতিষ্ঠাতা উদয়নারায়ণ নামে এক শাক্ত ব্রহ্ম-চারী। উদয়নারায়ণের মৃত্যুর পর হালদার বংশোদ্ভূত একজন পুরোহিতের ওপর এই মন্দিরের ভার পড়ে। এখানকার কালীমূর্তির নাম সিদ্ধেশ্বরী কালী। প্রথমে এই মূর্তি মৃত্তিকানির্মিত ছিল। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে শংকর ঘোষ নামে ঠনঠনিয়ার এক ধনশালী ও কালীভক্ত ব্যক্তি বর্তমান মন্দির ও মূর্তি তৈরি করে দেন। তিনি কালীমন্দিরের পাশে শিব মন্দিরটিরও প্রতিষ্ঠাতা। কালীমন্দিরের গায়ে একটি প্রস্তরফলকে লেখা আছে, "শঙ্কর হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে"।

এই প্রসঙ্গে হরিহর শেঠের 'প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়' (কলিকাতা, ১৯৫২)-এর পৃ ২০৯-২১০ দেখা যেতে পারে।

মধুসূদন গুপ্ত। ১৫৬*

সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার প্রায় দু'বছর পরেই—তারিখ হিসাবে ১৮২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে—ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, ন্যায় প্রভৃতি প্রাচীবিদ্যাবিভাগের সঙ্গে বৈদ্যক শ্রেণী নামে একটি নতুন বিভাগের পত্তন হয়। খুদিরাম বিশারদ নামে একজন অধ্যাপককে বিভাগীয় দায়িত্ব দেওয়া হয় কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যহানির জন্য ১৮৩০ সালের এপ্রিল মাসান্তে কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তদানীন্তন সেক্রেটারিট্রিয়ার তখন খুদিরামের জায়গায় অধ্যাপক হিসাবে যাঁর নাম প্রস্তাব করেন তিনি তখনও ছাত্র। নামত ছাত্র হলেও বিদ্যাবত্তায় তিনি তাঁর অধ্যাপকের সমপর্যায়ী, কর্মৈষণা ও বিচারবুদ্ধিতে—সেক্রেটারির ভাষায়—'হেড স্টুডেন্ট' যিনি তাঁর অধ্যাপকের অনুপস্থিতিতে অধ্যাপনার কাজ করেন। অসাধারণ সেই ছাত্রের নাম মধুসূদন গুপ্ত।

১৮০০ সনের কাছাকছি কোন সময়ে মধুসূদনের জন্ম। জন্মস্থান হুগলী জেলার বৈদ্যবাটী গ্রাম। পিতার নাম বলরাম গুপ্ত। সোনা

যায়, ছোট বেলায় দুরন্তপনার জন্য পিতা তাঁকে ভৎর্সনা করলে কিশোর মধুসূদন বাড়ি ছেড়ে চলে যান এবং যাবার সময় বাবা ও আত্মীয়জনদের বলে যান, মানুষ না হয়ে তিনি বাড়ি ফিরবেন না। অতঃপর কলকাতায় এসে তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন এবং অল্পকালের মধ্যেই সংস্কৃত সাহিত্যে পারঙ্গমতা অর্জন করেন। তারপর ১৮২৬ সালে বৈদ্যক শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে মনোনিবেশ করেন এবং সেই দুরূহ শাস্ত্রও যে তিনি কত অল্প সময়ে অধিগত করেছিলেন, ট্রয়ারসাহেবের উক্তি তার নিঃসংশয়িত প্রমাণ ৬

ছাত্র মধুসূদন গুপ্তের সরাসরি অধ্যাপকপদ-প্রাপ্তিতে স্বভাবতই তাঁর বন্ধুরা ও দেশের অন্যান্য অনেকে আহত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তখনকার দিনের খবরের কাগজেও এ ঘটনা নিয়ে লেখালেখি হয়েছিল। যাই হোক ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে মধুসূদন তাঁর কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ সনের জানুআরি মাস পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ১৮৩২ সালের গোড়ার দিকে কলেজ-সংলগ্ন ৬৫ নং (একতলা) বাড়িতে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ হাসপাতালে ডাক্তার জন গ্রান্ট নামে একজন ইংরেজ চিকিৎসক নিয়মিত বক্তৃতা করতেন। কলেজের বৈদ্যকশ্রেণীর ছাত্ররা ঐ হাসপাতালে গ্রান্টের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। চিকিৎসাবিদ্যা-চর্চার ক্ষেত্রে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ছাড়া কলিকাতা মাদ্রাসার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য, কারণ মাদ্রাসাতেও চিকিৎসাশাস্ত্র পঠনপাঠনের ব্যবস্থা ছিল। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় যথাক্রমে সংস্কৃত ও আরবীতে শিক্ষা দেওয়া হত। উভয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য ঐ দুই ভাষায় বহু ইংরেজী বই অনূদিত হয়েছিল, যদিচ খুব কম ছাত্রই ঐ সব বই কিনে পড়তেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে মধুসূদন গুপ্ত কৃত হুপারের Anatomist Vademecum-এর সংস্কৃতানুবাদগ্রন্থ বিশিষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। ঐ অনুবাদের জন্য মধুসূদন সরকার থেকে এক হাজার

টাকা পুরস্কার পান। বইটি ১৮৩৫ সালের জানুআরি মাসে ছাপাখানায় ছিল বলে সমসাময়িক রেকর্ড থেকে জানা যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণযোগ্য বড়লাট উইলিঅম বেণ্টিঙ্ক-এর চেষ্টায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে উদ্বোধনের তারিখ ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুন মধুসূদন গুপ্তকে সংস্কৃত কলেজ থেকে বদলি করা হয়। মধুসূদন ১৮৩৫-এর ১৭ই মার্চ থেকে (১ মার্চ থেকে কলেজের অধ্যাপক নিয়োগ, ছাত্র, সংগ্রহ ইত্যাদির কাজ শুরু হয়েছিল) এক শ' টাকা মাইনেতে 'অ্যানাটমি' ও 'সার্জারি'র 'ডেমনস্ট্রেটর' নিযুক্ত হলেন। এসময় সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা লোপ পায়।

মেডিকেল কলেজে নতুন শিক্ষাক্রমে শব-ব্যবচ্ছেদ ছিল একটি প্রধান বিষয়। কিন্তু সেকালে মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচার ছিল বিপুল পাপকার্যের সামিল, তাই মেডিকেল কলেজের নতুন শিক্ষাক্রমকে অনেকে বিরুদ্ধবাদীর দৃষ্টিতে গ্রহণ করলেন।

কালের চাকা কখনও থামে না। দেশীয় কুসংস্কার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত চিকিৎসাবিদ্যাতেও মাথা চাড়া দিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চাকার তলায় কুসংস্কার চিরকালের মত গুঁড়িয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজের একদা ছাত্র ও অধ্যাপক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত দুর্জয় সাহসে শব-ব্যবচ্ছেদাগারে প্রবেশ করলেন ১৮৩৬ সালের অবিস্মরণীয় সেই দিবসে, যে দিন :

At the appointed hour, scapel in hand, he (অর্থাৎ মধুসূদন গুপ্ত) followed Dr. Goodeve, into the godown where the body lay ready. The other students, deeply interested in what was going forward but strangely agitated with mingled feelings of curiosity and alarm, crowded after them, but durst not enter the building where this fearful deed was to be perpetrated ; they

clustered round the door, they peeped through the jilmils, resolved at least to have ocular proof of its accomplishment. And when *Modhusuden's knife, held with a strong and steady hand* made a long and deep incision in the breast, the lookers on drew a long gasping breath, like men relieved from the weight of some intolerable suspense. (১৮৪৯ সালে বেথুন প্রদত্ত ভাষণ থেকে)

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুআরি* বাঙালী মধুসূদন গুপ্ত শবব্যবচ্ছেদ করে প্রগতির জয় ঘোষণা করলেন। স্মরণীয় ঐ দিনটিকে তোপধ্বনির দ্বারা সংবর্ধনা জানান হয়েছিল। শবব্যবচ্ছেদের দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে যথার্থই বলা হয়েছে :

The day will ever be marked in the annals of Western Medicine in India when Indians rose superior to the prejudices of their earlier education and thus boldly flung up the gates of the modern Medical Science to the countrymen (*Centenary of the Medical College, 1935, p. 12-13*).

মেডিক্যাল কলেজে 'ডেমনস্ট্রেটর'-এর পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়েই মধুসূদন কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় যুক্ত হলে কোন কিছুই যে অন্তরায় হতে পারে না তার প্রমাণ বেশি বয়সে ইংরেজি শিখতে শুরু করেও মধুসূদন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে মেডিকেল কলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৮৪০ সালে অনুষ্ঠিত সেই পরীক্ষায় তিনি সাফল্যপত্র পান।

* কোন কোন লেখকের মতে তারিখটি ২৬ অক্টোবর ১৮৩৬। বেথুন সাহেবও তাই বলেছেন। আমি ১০ জানুআরি গ্রহণ করেছি। এ প্রসঙ্গে ***Centenary of the Medical College, 1935*** দ্রষ্টব্য।

১৮৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকার 'হিন্দুস্থানী' বা 'মিলিটারি বা 'সেকেণ্ডারি' ক্লাস পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে মধুসূদনকে আহ্বান করেন এবং তাঁর উপর পুরো কাজের ভার ছেড়ে দেন। মধুসূদন তাঁর 'ডেমনস্ট্রেটর'-এর কাজ ছাড়া এই নতুন কাজের ভারও গ্রহণ করলেন। তাঁর নতুন পদের নাম হল 'সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ দি সেকেণ্ডারি ক্লাস'। তিনি তাঁর নতুন হিন্দুস্থানীভাষী ছাত্রদের শারীরবিদ্যা, শল্যবিদ্যা প্রভৃতি শেখাতে লাগলেন।

শিক্ষকরূপেই শুধু নন, গ্রন্থকাররূপেও মধুসূদন কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। পূর্বোল্লিখিত হুপারের গ্রন্থানুবাদ ছাড়া মধুসূদন আর দু'টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তাদের মধ্যে একটি মৌলিক, অন্যটি অনুবাদ। মৌলিক গ্রন্থটির নাম 'এনাটোমী', ১২৫৯ সালে ইংরেজী মার্চ, ১৮৫৩-এ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি 'লণ্ডন ফার্মাকোপিয়া', ঐ নামের ইংরেজী বই'র অনুবাদ ১৮৪৯ সালে প্রকাশিত হয়।

গুণগ্রাহী ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৪৮ সালে মধুসূদনকে প্রথম শ্রেণীর সাব-অ্যাসিস্টান্ট সার্জেন-এর পদে উন্নীত করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪৯ সালে মেডিকলে কলেজ থিয়েটারে মধুসূদনের একটি তৈলচিত্র —চিত্রখানি প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীমতী বেলনস-এর আঁকা—প্রতিষ্ঠিত করে সরকার তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ঐ চিত্র প্রতিষ্ঠার সময় ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তাঁর ভাষণে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারীর স্মরণীয় ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেছিলেন। বেথুনের সেই ভাষণের কিয়দংশ মধুসূদনের শবব্যবচ্ছেদ-কৃতিত্ব প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে।

বাংলা দেশের, বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের, বিজ্ঞানচর্চার ও বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাসে মধুসূদন গুপ্ত একটি স্মরণীয় নাম। সেকালের দুর্মর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানবচিকিৎসাবিদ্যার জন্য অপরিহার্য মানব-শব ব্যবচ্ছেদকার্যে সাহসী অংশ গ্রহণ করে তিনি যেমন উত্তরকালের বিস্মিত শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন, তেমনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উন্নতি ও প্রসারকল্পে লেখনী ধারণ করার জন্যও

বাঙালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গভীর কৃতজ্ঞতাভাজন। তিনি একাই শুধু নন, অন্যদেরও যে তৎকালীন কুসংস্কার ভাঙবার কাজে অগ্রণী করেছিলেন, শব-ব্যবচ্ছেদে সমান পরাঙ্মুখ মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে শব-ব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত কুসংস্কার দূরীকরণ তার দীপ্ত দৃষ্টান্ত। মধুসূদনের পাণ্ডিত্য, অধ্যাপনা, শব-ব্যবচ্ছেদ-নৈপুণ্য ও কর্মনিষ্ঠার প্রশংসায় মুখর সমসাময়িক শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদনগুলি উনিশ শতকের বাংলার বহু বিচ্ছুরণী মনীষারই অন্যতম প্রমাণ। ১৮৫৬ সালের ১৫ নভেম্বর উনিশ শতকের এই বিস্মৃতপ্রায় প্রধান পুরুষের প্রয়াণে 'সম্বাদ ভাস্কর' (২২. ১১. ১৮৫৬) লিখেছিলেন, যে মধুসূদন গুপ্ত 'দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুর সমাচারে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বহু লোক অক্ষেপ করিবেন।'

দ্রষ্টব্য: 'সাহিত্যসাধকচরিতমালা' অন্তর্ভুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'মধুসূদন গুপ্ত' (গ্রন্থ সংখ্যা ১৬) ও *Centenary of the Medical College, 1935* প্রভৃতি।

পরিশিষ্ট ঃ সংযোজন

ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে আরও তথ্য

ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে আরও তথ্য

হিন্দু কলেজের আদি কল্পক :* বর্তমান গ্রন্থের পাঠক দেখতে পাবেন, গ্রন্থকার প্যারীচাদ এবং তাঁর অনুজ কিশোরীচাঁদ মিত্র উভয়েই হিন্দু কলেজের পরিকল্পনার সঙ্গে রামমোহন রায়কে জড়িত করেছেন। ১৮৬২ সালে হেয়ারের বিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী সভায় পঠিত এক প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ বলেন, ঈস্টের বাসায় কলেজস্থাপন সংক্রান্ত প্রাথমিক সভায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের পরিকল্পক হিসাবে হেয়ারের সঙ্গে 'অবিচ্ছেন্তভাবে জড়িত' রামমোহন উপস্থিত ছিলেন না; এবং পাছে তিনি পরিকল্পিত কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলে হিন্দুরা এ ব্যাপারে সক্রিয় সহযোগিতা না করেন —এবং তাঁর অনুমান ছিল অভ্রান্ত—সেই জন্য শেষ পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়িয়েছিলেন (পৃ. ১১০-১১)। ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত বর্তমান গ্রন্থে প্যারীচাঁদ অনুজের উক্তির সমর্থনে কিঞ্চিৎ বিশদভাবে বলেন, রামমোহনের সঙ্গে প্রস্তাবিত কলেজটির যাতে কোন সম্পর্ক না থাকে, ডেভিড হেয়ার তার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হলেন এবং সহজেই রামমোহনকে কলেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে রাজী করিয়ে রক্ষণশীল হিন্দুদের সমর্থন লাভ করেছিলেন (পৃ. ৮)। শিবনাথ শাস্ত্রী আর এক ধাপ এগিয়ে বলেন, ১৮১৬ সালের এক সভায় হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত একটি ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় এবং সেই প্রস্তাব সংক্রান্ত আলোচনার জন্য হাইড ঈস্ট হেয়ার ও রামমোহনকে ডেকে পাঠান; এবং রামমোহন পরে রক্ষণশীল হিন্দুদের বিরোধিতার জন্য হেয়ারের মন্ত্রণায় এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত

---

* বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় আমি ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। ডক্টর মজুমদারের মতামতের জন্য Journal of the Asiatic Society, Letters, Vol. XXI, No 1, 1955-এ প্রকাশিত হিন্দু কলেজ সংক্রান্ত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। আলোচনায় ব্যবহৃত ইংরেজী অংশের ইটালিক্স আমার। —কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

কমিটি থেকে সরে দাঁড়িয়ে পরিকল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে সাহায্য করেন ('রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', পৃ. ৭৮-৯)। ১৯১৭ সালে মেজর বামনদাস বসু তাঁর History of Education in India under the rule of the East India Company গ্রন্থে (পৃ. ৩৭) স্পষ্টভাবেই রামমোহনকে হিন্দু কলেজের 'আদি কল্পক'-এর মর্যাদা দান করেন। তাঁর উক্তির সমর্থনে তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ মে তারিখে বন্ধু জে. হ্যারিংটনকে লেখা হাইড ঈস্টের এক দীর্ঘ চিঠির অনেকখানি উৎকলন করেন। ঈস্টের ঐ পত্র হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাপর্ব সম্পর্কিত সর্বাধিক মূল্যবান দলিল, সেই কারণে সম্পূর্ণ চিঠিটি হুবহু পুনর্মুদ্রিত হলো :*

An interesting and curious scene has lately been exhibited here, which shows that all things pass under change in due season. About the begining of May, *a Brahmin of Calcutta, whom I knew, and who is well known for his intelligence and active interference among the principal Native inhabitants, and also intimate with many of our own gentlemen of distinction, called upon me and informed me, that many of the leading Hindus were desirous of forming an establishment for the education of their children in a liberal manner as practised by Europeans of condition*; and desired that I would lend them my aid towards it, by having a meeting held under my sanction. Wishing to be satisfied how the Government would view such a measure, I did not at first give him a decided answer; but stated, that however much I wished well, as an individual, to such an object, yet, in the public situation I held, I should be cautious not to give any appearance of acting form my own impulse in a matter which I was

* এই চিঠিটি Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XVI-এ মুদ্রিত হয়েছে।

sure that the Government would rather leave to them (the Hindus) to act in, as they thought right, than in any manner to control them ; but that I would consider of the matter, and if I saw no objection ultimately to the course he proposed, I would inform him of it ; and if he would then give me a written list of the principal Hindus to him he alluded, I would send them an invitation to meet at my house. In fact, several of them had before, at different times, addressed themselves to me upon this topic, but never before in so direct a manner.

After his departure I communicated to the Governor-General what had passed, who laid my communication before the Supreme Council, all the members of which approved of the course I had taken, and signified, through his Lordship, that they saw no objection to my permitting the parties to meet at my house.

It seemed indeed to be as good an opportunity as any which could occur of feeling the general pulse of the Hindus, as to be projected system of national moral improvement of them recommended by Parliament (and towards which they have directed a lac to be annually laid out), and this without committing the Government in the experiment. The success of it has much surpassed any previous expectation. The meeting was accordingly held at my house on the 14th of May, 1816, at which 50 and upwards of the most respectable Hindu inhabitants of rank or wealth attended, including also the principal Pandits ; when a sum of nearly half a lac of rupees was subscribed, and many more subscriptions were promised. Those who were well acquainted with this people, and know how hardly a Hindu parts with his money upon any abstract speculation of mental advantage, will best know how to estimate this effort of

theirs. It is, however, a begining made towards improvement which surprises those who have known them the longest, and many of themselves also. Most of them, however, appeared to take great interest in the proceedings, and all expressed themselves in favour of making the acquisition of the English language a principal object of education, together with the moral and scientific productions.

I first received some of the principal Hindus in a room adjoining to that where the generality were to assemble. There the Pandits, to most of whom I was before unknown, were introduced to me. The usual mode of salutation was on this occassion departed from ; instead of holding out money in his hand for me to touch (a base and degrading custom), the chief Pandit held out both his hands closed towards me ; and as I offered him my hand, thinking he wished to shake hands in our English style, he disclosed a number of small sweet-scented flowers, which he emptied into my hand, saying that those were the flowers of literature, which they were happy to present to me upon this occasion, and requested me to accept from them (adding some personal compliments). Having brought the flowers to my face, I told him that the sweet scent was an assurance to me that they would prove to be the flowers of morality, as well as of literature, to his nation, by the assistance of himself and his friends. This appeared to gratify them very much.

Talking afterwards with several of the company before I proceeded to open the business of the day, I found that one of them in particular, a Brahmin of good caste, and a man of wealth and influence, was mostly

set against Rammohun Roy, son of [*a pattanidar* under]* the Rajah of Burdwan, a Brahmin of the highest caste, and of great wealth and rank (who has lately written against the Hindu idolatry, and upbraids his countrymen pretty sharply). He expressed a hope that no subscription would be received from Rammohun Roy. I asked why not ? Because he has chosen to separate himself from us, and to attack our religion." "*I do not know,*" I observed, "*what Rammohun's religion is*" (I have heard it is a kind of Unitarianism)—"*not being acquainted or having had any communication with him* : but I hope that my being a Christian, and a sincere one, to the best of my ability, will be no reason for your refusing my subscription to your undertaking." This I said in a tone of gaiety , and he answered readily in the same style, "No, not at all , we shall be glad of your money ; but it is a different thing with Rammohun Roy, who is a Hindu, and yet has publicly reviled us, and written against us and our religion , and I hope there is no intention to change our religion." I answered, that "I knew of no intention of meddling with their religion , that every object of the establishment would be avowed, and a committee appointed by themselves to regulate the details, which would enable themselves to guard against everything they should disapprove of ; that their own committee would accept or refuse subscriptions from whom they pleased." I added that, "I being a Christian, upon my deliberate conviction, would, as a man, spare no pains to make all other men such, if any persuasion of mine would work such a change ; but being sensible that such a change was wholly out of my

* এই কথাগুলি বা এই ধরনের কিছু কথা বাদ গেছে।

power to effect, the next best thing I could do for them was to join my endeavours to theirs to make them good Hindus, good men, and to enlighten their nation by the benefits of a liberal education, which would enable them to improve themselves, and judge for themselves." The Brahmin said he had no objection to this ; and some of the others laughed and observed to me, that they saw no reason, if Rammohun Roy should offer to subscribe towards their establishment, for refusing his money, which was good as other people's.

This frank mode of dealing with them, I had often before had the occasion to remark, is the best method of gaining their personal regard and confidence. Upon another occasion I had asked a very sensible Brahmin what it was that made some of his people so violent against Rammohun. He said, in truth, they did not like a man of his consequence to take open part against them ; that he himself had advised Rammohun against it , he had told him, that if he found anything wrong among his countrymen, he should have endeavoured, by private advice and persuasion to amend it ; but that the course he had taken set everybody against him, and would do no good in the end. They particularly disliked (and this I believe is at the bottom of the resentment) his associating himself so much as he does with Mussulmans, not with this or that Mussulman, as a personal friend, but being continually surrounded by them, and suspected to partake of meals with them. In fact, he has, I believe, newly withdrawn himself from the society of his brother Hindus, whom he looked down upon, which wounds their pride. They would rather be reformed by anybody else than by him. But they are now very generally sensible that they want

reformation; and it will be well to do this gradually and quietly, under the auspices of Government, without its sensible interference in details.

The principal objects proposed for the adoption of the meeting (after raising a subscription to purchase a handsome piece of ground, and building a college upon part of it, to be enlarged hereafter, according to the occasion and increasing of funds), were the cultivation of the Bengalee and English languages in particular, next the Hindostanee tongue, as convenient in the Upper Provinces; and then the Persian, if desired, as ornamental; general duty to God; the English system of morals (the Pandits and some of the most sensible of the rest bore testimony to and deplored their national deficiency in morals); grammar, writing (in English as well as Bengalee), arithmetic (this is one of the Hindu virtues), history, geography, astronomy, mathematics; and in time, as the fund increases, English belles-lettres, poetry, etc., etc.

One of the singularities of the meeting was, that it was composed of persons of various castes, all combining for such a purpose, whom nothing else could have brought together; whose children are to be taught, though not fed, together.

Another singularity was, that the most distinguished Pandits who attended declared their warm approbation of all the objects proposed; and when they were about to depart, the head Pandit, in the name of himself and the others, said that they rejoiced in having lived to see the day when literature (many parts of which had formerly been cultivated in their country with considerable success, but which were now nearly extinct) was about

to be revived with greater lustre and prospect of success than ever.

Another meeting was proposed to be held at the distance of a week ; and during this interval I continued to receive numerous applications for permission to attend it. I heard from all quarters of the approbation of the Hindus at large to the plan ; they have promised that a lakh shall be subscribed to begin with. It is proposed to desire them to appoint a committee of their own for management, taking care only to secure the attendance of two or three respectable European gentlemen to aid them, and see that all goes on rightly.

'রামনদাস বসু, যিনি সর্বপ্রথম এই পত্র প্রকাশের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন, ঈস্টের চিঠির গোড়ার দিকে উল্লিখিত a Brahmin of Calcutta প্রসঙ্গে একটি পাদটীকা যোজনা করে বলেন যে, ঐ শব্দনিচয় of course refers to Raja Rammohun Roy. কিন্তু আলোচ্য চিঠিরই অন্যত্র ঈস্ট স্পষ্টই জানাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে রামমোহনের পরিচয় নেই বা কোন পত্রালাপও হয়নি। এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ কি করে বসু মহাশয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল বলা কঠিন! এবং এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ-সম্বলিত স্তবকটি বসু মহাশয়ের গ্রন্থে উদ্ধৃত না হওয়ায় কোন কোন পরবর্তী গবেষক শুধু বসু মহাশয়ের পাদটীকা—of course refers to Raja Rammohun Roy—অংশটির উপরে নির্ভর করে সিদ্ধান্তে আসেন, রামমোহনই হিন্দু কলেজের আদি কল্পক। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথমে এই ভুল করেছিলেন, পরে তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১৯৫)। কিন্তু এতকাল পরে কেউ কেউ, এখনও জানি না কেন, রামমোহনকে হিন্দু কলেজের আদি কল্পক মনে করেন।

রামমোহন রায়ের বাড়িতে হিন্দু কলেজের প্রস্তাবের জন্ম, সেইজন্যই

বোধ করি কেউ কেউ হিন্দু কলেজের সঙ্গে রামমোহনকে জড়িয়ে ফেলেছেন কিন্তু *The Calcutta Christian Observer* পত্রিকার যে সংখ্যায় রামমোহনের বাড়িতে প্রস্তাবটির জন্মেতিহাস আছে, সেই সংখ্যাটি ভালো করে পড়লে এই ধারণা হবে না। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় উক্ত পত্রিকা হিন্দু কলেজের আদি কল্পক সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে জানায়, ১৮১৫ সালে রামমোহনের বাড়িতে আহূত একটি সভায় রামমোহন একটি ব্রহ্ম সভা স্থাপনের প্রস্তাব করলে—

Mr. Hare, who was one of the party, not coinciding in the views of Rammohun Roy, suggested as an amendment, *the establishment of a College.*

এবং তারপর—

This proposition seemed to give general satisfaction and Mr. H. himself soon often prepared a paper, containing proposals for the establishment of the College. Babu Buddinath Mookerjya, the father of the present native Secretary, was deputed to collect subscriptions. The circular was after a time put into the hands of Sir E. H. East, who was very much pleased with the proposal, and after making a few corrections, offered his most cordial aid in the promotion of its objects. He soon after called a meeting at his house, and it was then resolved, 'That an establishment be formed for the education of native youth.'

Thus it appears that Sir Hyde East, though he had not the merit of *originating* the College, is nevertheless entitled to great credit for the very prompt and effective aid which he afforded.

উক্ত পত্রিকার ১৮৩২ সালের জুন সংখ্যায় প্রকাশ, হেয়ার একটি কলেজ স্থাপনের প্রস্তাবপত্র রচনা করেন এবং তা জনৈক এ দেশীয় ব্যক্তির মাধ্যমে ও সমর্থনের জন্য হাইড ঈস্টের কাছে পাঠান ('ভূমিকা' দ্রষ্টব্য)।

হেয়ারই যে হিন্দু কলেজের আদি কল্পক তার পক্ষে আরও কয়েকটি তথ্য: এক, ১৮৩৫ সালে ১৫ই সেপ্টেম্বর সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লাভ উপলক্ষে টাউন হলে আয়োজিত সান্ধ্য ভোজে দ্বারকানাথ হিন্দু কলেজ-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলেন যে, প্রতিষ্ঠানটি প্রধানত তাঁর বন্ধু ডেভিড হেয়ার এবং দেশীয় ভদ্রলোকদের উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (পৃ. ৫)। দুই, হেয়ারের মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' হেয়ারের কৃতিত্ববর্ণনা প্রসঙ্গে লেখে যে তিনি হিন্দু কলেজ স্থাপনে দেশীয় লোকদের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়েছিলেন (পৃ. ১৪); ঐ সময় 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র কাছ থেকেও জানা যায়, হিন্দু কলেজ স্থাপনে প্রধান ভূমিকা যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন হেয়ার তাঁদের অন্যতম (পৃ. ১৮)। রাজনারায়ণ বসুও হেয়ারকে হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের 'প্রধান উদ্যোগী' রূপে বর্ণনা করেছেন (হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত, পৃ. ২০; সেকাল আর একাল, পৃ. ৬)।

উপরি-উদ্ধৃত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে অতঃপর ডেভিড হেয়ারকে নিঃসন্দেহেই হিন্দু কলেজের আদি কল্পক রূপে স্বীকার করতে হয়।

১৮৪৭ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাধাকান্ত দেব প্যারীচাঁদকে যে চিঠি লেখেন, তাতে অবশ্য হেয়ারকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়নি; এবং রাধাকান্ত দেব ঈস্টকেই 'হিন্দু কলেজের জন্মদাতা বা প্রতিষ্ঠাতা'-র সম্মান দিয়েছেন (পৃ. ৫০)। হাইড ঈস্টের উপরি-উদ্ধৃত চিঠিতেও হেয়ারের নাম অনুপস্থিত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে (ঈস্টের চিঠি দ্রষ্টব্য; রাধাকান্ত ভুলে ৪ঠা মে বলেছেন, পৃ. ৫০) তাঁর বাসভবনে আহূত সভায় যে ভাষণ দেন—ভাষণটি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি—তাতেও হেয়ারের নাম অনুল্লিখিত ছিল (পৃ. ৫০)। অতএব হেয়ারের কৃতিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ উঠতে পারে।

এই সন্দেহ নিরসনে প্রথমে প্যারীচাঁদের বক্তব্য শোনা যাক। প্যারী-চাঁদ বলেছেন, 'রাজা রাধাকান্ত বোধ হয় জানতেন না, সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে কতখানি কল্যাণকর কর্মোদ্যোগ ডেভিড হেয়ার দেখিয়েছিলেন। সকলে তাঁকে হিন্দু কলেজের লোক-দেখানো প্রতিষ্ঠাতা মনে করবে, এমন

মতাবলম্বা তিনি সযত্নে এড়িয়ে চলতেন। কিন্তু কলেজটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা যে তিনিই ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই' (পৃ. ৫১)।*

ঈস্টের চিঠিটি প্রকাশ না পেলে হয়তো আমরা ঈস্টকেই রাধাকান্ত দেবের অথ্যের ভিত্তিতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মনে করতাম। কিন্তু এখন ঐ চিঠিতেই সুস্পষ্ট যে, জনৈক কলিকাতাবাসী ব্রাহ্মণ কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব নিযে তাঁর কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। সুতরাং ঈস্ট আর যাই হোন; হিন্দু কলেজের আদি কল্পক নন। হিন্দু কলেজ স্থাপনার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ নিঃসন্দেহেই স্মরণীয় এবং সমকালীন হিন্দুরা কৃতজ্ঞতাবশত 'সুপ্রীম কোর্টের গ্র্যাণ্ড জুরী রুমে তাঁর মূর্তি স্থাপন করেছিলেন'। ঈস্টের ভাষণে অথবা চিঠিতে হেযারের নাম অনুল্লিখিত থাকার কারণ সম্ভবত বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায যিনি প্রস্তাবটি নিয়ে প্রথম ঈস্টের সঙ্গে দেখা করেন, তিনি ঈস্টকে হেযারের উৎসাহ-উদ্যোগ সম্পর্কে সম্যক অবহিত করাননি। এবং ঈস্ট নিজেও চাইছিলেন যে প্রস্তাবটি হিন্দুদের মধ্য থেকেই উৎসারিত হোক এবং হিন্দুরাই নিজেদের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে তার রূপায়ণের জন্য কাজ করুক।

বর্তমান আলোচনা থেকে আমরা নিচের সিদ্ধান্তগুলিতে আসি:

এক, ডেভিড হেযার-ই হিন্দু কলেজের 'প্রকৃত জন্মদাতা', তিনিই প্রথম এই কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এবং ১৮১৫ সালে রামমোহনের বাড়িতে এই প্রস্তাবের জন্ম।

দুই, সর্বসম্মত প্রস্তাবটি নিয়ে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় হাইড ঈস্টের সঙ্গে দেখা করেন এবং পরে ঈস্ট প্রস্তাবটির রূপায়ণে বিশেষ সাহায্য করেন। প্রস্তাবের ব্যাপারে হেয়ার ঈস্টের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, প্যারীচাঁদের এই উক্তি (পৃ. ৭) ভুল।

তিন, হাইড ঈস্টের চিঠিতেই স্বপ্রকাশ, তিনি হিন্দু কলেজের আদি কল্পক নন।

* অধোরেখ আমার।

ছাত্র, রামমোহন কোনভাবেই হিন্দু কলেজের আদি কর্তা বা জন্মদাতারূপে গণ্য হতে পারেন না। কলেজের প্রস্তাব রামমোহনের বাড়িতে আহুত একটি সভায় উত্থাপিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু রামমোহন সে প্রস্তাব কার্যকরী করার চেষ্টা করেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। প্যারীচাঁদও বলেছেন, 'তাঁরা (অর্থাৎ রামমোহনের বাড়িতে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ) সকলেই হেয়ারের বক্তব্যের যৌক্তিকতা মেনে নিলেন কিন্তু তাঁর প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করলেন না' (পৃ. ৭)। সুতরাং কিশোরীচাঁদের উক্তি—রামমোহন কলেজের সঙ্গে 'অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত' ছিলেন, কিংবা প্যারীচাঁদের তথ্য—ডেভিড হেয়ার হিন্দুদের সমর্থন হারাবার ভয়ে রামমোহনকে কলেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদে রাজী করিয়াছিলেন—ভ্রান্ত বলেই মনে করতে হবে।

রামমোহনের মতো প্রগতিশীল, ভারতবর্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের অগ্রদূত, হিন্দু কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি-বিবর্ধনে অংশ গ্রহণ করেননি, একথা ভাবতে মন অসম্মত হয় সত্য, কিন্তু হিন্দু কলেজে রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কিত নিশ্চিত তথ্য প্রমাণ যতদিন না প্রকাশিত হচ্ছে, সত্যসন্ধী বিচারনিষ্ঠ ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমরা ততদিন নীরবতাকেই আশ্রয়রূপে গণ্য করব। অনুমান করি, রামমোহন, 'স্বদেশবাসীর শিক্ষাকে' যিনি 'অনেক বেশি মূল্য দিতেন', কোন ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানগত অথবা কালগত কারণে হিন্দু কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হননি কিংবা হতে পারেননি। হয়তো আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও কলেজের ইতিহাসে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেননি। রামমোহনের মতো নিশিতবিদগ্ধমতি কৃতী পুরুষ যদি হিন্দু কলেজের বিবর্ধনে তাঁর কর্মিহস্তের প্রসারে অসফলও হয়ে থাকেন, তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের দীপ্তি কিঞ্চিন্মাত্র ম্লান বা তাঁর কৃতিত্বের আয়তন কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না। বিপরীত চিন্তা রামমোহনের পুণ্য স্মৃতির প্রতি অমর্যাদা প্রকাশেরই রূপান্তর মাত্র।

দোকানের ঠিকানা বদল : ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেট' (Vol. XXXV ; No. 911)—এ প্রকাশিত ডেভিড হেয়ারের একটি বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায় যে, এ দেশে পৌঁছনোর কিছু কাল পরে তিনি দোকানের ঠিকানা পরিবর্তন করেন। এ বিজ্ঞপ্তি থেকে তাঁর দোকানের ঠিকানা কি ছিল তা জানা যায়। বিজ্ঞপ্তিটি নীচে উদ্ধৃত হল।

DAVID HARE,
WATCH-MAKER,
LATELY ARRIVED IN THIS PRESIDENCY
(BY PERMISSION OF THE HONORABLE EAST INDIA COMPANY)

Begs leave to inform his Friends and the Public, that he has removed from Larkin's Lane, to the House lately occupied by Mr. Tolfrey, at the South 'West Corner of the Church Yard, where he will exert his utmost abilities to merit their Countenance and Protection.

ডেভিড হেয়ারকে ইয়ং বেঙ্গলের অভিনন্দন : ইয়ং বেঙ্গলের সভ্যগণ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুআরি ডেভিড হেয়ারকে একটি অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। এতে দক্ষিণারঞ্জন ছাড়া আরো ৫৬৪ জনের স্বাক্ষর ছিল। ডেভিড হেয়ার এই অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চের 'গভর্ণমেন্ট গেজেটে' এই অভিনন্দন ও হেয়ারের উত্তরটি মুদ্রিত হয়। নিচে এ দু'টি উদ্ধার করে দেওয়া গেল।

Calcutta, 17th Feb. 1831.

To
David Hare, Esqr.

Dear Sir,

Kindness, even when slightly evinced, excites a feeling of thankfulness in the minds of those who benefit by it. What, then, must be the sentiments which

animate the many who have enjoyed the happiness of receiving at your hands the best gift that is possible for one thinking being to bestow upon another—Education ? It has been the misfortune and reproach of many an age to permit its best benefactors to go to the grave without one token of its respect or gratitude for their endeavours. Warned by their example it is our desire to avoid it, and to let it be known that, however your eminent services to this country may be overlooked by other, they are appreciated by those who have experienced their advantages. We have, therefore, resolved upon soliciting the favour of your sitting for your portrait—a request with which we earnestly hope you will have no objection to comply. Far be it from us to suppose that so slight a token of respect is adequate to the merit of your philanthropic exertions; but it will be gratification to our feelings if we are permitted to keep among us a representation of the man who has breathed a new life into Hindu Society, who has made a foreign land the land of his adoption, who has voluntarily become the friend of a friendless people, and set an example to his own countrymen and ours, to admire which is fame, and to imitate immortality.

Waiting your kind compliance with the request contained in this address, and heartily wishing you health and strength to pursue the career which you have so long maintained.

We have the pleasure to be, dear Sir,
Your most obedient servants
(Signed by Dakinaranjan Mookerjee and 564 other young native gentlemen).

Mr. HARE'S ANSWER.

Gentlemen : In answer to the address you have just presented to me, I beg to apologize for the feelings that overcome me; and I earnestly request you to bear with me. A few years after my arrival in this country, I was enabled to discover during my intercourse with several native gentlemen, that nothing but education was requisite to render the Hindoos happy, and I exerted my humble abilities to further the interests of India; and with the sanction and support of the Government, and of a few leading men of your community I endeavoured to promote the cause of education.

Gentlemen : I have now the gratification to observe, that the tree of education has already taken root; the blossoms I see around me; and if it be left to grow up for ten years more, it will acquire such a strength, that it will be impossible to eradicate it. To maintain and to continue the happy career already begun is entirely left to your own exertions. Your countrymen expect it from you, for they look upon you as their reformers and instructors. It remains for you to gain that object, and to show the inhabitants of other countries in what manner they may render themselves useful.

When I observe the multitude assembled to offer me this token of their regard, when I see that the most respectable and learned native gentlemen have flocked around me to present this address, it is most flattering to me, for it expresses the unfeigned sentiments of their heart. I cannot contain myself, gentlemen. It is a proud day to me. I will preserve this token of your sentiments of gratitude towards me unto my latest breath; I will bequeath it to my posterity as a treasure which will inspire them with emulation to do good to their brethren.

Gentlemen : Were I to consult my private feelings, I should refrain from complying with your request. It has always been a rule with me never to bring myself into public notice, but to fill a private station in life. When I see, however, that the sons of the most worthy members of the Hindu Community have come in a body to do me honour, when I observe that the address is signed by most of those with whom I am intimate, and whose feelings will be gratified if I sit for my portrait, I cannot but comply with your request.

17th Feb., 1831. (Signed) David Hare.

সংশোধন ও সংযোজন

পৃষ্ঠাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ পাঠ
ভূমিকা	৬	'কোলসওয়াদি'র পরিবর্তে 'কোলসওয়ার্দি'।
১১	১	'যে, কোনৃটির' পরিবর্তে 'যে কোনটির'।
৩২	২৩	'নির্বোধ যে'র পরিবর্তে 'নির্বোধ নয় যে'।
৩৯	১-২	'ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁর অসারত্ব আবিষ্কার করলেন'-এর পরিবর্তে 'ডিরো-জিওর শিক্ষায় তাঁরা একটা ফাঁক দেখতে পেলেন'।
৪৮	১৩	'আর-হলিফক্স'-এর পরিবর্তে 'আর. হ্যালিফক্স'।
৫৩	২২	'তত্ত্বাবধনায'-এর পরিবর্তে 'তত্ত্বাবধানে'।
৫৪	৩	'শিক্ষাব্যবস্থার' পরিবর্তে 'শিক্ষাব্যবস্থা'।
৫৭	৯	'সভ্রান্ত'র পরিবর্তে 'সম্ভ্রান্ত'।
৫৮	৬	'ও' সাগনেসী'-র পরিবর্তে 'ও' শনেসী'।
৬৪	১০-১১	'বুবা দুর্গাচরণকে'র পরিবর্তে 'বাবু দুর্গা-চরণকে'।
৬৯ ও ২৪৫	২৯ ও ১	'স্ত্রীশিক্ষাবিষযক'-এর পরিবর্তে 'স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়ক'।
৭৬	৬	'বিদ্যাভ্যাস'-এর পরিবর্তে 'বিদ্যাভ্যাস'।
৭৬	১৯	'তহবিলেব' পরিবর্তে 'তহবিলের'।
৭৭	৯	'জেনারেল কমিটি অফ্ ইন্স্ট্রাকশনস'-পরিবর্তে 'জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্স্ট্রাক্শন্স্'।
৮২	২৫	'১৮৩৯-৪-এর' পরিবর্তে '১৮৩৯-৪০-এর'।

পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩-র পরিবর্তে ১৮৩ হবে।

১৯২	২১	'জয়কৃষ্ক'র পরিবর্তে 'জয়কৃষ্ণ'।
২২৭	২১	'খ্রীষ্টকের' পরিবর্তে 'খ্রীষ্টাব্দের'।
২৩১	১	'ডেপুটি কলেরের পদে নিযুক্ত হন স্টা'র— পরিবর্তে 'ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন।'
২৩৮	২৫	'Ramchandra Ghosha'র পরিবর্তে 'Ramchandra Ghosh'
২৪৪	৯	'২৮২১'-এর পরিবর্তে '১৮২১'।
২৫৮	৬	'সি. আই. ই'র পরিবর্তে সি. এস. আই'
২৪৮	৭-৮	দিগম্বরের পুত্র গিরীশচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন ও সেখানেই মারা যান—এ তথ্য দিয়েছেন শ্রী হরিহর শেঠ তাঁর 'প্রাচীন কলকাতা পরিচয়' (কলকাতা ১৯৫২) গ্রন্থের ৪৬৪ পৃষ্ঠায়। কিন্তু ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর দিগম্বর-জীবনীতে (পৃ ২৮৪-৮৫) লিখেছেন যে গিরীশচন্দ্র বিলাত থেকে ফেরার তিন বছর পরে আঠাৎ ১৮৭০-এ ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান।
২৫৩	৬	'স্যাধারণ'-এর পরিবর্তে 'সাধারণ'।
২৫৫	১৮	'সেক্রেটারিট্রিযার' এর পরিবর্তে 'সেক্রে-টারি ট্রিয়ার'।
২৭১	৩১	'মাধ্যমে'র পর 'ও' বাদ, 'হাইডা'র স্থলে 'হাইড' এবং 'পাঠন'-এর স্থলে 'পাঠান'।

ঘটনাপঞ্জী

বন্ধনীমধ্যস্থ সংখ্যা বর্তমান পুস্তকের পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দেশক। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের নাম এবং পৃষ্ঠা সংখ্যাও বন্ধনীর মধ্যে যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে।

১৭৭৫ ১৭ই ফেব্রুআরি ডেভিড হেয়ার স্কটল্যাণ্ডের একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (১)।

১৮০০ ঘড়ির ব্যাবসা করার উদ্দেশ্যে ডেভিড হেয়ার কলকাতায় আগমন করেন (১)।

১৮১৬ ১৪ই মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড্ ঈস্টের বাড়িতে ইংরেজী শিক্ষার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ডেভিড হেয়ারের একটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি সভা হয়।

হাইড ঈস্টেরই বাড়িতে ২১শে মে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির নাম স্থির হয় 'হিন্দু কলেজ'। এই সভায় প্রতিষ্ঠানটির সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দশজন ইওরোপীয় ও কুড়িজন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। ২৭শে অগস্ট কলেজের জন্যে প্রস্তুত নিয়মাবলী সদস্য ও চাঁদাদাতাদের সভায় মনোনয়ন লাভ করে। এই নিয়মাবলী প্রণয়নে হেয়ারের বিশেষ সাহায্য ছিল (৮, সুশীলকুমার গুপ্তের "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালোর নবজাগরণ', ১৭০-১৭১; শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন 'বঙ্গসমাজ', নিউ এজ পাবলিশার্স' সং, ১৯৫৫, ৭৮-৭৯, রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল আর একাল', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, ১৯৫১, ৬)।

১৮১৭ ২০শে জানুআরি গরানহাটায় ৩০৪ নম্বর চিৎপুর রোডে গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে কুড়ি জন ছাত্র নিয়ে হিন্দু কলেজ খোলা হয়। এই সময় ইওরোপীয়দের মধ্যে হাইড ঈস্ট, হ্যারিংটন প্রমুখ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ৪ঠা জুলাই কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি জন্ম লাভ করে। উক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথমাবধি হেয়ারের যোগাযোগ স্মরণীয় (৯ ; Charles Lushington-এর 'The History, Design, and Present state of Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity', ১৫৬-৬৭, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', ১১১ ; যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার উচ্চশিক্ষা', ৬-৭)।

১৮১৮ ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। ই. এ. মণ্টেগু ও রাধাকান্ত দেব যথাক্রমে এর ইওরোপীয় ও দেশীয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। উইলিঅম কেরী ও ডেভিড হেয়ার প্রথম থেকেই অধ্যক্ষসভার সদস্য ছিলেন (৬০-৬২, ২৪৩-৪৪ ; 'The History, Design, and Present State of Religious, Benevolent and Charitable Institutions, founded by the British in Calcutta and its vicinity', ১৬৮-৮৪)।

১৮১৯ কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ক্যাপ্টেন এফ. আরভিন (হিন্দু কলেজের ইওরোপীয় সম্পাদক)-এর স্থলে হেয়ারকে হিন্দু কলেজে প্রেরিত ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন (১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি)। আরভিন এই সময় অসুস্থ হয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে যান (যোগেশচন্দ্র বাগলের 'বাংলার জনশিক্ষা', ১৭)।

১৮২০ ১লা জানুআরি হেয়ার তাঁর ঘড়ির ব্যাবসা ত্যাগ করেন (১,২২১) ঃ

১৮২২ কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদক ডব্লিউ. এইচ. পিয়ার্স অসুস্থ হয়ে পড়লে হেয়ার সাময়িকভাবে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন (২৪৪; 'বাংলার জনশিক্ষা', ১৮)।

১৮২৩ পটলডাঙার একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কুল সোসাইটি এর আংশিক ব্যয় বহন করতেন। অবশিষ্ট ব্যয়ের জন্য ডেভিড হেয়ার অর্থ সাহায্য দিতেন। তিনি স্থায়ীভাবে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ইওরোপীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সময় প্রধানত হেয়ারের প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ ও সোসাইটি অর্থসাহায্যের জন্য গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন করে ('উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', ১৬৭)।

১৮২৪ ২৫শে ফেব্রুআরি কলেজ স্কোয়ারের উত্তর দিকে হেয়ার কর্তৃক স্বল্পমূল্যে প্রদত্ত ভূমিতে সংস্কৃত ও হিন্দু কলেজের জন্য একটি গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর লর্ড আমহার্স্টের দ্বারা স্থাপিত হয়। কলেজের আর্থিক সংকট দেখা দেয় এবং অধ্যক্ষসভা অর্থানুকূল্যের জন্য গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেন। সরকার অর্থসাহায্য দিতে স্বীকৃত হন এবং স্থির হয় যে, সাধারণ শিক্ষাসভা (জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন)-র সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক ও অধ্যক্ষসভার উপ-সভাপতি এবং হেয়ার অধ্যক্ষসভার অবৈতনিক সদস্য হবেন (১৬-১৮; রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত', ১৮৭৬, ২০; 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', ১৭১)।

১৮২৮ হেয়ার স্কুল সোসাইটিকে তার কঠিন অর্থাভাবের সময় এককালীন ৬,০০০ টাকা দান করেন। প্রধানত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নিয়ে ডিরোজিওর সভাপতিত্বে যে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হয় হেয়ার তার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন (১৯, 'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ',

৯৬, ১৭৬ ; Priyaranjan Sen-এর 'Western Influence in Bengali Literature', Second Edition, 1947, ৬২-৬৩ ; 'বাংলায় জনশিক্ষা', ২১)।

১৮৩১ ১৭ই ফেব্রুআরি হেয়ারের জন্মদিনে হিন্দু কলেজের দক্ষিণানন্দ (পরে দক্ষিণারঞ্জন) মুখোপাধ্যায় এবং অন্য ৫৬৪ জন ছাত্র একটি সভায় হেয়ারকে শিক্ষার ব্যাপারে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মানপত্র প্রদান করেন। হেয়ারও এই সভায় প্রতিবক্তৃতা দেন (২৭৫-৭৬ ; 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', ১৭৬)।

১৮৩৫ জুন মাসে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হলে হেয়ার একে নানাবিধভাবে সাহায্য করতে অগ্রসর হন (৫৭)।

১৮৩৮ ১২ই মার্চ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে সভাপতি করে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নামে যে সভা স্থাপন করেন হেয়ার তার অনারারি ভিজিটর নির্বাচিত হন (২২৩, 'ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', ১৭৬ ; 'Western Influence in Bengali Literature', ৬৩-৬৪)।

১৮৩৯ হিন্দু কলেজের শিশুশিক্ষা শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করে বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপিত হয়। হেয়ার ১৪ই জুন এই পাঠশালা গৃহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন ('ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ', ১৭৭-৭৮)।

১৮৪০ হেয়ার গভর্নমেন্ট কর্তৃক ছোট আদালতের (Court of Requests) তৃতীয় কমিশনার নিযুক্ত হন (৫৫)।

১৮৪২ ১লা জুন কলেরায় হেয়ারের মৃত্যু ঘটে (৯০,১০২)।

নির্ঘণ্ট

ইংলণ্ড, কলকাতা প্রভৃতি সুপরিচিত নামগুলি (যেখানে স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত), এবং 'ভূমিকা' 'লেখক প্রসঙ্গে', 'গ্রন্থ প্রসঙ্গে' 'ঘটনাপঞ্জী', ইত্যাদি অংশভুক্ত শব্দগুলি নির্ঘণ্টে দেওয়া হয়নি।